প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৩৬৭

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

মুদ্রক
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

একমুঠো প্রীতির জন্যে

রূপা

সূচী

বৃষ্টি / Rain ১
সবজান্তাবাবু / Mr. Know-All ৪৯
গর্ভধারিণী / The Mother ৫৭
মেবেল / Mabel ৭৩
লোকটা / A Man from Glasgow ৭৮
লুইস / Louise ৯১
মরীচিকা / Mirage ৯৮
নির্লোম মেক্সিকান / The Hairless Mexican ১২১
স্বপ্ন / The Dream ১৬২
পরিবেশ / The Force of Circumstances ১৬৭
প্রতিশ্রুতি / Promise ১৯৭
রেড / Red ২০৪

লেখক প্রসঙ্গে

উইলিয়াম সমারসেট মমের জন্ম ১৮৭৪ সালে ফ্রান্সের পারী শহরে। শৈশবের দশটা বছর তাঁর ওই শহরেই কেটে গেছে। শিক্ষালাভ করেছেন ক্যান্টারবেরির কিংস স্কুল আর জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপরে চিকিৎসক হবার অভিপ্রায়ে তিনি কিছুকাল সেন্ট টমাস হাসপাতালেও পড়াশুনো করেন। কিন্তু ১৮৯৭ সালে প্রথম উপন্যাস লিজা অফ ল্যামবেথ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তখন থেকে সাহিত্যকেই জীবনের অবলম্বন হিসেবে বেছে নেন। এরপর ১৯১৫ সালে প্রথম ধ্রুপদী উপন্যাস অফ হিউম্যান বণ্ডেজ এবং ১৯১৯ সালে দ্য মুন অ্যাণ্ড দ্য সিক্স পেন্স প্রকাশিত হয়। ততোদিনে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক হিসেবে সমারসেট বিপুল যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ফেলেছেন। নাট্যকার হিসেবেও জীবনে এসেছে নাটকীয় সফলতা।

সত্যি কথা বলতে কি, গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী—সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই সমারসেট সব্যসাচীর মতো বিচরণ করেছেন। ইউরোপ থেকে লাতিন অ্যামেরিকা, বার্মা-মালয় থেকে তাহিতি-নিউগিনি—সর্বত্র অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ঘুরে ঘুরে তিনি অসংখ্য মানুষ দেখেছেন এবং সযত্নে তাদের তুলে ধরেছেন নিজের সাহিত্যের অ্যালবামে। বিশেষ করে তাঁর ছোটো গল্পগুলো যেন অসংখ্য দুর্লভ চরিত্রের এক আশ্চর্য চিত্রশালা। মানুষের মনের অতলে ডুব দিয়ে তিনি সুনিপুণ দক্ষতায় সংগ্রহ করে এনেছেন দুষ্প্রাপ্য মণিমুক্তার এক অসাধারণ সঞ্চয়ন। তাই প্রেম, প্রতিহিংসা, ব্যভিচার, রিরংসা, বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মত্যাগ—সবই মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর লেখনীর যাদুস্পর্শে। তাঁর জীবননিষ্ঠ রচনায় আমরা এমন অনেক চরিত্রের সন্ধান পাই যারা বাসনার তীব্র বিষে জর্জরিত, ব্যথায় বিধুর, হিংসায় উন্মাদ। মাঝে মাঝে এদের বিকৃত মানসিকতা আমাদের বিমূঢ় করে তোলে। অথচ এদের অস্বীকারও করা চলে না—কারণ এরাও মানুষ এবং মানুষের জীবন শুধুমাত্র জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ লাবণ্যে ভরা নয়।

মমের গল্পে আমরা দেখতে পাই আধুনিক যুগের জটিল মানসিকতা, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের কুটিল প্রভাব, প্রাচীন মূল্যবোধকে ধ্বংস করে ফেলার দানবীয় প্রবৃত্তি অথচ বাস্তবকে পুরোপুরি মেনে নিতে না পারার নিদারুণ দুঃখবোধ। মমের প্রায়

অধিকাংশ গল্পই চরিত্রপ্রধান। কোনো বিশেষ চরিত্রের কোনো বিশেষ দিককে আলোকিত করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি গল্পের আয়োজন করেন, সৃষ্টি করেন প্রয়োজনীয় পরিবেশ আর আকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির। তারপর একটু একটু করে গড়ে ওঠে এক নির্মম নাটকীয়তা, ফুটে ওঠে তীক্ষ্ণ শ্লেষের তীব্র ঝিলিক আর তারই আভায় পাঠকের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট হয়ে জেগে ওঠে পরিচিত মানুষের অন্য এক নতুন পরিচয়—চাঁদের উলটো পিঠের মতো যা সচরাচর সাধারণের চোখে ধরা পড়ে না। সংস্কারহীন নির্লিপ্ত ঋষির মতো নির্বিকার মন নিয়ে সমারসেট জীবনকে দেখেছেন। তাই কোনো ভুল বা অন্যায় করলেই তিনি মানুষকে ঘৃণ্যকীট বলে বর্জন করার পক্ষপাতী নন, নিছক ভালোমানুষ হলেই তাকে দেবোপম করে তুলতে আগ্রহী নন। দোষে-গুণে মানুষের জীবন—তাই মোহান্ধ, অস্বাভাবিক, অস্থির, তথাকথিত morbid চরিত্রের অস্তিত্বও তিনি ক্ষমাসুন্দর চোখে স্বীকার করে নিয়েছেন।

১৯২৭ সাল থেকে সমারসেট মম দক্ষিণ ফ্রান্সে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং অবশেষে ১৯৬৫ সালে পরিণত বয়সে মৃত্যু হয় এই মহান জীবনশিল্পীর।

শোবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। আসছে কাল সকালে ঘুম থেকে উঠলেই ডাঙা দেখা যাবে। তামাকের নলটা ধরিয়ে ডক্টর ম্যাকফেইল জাহাজের বেষ্টনীতে শরীরের ভর রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালেন, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলেন সাদার্ন ক্রস নক্ষত্রমণ্ডলীকে। সীমান্তে কেটেছে দুটো বছর এবং তারপর একটা ক্ষত যতোটা সময় লাগা উচিত তার চাইতে অনেক বেশি সময় নিয়ে সেরেছে। তাই এবারে অন্তত বারোটা মাসের জন্যে নিশ্চিন্ত মনে অ্যাপিয়ায় স্থিতু হওয়া যাবে ভেবে আনন্দ হচ্ছিলো তাঁর। মনে হচ্ছিলো এই যাত্রাপথেই তাঁর শরীরটা যেন আগের চাইতে সুস্থ হয়ে উঠেছে। কয়েকজন যাত্রী পরদিনই প্যাগো-প্যাগোতে জাহাজ থেকে নেমে যাবে বলে সন্ধ্যাবেলা একটু নাচের আসর বসানো হয়েছিলো। পিয়ানোর কর্কশ যান্ত্রিক সুরধ্বনি যেন এখনও ডক্টর ম্যাকফেইলের কানে হাতুড়ি পিটছে। তবে শেষ পর্যন্ত ডেকটা ফাঁকা হয়েছে। ডক্টর ম্যাকফেইল লক্ষ্য করলেন, একটু দূরেই তাঁর স্ত্রী একটা লম্বা কুর্সিতে বসে ডেভিডসনদের সঙ্গে কথা বলছেন। পায়ে পায়ে স্ত্রীর কাছে এগিয়ে গেলেন উনি। আলোর নিচে বসে টুপিটা খুলে ফেলতেই দেখা গেলো, ডক্টর ম্যাকফেইলের চুলগুলো খুব লাল, চাঁদির কাছে একটু টাক এবং গায়ের চামড়াতে লালচে মেচেতা—লাল চুলের সঙ্গে যেমনটি হামেশাই হয়ে থাকে। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ, পাতলা চেহারা—মুখখানা শীর্ণ, সতর্ক, যেন খানিকটা পণ্ডিতিপনায় ভরা।

ডেভিডসনরা ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের লোক। সমরুচিসম্পন্ন বলে নয়, বরং কাছাকাছি থাকার জন্যেই জাহাজে উঠে ম্যাকফেইল এবং ডেভিডসনদের মধ্যে একধরনের অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে। ধূমপান-কক্ষে দিনরাত্রি পোকার বা ব্রিজ খেলে এবং মদ গিলে সময় কাটানো মানুষগুলো সম্পর্কে তীব্র অনীহাই এই দুটি পরিবারের মধ্যে সবচাইতে বড় বন্ধন। জাহাজে একমাত্র তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গেই ডেভিডসনরা মেলামেশায় আগ্রহী, এই ভেবে মিসেস ম্যাকফেইল ঈষৎ গর্বিত। এমন কি ডাক্তার, যিনি লাজুক কিন্তু নির্বোধ নন, তিনিও খানিকটা নিজের অজান্তেই এটাকে প্রশস্তি হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তবু নেহাত তাঁর স্বভাবটা যুক্তিপ্রবণ বলেই রাত্রিবেলা নিজেদের কেবিনে এই নিয়ে তিনি নিজের সঙ্গে খুঁতখুঁত করেন।

'মিসেস ডেভিডসন বলছিলেন, আমরা না থাকলে সারাটা পথ যে ওঁরা কি করে কাটাতেন তা উনি জানেন না,' নিজের পরচুলাটা সযত্নে আঁচড়াতে আঁচড়াতে মিসেস

ম্যাকফেইল বললেন। 'বলছিলেন, জাহাজের মধ্যে একমাত্র আমাদের সঙ্গেই ওঁরা আলাপ-পরিচয় করেছেন।'

'একজন মিশনারি যে আবার বাছ-বিচার করার মতো তালেবর ব্যক্তি হতে পারেন, তা আমার জানা ছিলো না।'

'বাছ-বিচার নয়—আমি ওঁর মনের কথা স্পষ্ট বুঝতে পারি। ধূমপান-ঘরের ওই হতচ্ছাড়াগুলোর সঙ্গে মেলামেশা করতে হলে ডেভিডসনদের মোটেই ভালো লাগতো না।'

'ওঁদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাটি কিন্তু এমন অমিশুকে ছিলেন না,' ডক্টর ম্যাকফেইল ছোট্ট করে হাসলেন।

'আমি তোমাকে বারবার করে বলেছি অ্যালেক, ধর্ম নিয়ে কখনও ঠাট্টা-তামাশা কোরো না। তোমার মতো স্বভাব যেন আমার না হয়। তুমি মানুষের মধ্যে ভালোটা কক্ষনো দেখতে চাও না।'

হালকা নীল চোখ দুটি তুলে স্ত্রীর দিকে অপাঙ্গে তাকালেন ডক্টর ম্যাকফেইল, কিন্তু কোনো জবাব দিলেন না। দীর্ঘ কয়েক বছরের বিবাহিত জীবনে তিনি এটুকু জ্ঞান অর্জন করেছেন যে, শেষ কথাটা স্ত্রীকে বলতে দিলে সংসারে শান্তি বজায় রাখতে অনেক বেশি সুবিধে হয়। স্ত্রীর আগেই পোশাক বদলে ফেললেন উনি। তারপর পড়তে পড়তে ঘুমোবেন বলে ওপরের বাংকে উঠে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে ডক্টর ম্যাকফেইল যখন ডেকে এলেন, তখন জাহাজ ডাঙার একেবারে কাছাকাছি। লুব্ধ দৃষ্টিতে তীরের দিকে তাকিয়ে রইলেন উনি। সঙ্কীর্ণ একখণ্ড রুপোলি সৈকত আচমকা ঘন বনানীতে ছাওয়া পাহাড়গুলোর দিকে উঠে গেছে। ঘন আর সবুজ নারকেল গাছগুলো নেমে এসেছে জলের ধার পর্যন্ত। গাছের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে স্যামোয়াবাসীদের ঘাসের কুটির। এখানে-সেখানে সাদা ঝিলমিলে একটা ছোট্ট গির্জা।

মিসেস ডেভিডসন পাশে এসে দাঁড়ালেন। ওঁর পরনে কালো পোশাক। গলায় সোনার হার থেকে দুলছে ছোট্ট একটা ক্রুশ। ভদ্রমহিলার চেহারাটা ছোটোখাটো। মাথায় নিষ্প্রভ বাদামী চুলগুলো পরিপাটি করে বাঁধা। স্বচ্ছ প্যাঁশনের আড়ালে বড়ো বড়ো দুটি লাল চোখ। মুখখানা ভেড়ার মুখের মতো লম্বাটে, কিন্তু তাতে নির্বুদ্ধিতার কোনো ছাপ নেই—বরং তা প্রচণ্ড সতর্কতাময়। চলাফেরায় পাখির মতো দ্রুত ছন্দ। সবচাইতে বৈশিষ্ট্যময় জিনিস ওঁর কণ্ঠস্বর—চড়া, ধাতব, সুরের বিচ্যুতিবিহীন। কানে প্রচণ্ড একঘেয়ে লাগে, যন্ত্রচালিত তুরপুনের নির্মম ঝন-ঝনানির মতো তা বিরক্ত করে তোলে স্নায়ুগুলোকে।

'এটা দেখতে নিশ্চয়ই আপনাদের দেশের মতো লাগছে,' ডক্টর ম্যাকফেইল সচেষ্ট প্রয়াসে সামান্য হাসলেন।

'আমাদের দ্বীপগুলো নিচু, জানেন তো—এগুলোর মতো নয়। প্রবাল দ্বীপ। এগুলো আগ্নেয়। আমাদের পৌঁছুতে আরও দশদিন।'

'এ অঞ্চলে তার অর্থ, স্বদেশে প্রায় পাশের রাস্তা।' ডক্টর ম্যাকফেইল ঠাট্টার সুরে বললেন।

'এটা অবিশ্যি একটু বাড়িয়ে বলা হলো, তবে দক্ষিণ-সমুদ্রে দূরত্বটাকে অন্য দৃষ্টিতেই দেখা হয়। কাজেই সেদিক দিয়ে আপনি ঠিকই বলেছেন।'

ডক্টর ম্যাকফেইল একটা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'ভাগ্যি ভালো, এটা আমাদের কর্মস্থল নয়!' মিসেস ডেভিডসন বলতে থাকেন, 'সবাই বলে, কাজ করার পক্ষে এটা নাকি ভয়ঙ্কর কঠিন জায়গা। স্টিমার এসে লাগলেই এখানকার লোকগুলো অস্থির হয়ে ওঠে। তাছাড়া নৌবাহিনীর একটা ঘাঁটিও রয়েছে এখানে। সেটা স্থানীয় লোকদের পক্ষে ক্ষতিকর। আমাদের এলাকায় এ ধরনের কোনো অসুবিধে নেই। দু-একজন ব্যবসায়ী অবিশ্যি আছে, তবে তারা যাতে ভদ্রভাবে থাকে আমরা সেদিকে লক্ষ্য রাখি। হালচাল খারাপ দেখলে এমন উত্যক্ত করে তুলি যে তারা পালাতে পারলে বাঁচে।'

নাকের ওপর চশমাটা এঁটে ভদ্রমহিলা নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে সবুজ দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'মিশনারিদের পক্ষে এখানে কিছু করতে আসা প্রায় অর্থহীন। অন্তত এখানে যে আমাদের আসতে হয়নি, এ জন্যে ঈশ্বরের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।'

স্যামোয়ার উত্তরে একগুচ্ছ দ্বীপ নিয়ে ডেভিডসনদের এলাকা। দ্বীপগুলো পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন বলে ডেভিডসনকে প্রায়ই ক্যানোতে চেপে অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হয়। এই সমস্ত সময়ে তাঁর স্ত্রী সদর দফতরে থেকে মিশনের কাজকর্ম দেখাশুনো করেন। যে ধরনের দক্ষতায় উনি সে কাজ চালান, তা ভাবতেই ডক্টর ম্যাকফেইলের মনটা দমে যায়। যে নিদারুণ আবেগময় আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরে উনি স্থানীয় অধিবাসীদের নৈতিক অনাচারের কথা বলেন, তা কোন কিছুতেই চাপা পড়ে না। ওঁর শালীনতাবোধও অনন্যসাধারণ। পরিচয়ের প্রথম দিকেই উনি ডক্টর ম্যাকফেইলকে বলেছিলেন, 'জানেন তো, আমরা প্রথম যখন ওই দ্বীপগুলোতে থাকতে গেলাম তখন ওদের বিয়ের রীতিনীতিগুলো যে কি জঘন্য ছিলো তা আমি আপনাকে মুখ ফুটে বলতে পারবো না। তবে আমি মিসেস ম্যাকফেইলকে বলবো, উনি আপনাকে বলে দেবেন।'

তারপর ডক্টর ম্যাকফেইল তাঁর স্ত্রী এবং মিসেস ডেভিডসনকে ডেকচেয়ারে মগ্ন হয়ে বসে প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে গভীর আলোচনায় মগ্ন থাকতে দেখেছিলেন। ব্যায়াম করার জন্যে বারবার ওদের কাছ দিয়ে পায়চারি করার সময় তিনি তখন দূর থেকে ভেসে আসা খরস্রোতা পাহাড়ী নদীর তীব্র আওয়াজের মতো মিসেস ডেভিডসনের উত্তেজিত ফিসফিসানি শুনতে পেয়েছিলেন আর দেখেছিলেন, তাঁর স্ত্রী বিবর্ণ মুখে হাঁ করে একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা উপভোগ করছেন। উনি যা শুনেছিলেন তা সবই রাত্রিবেলা নিজেদের কেবিনে রুদ্ধশ্বাসে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন ডক্টর ম্যাকফেইলের কাছে।

'কি বলেছিলাম আপনাকে?' পরদিন সকালে মিসেস ডেভিডসন মহা উল্লাসে চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'এর চাইতে ভয়ঙ্কর কিছু আর শুনেছেন কখনও? যদিও আপনি একজন ডাক্তার, তবু কথাগুলো আমি নিজের মুখে আপনাকে বলতে পারিনি বলে আপনি নিশ্চয়ই অবাক হননি। তাই নয় কি?' বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াটুকু লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে মিসেস ডেভিডসন নাটকীয় আগ্রহ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডক্টর ম্যাক-ফেইলের মুখখানা দেখতে লাগলেন।

'প্রথম ওখানে গিয়ে কেন আমাদের মন দমে গিয়েছিলো, বুঝলেন তো? আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু তখন ওখানকার কোনো গ্রামে একটিও ভালো মেয়ে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতো না।'

'ভালো' শব্দটাকে উনি প্রচণ্ড গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছিলেন।

'মিঃ ডেভিডসন আর আমি এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলে ঠিক করেছিলাম, আমাদের প্রথম কাজ হবে ওদের নাচ বন্ধ করা। ওখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা নাচের নামে পাগল।'

'যুবক বয়সে আমারও নাচে অরুচি ছিলো না,' ডক্টর ম্যাকফেইল বললেন।

'গতকাল রাতে আপনি যখন মিসেস ম্যাকফেইলকে আপনার সঙ্গে একবারটি নাচতে বলছিলেন, আমি তখন তা শুনতে পেয়েছিলাম এবং তখনই এটা অনুমান করে নিয়েছিলাম। অবিশ্যি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে নাচলে সত্যিকারের কোনো ক্ষতি হয় বলে আমি মনে করি না, তবু উনি তখন নাচলেন না বলে আমি স্বস্তিই পেয়ে-ছিলাম। কারণ আমার মনে হয়েছিলো, এই পরিস্থিতিতে আমাদের বোধহয় সকলের সঙ্গে মাখামাখি না করে নিজেদের নিয়েই থাকা উচিত।'

'কোন পরিস্থিতিতে?'

মিসেস ডেভিডসন প্যাশনের ওধার থেকে ডক্টর ম্যাকফেইলের দিকে চকিতে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে ফের বলতে

লাগলেন, 'তবে শ্বেতাঙ্গদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তেমন নয়—যদিও মিঃ ডেভিডসন বলেন, স্ত্রী অন্য এক পুরুষের বাহুলগ্ন হয়ে নাচছে এ দৃশ্যটা একজন স্বামী কি করে সহ্য করে তা উনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না এবং বলতেই হবে, এ বিষয়ে আমিও মিঃ ডেভিডসনের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমার কথা বলতে গেলে, বিয়ের পর থেকে আজ অব্দি আমি কক্ষনো এক পাও নাচিনি। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের নাচ একটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ওটা শুধু যে অসভ্যতা তা-ই নয়, ওটা মানুষকে স্পষ্টতই অনৈতিকতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। যাই হোক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওটা আমরা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে পেরেছি। গত আট বছর আমাদের এলাকায় কেউ নাচেনি বললে আমি বোধহয় ভুল বলবো না।'

ইতিমধ্যে ওঁরা বন্দরের মুখে পৌঁছে গেছেন। মিসেস ম্যাকফেইলও এসে ওঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। জাহাজটা দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। স্থলবন্দী বন্দরটা পুরো এক বহর যুদ্ধ জাহাজ রাখার মতো বিশাল। চতুর্দিকে উঁচু খাড়াই সবুজ পাহাড়। প্রবেশপথের কাছেই একটা বাগানের মধ্যে দাঁড়ানো গভর্নরের বাড়িটা সমুদ্র থেকে ভেসে-আসা বাতাস পাচ্ছে। একটা পতাকা-দণ্ড থেকে অবসন্নের মতো ঝুলছে নিশানের নক্ষত্র ও ডোরা দাগগুলো। দু-তিনটে সুবিন্যস্ত বাংলো এবং একটা টেনিস কোর্ট পেরিয়েই ওঁরা সারি সারি গুদোমওলা জাহাজঘাটে পৌঁছে গেলেন। আঙুল তুলে তীর থেকে দু-তিনশো গজ দূরে নোঙর করে রাখা স্কুনারটা দেখালেন মিসেস ডেভিডসন। ওটাই তাঁদের অ্যাপিয়ায় নিয়ে যাবে। দ্বীপের সমস্ত অঞ্চল থেকে এসে ভিড় জমিয়েছে উৎসুক, কোলাহলময় খোসমেজাজী স্থানীয় বাসিন্দারা। কেউ এসেছে কৌতূহল মেটাতে আর অন্যেরা এসেছে সিডনিগামী যাত্রীদের সঙ্গে বিনিময় প্রথায় কিছু ব্যবসা সেরে নিতে। আনারস, বড়ো বড়ো কলার কাঁদি, 'তাপা' কাপড়, ঝিনুকের মালা বা হাঙরের দাঁত, 'কাভা' রাখার বাটি আর খেলনার রণতরী নিয়ে এসেছে ওরা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট, গোঁফ-দাড়ি কামানো, সরলমুখো মার্কিন নাবিকরাও ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের মধ্যে। আর রয়েছে সরকারী কর্মচারীদের ছোট্ট একটা দল। যতোক্ষণ মালপত্রগুলো নামানো হচ্ছিলো, ততোক্ষণ ম্যাকফেইল দম্পতি এবং মিসেস ডেভিডসন ওই জনসমাগম লক্ষ্য করতে লাগলেন। ডক্টর ম্যাকফেইল দেখলেন, অধিকাংশ শিশু এবং অল্পবয়সী ছেলেগুলো ইয়াজ নামে এক ধরনের বিশ্রী অসাড় ক্ষতে ভুগছে। জীবনে এই প্রথম গোদরোগে আক্রান্ত মানুষ দেখে তাঁর পেশাদার চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। বিশাল হাত বা প্রচণ্ড বিকৃত হয়ে ওঠা পা টেনে টেনে হাঁটাচলা করছে লোকগুলো। পুরুষ ও মহিলা সকলেরই পরনে স্থানীয় পোশাক লাভা-লাভা।

'ভারি অশালীন পোশাক,' মিসেস ডেভিডসন বললেন। 'মিঃ ডেভিডসন মনে করেন, এ পোশাক আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কোমরে একটুকরো লাল কাপড় জড়িয়ে রাখা ছাড়া আর কিছু না পরলেও ওরা নৈতিক চরিত্র বজায় রেখে চলবে, এ আপনি কি করে আশা করেন?'

'এ আবহাওয়ার পক্ষে পোশাকটা কিন্তু বেশ জুতসই,' কপাল থেকে ঘাম মুছে জবাব দিলেন ডাক্তার।

যদিও সবেমাত্র ভোর হয়েছে, তবু তীরে এসে নামার ফলে গরমটা এখনই বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছে। কাছের পাহাড়গুলো চতুর্দিক ঘিরে রেখেছে বলে এক ফোঁটা বাতাসও প্যাগো-প্যাগোতে এসে ঢুকতে পারে না।

'আমাদের এলাকায় আমরা লাভা-লাভা প্রায় দূর করে দিয়েছি বললেই চলে।' মিসেস ডেভিডসন উঁচু গলায় ফের বলতে লাগলেন, 'কিছু কিছু বুড়ো মানুষ এখনও ওসব পরে বটে, কিন্তু সে ওই পর্যন্তই। মেয়েরা সবাই লম্বা ঘাগড়া পরে, পুরুষরা পাতলুন আর ফতুয়া। আমরা ওখানে যাবার পর প্রথম দিককার একটা প্রতিবেদনে মিঃ ডেভিডসন লিখেছিলেন: যে সমস্ত বালকের বয়স দশের বেশি, তাদের প্রত্যেককে যতোদিন অব্দি পাতলুন পরতে বাধ্য করা না যাবে ততোদিন এই সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীরা কিছুতেই পুরোপুরি সভ্য হয়ে উঠবে না।'

ইতিমধ্যে মিসেস ডেভিডসন বন্দরের দিকে ভেসে-আসা ঘন ধূসর রঙের মেঘ-গুলোর দিকে দু-তিনবার যথারীতি পাখির মতো চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়েছিলেন। এবারে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও ঝরতে শুরু করলো।

'আমরা বরং কোনো ছাউনির নিচে গিয়ে দাঁড়াই চলুন,' উনি বললেন।

ভিড়ের সঙ্গে পথ করে ওরা ঢেউ-তোলা লোহার একটা বিশাল ছাউনির তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন আর বৃষ্টিও মুষলধারে ঝরতে শুরু করলো। খানিকক্ষণ বাদে মিঃ ডেভিডসনও এসে হাজির হলেন। জাহাজে ম্যাকফেইলদের সঙ্গে তিনি যথেষ্ট মার্জিত ব্যবহারই করেছেন। কিন্তু স্ত্রীর মতো মিশুকে স্বভাব তাঁর নেই, তাই অধিকাংশ সময়টা তিনি পড়াশুনো করেই কাটিয়েছেন। ভদ্রলোক একটু চুপচাপ, খানিকটা গোমড়ামুখোই বলা চলে। প্রকৃত খ্রীষ্টানের মতো অমায়িকতাকে তিনি যেন কর্তব্য হিসেবেই নিজের ওপরে চাপিয়ে দিয়েছেন। উনি স্বভাবে সংযত, একটু যেন বিষণ্ণও বটে। চেহারাটা অদ্ভুত। খুব লম্বা আর রোগা। লম্বা লম্বা হাত-পাগুলো যেন ঢিলে-ঢালাভাবে শরীরের সঙ্গে জোড়া। গাল দুটো গর্তে ঢোকা, চোয়ালের হাড় আশ্চর্য উঁচু। চেহারা আর হাবভাব এতোই নিষ্প্রাণ যে ভদ্রলোকের মোটা মোটা কামুক ঠোঁট দুটোকে দেখে অবাক হতে হয়। মাথায় খুব লম্বা লম্বা চুল রেখেছেন। কোটরগত

কালো চোখ দুটি আয়ত আর বিষণ্ণ। সুগঠিত হাত দুটিতে লম্বা লম্বা আঙুল, যা তাঁর চেহারায় রীতিমতো বলিষ্ঠতার ভাব এনে দিয়েছে। কিন্তু সবচাইতে লক্ষণীয় জিনিস হচ্ছে, ভদ্রলোককে দেখেই মনে হয় ওঁর মধ্যে যেন একটা চাপা আগুন রয়েছে। জিনিসটা মনের মধ্যে ছাপ রেখে যায় এবং কেমন যেন অস্বস্তিকর লাগে। উনি এমন মানুষ নন যাঁর সঙ্গে কোনো রকম অন্তরঙ্গতা গড়ে তোলা সম্ভব।

মিঃ ডেভিডসন সুসংবাদ নিয়ে আসেননি। এ দ্বীপে হামের মহামারী দেখা দিয়েছে। ক্যানাকাদের পক্ষে রোগটা গুরুতর এবং প্রায়শই তা মারাত্মক হয়ে ওঠে। যে স্কুনারটা ওঁদের নিয়ে পাড়ি দেবে, তার একজন মাঝিরও রোগটা হয়েছে। অসুস্থ মানুষটাকে তীরে এনে হাসপাতালে আলাদা করে রাখা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে অ্যাপিয়া থেকে তারবার্তায় নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, যতোক্ষণ না নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে যে মাঝি-মাল্লাদের মধ্যে আর কেউ ওই রোগে আক্রান্ত হয়নি ততোক্ষণ স্কুনার-টাকে বন্দরে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

'তার মানে এখানে আমাদের অন্তত দশটা দিন থাকতে হবে।'

'কিন্তু অ্যাপিয়ায় যাওয়া আমার বিশেষ দরকার,' ডক্টর ম্যাকফেইল বললেন।

'কিছু করার নেই। জাহাজে আর কারুর যদি ওই রোগ না হয় তাহলে শ্বেতাঙ্গ-দের নিয়ে স্কুনারটাকে ছাড়তে দেওয়া হবে, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের যাতায়াত করা তিন মাসের জন্যে সম্পূর্ণ বন্ধ।'

'এখানে কোনো হোটেল আছে?' মিসেস ম্যাকফেইল জিগেস করলেন।

ডেভিডসন ছোট্ট করে হাসলেন, 'না, নেই।'

'তাহলে আমরা কি করবো?'

'একটু আগেই আমি এ ব্যাপারে এখানকার গভর্নরের সঙ্গে কথা বলছিলাম। সমুদ্রের ধার বরাবর এক ব্যবসায়ীর কয়েকখানা ঘর আছে, সেগুলো সে ভাড়া দেয়। আমার প্রস্তাব, বৃষ্টিটা ধরলেই আমরা সেখানে গিয়ে দেখবো যদি কিছু করা যায়। আরাম পাবার আশা রাখবেন না—ঘুমোবার মতো একটা বিছানা আর মাথার ওপরে একটা ছাদ জুটলেই যথেষ্ট বলে মনে করতে হবে।'

কিন্তু বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণই নেই। শেষ অব্দি ছাতা আর বর্ষাতি নিয়ে ওঁরা বেরিয়ে পড়লেন। কোথাও শহর বলতে কিছু নেই—শুধু গুটিকয়েক সরকারী বাড়ি, দু-একটা দোকান আর পেছন দিকে নারকেল আর কলাগাছের ফাঁকে ফাঁকে স্থানীয় অধিবাসীদের কয়েকটা কুটির। ওঁরা যে বাড়িটার খোঁজ করছিলেন সেটা জাহাজঘাট থেকে প্রায় মিনিট পাঁচেকের পথ। কাঠের দোতলা বাড়ি, দু তলাতেই চওড়া বারান্দা, মাথায় ঢেউ-তোলা লোহার চাল। বাড়ির মালিক এক দো-আঁশলা, নাম হর্ন। লোকা-

টার স্ত্রী স্থানীয় মেয়ে, তাকে ঘিরে রেখেছে বাদামী রঙের কয়েকটা ছানাপোনা। বাড়ির একতলায় লোকটার একটা দোকান আছে, সেখানে সে টিনের কৌটোয় রাখা খাবারদাবার আর সুতির জিনিসপত্র বিক্রি করে। লোকটা ওঁদের যে ঘরটা দেখালো সেটা প্রায় আসবাবহীন বললেই চলে। ম্যাকফেইলদের ঘরে ছেঁড়া মশারিসহ একটা পুরনো জীর্ণ বিছানা, একটা নড়বড়ে কুর্সি আর একটা বেসিন ছাড়া কিছুই নেই। হতাশ হয়ে ওঁরা চারদিকে তাকাতে লাগলেন। বৃষ্টি তখনও অবিশ্রান্ত।

'যেটুকু নেহাতই দরকার, সেটুকু ছাড়া আমি আর কিছুই বার করছি না,' মিসেস ম্যাকফেইল বললেন।

উনি তোরঙ্গের তালা খুলছেন, এমন সময় মিসেস ডেভিডসন ঘরে এসে ঢুকলেন। ওঁর ভাবভঙ্গি ভারি প্রাণবন্ত আর তৎপর। বিরস পারিপার্শ্বিকতা ওঁর ওপরে কোনো ছায়াই ফেলতে পারেনি।

'আমার পরামর্শ যদি শোনেন তো এখুনি ছুঁচ-সুতো নিয়ে মশারিটা রিফু করতে শুরু করুন,' মিসেস ডেভিডসন বললেন, 'নইলে আজ রাতে এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারবেন না।'

'মশা কি খুবই বেশি?' ডক্টর ম্যাকফেইল জিগেস করলেন।

'এটাই ওদের মরশুম। অ্যাপিয়ায় গভর্নরের বাড়িতে নেমন্তন্নে গেলে দেখবেন, প্রত্যেক মহিলাকে একটা করে বালিশের ওয়াড় দেওয়া হচ্ছে তাঁদের ইয়ে···মানে তাঁদের নিম্নাঙ্গ ওর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখার জন্যে।'

'বৃষ্টিটা এক মুহূর্তের জন্যেও একটু থামলে পারতো,' মিসেস ম্যাকফেইল বললেন। 'রোদ উঠলে আমি একটু খুশি মনে ঘরটাকে আরামদায়ক করে তোলার চেষ্টা করতে পারতাম।'

'ওহ্, তাহলে আপনাকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগরে বলতে গেলে সবচাইতে বৃষ্টিবহুল জায়গা হচ্ছে প্যাগো-প্যাগো। পাহাড়গুলো আর ওই উপসাগরটাকে দেখছেন তো? ওরা জলকে আকর্ষণ করে। তাছাড়া বছরের এ সময়টাতে তো বৃষ্টি হবারই কথা।'

প্রথমে ডক্টর ম্যাকফেইল এবং তারপর তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন মিসেস ডেভিডসন। ঘরের মধ্যেই আলাদা আলাদা জায়গায় অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছেন দুজনে। ঠিক যেন দুটি উদভ্রান্ত মানুষ। নিজের ঠোঁট দুটি চেপে ধরলেন মিসেস ডেভিডসন। এ ধরনের নিস্তেজ মানুষ ওঁকে অধৈর্য করে তোলে, অথচ এমন স্বাভাবিক ভাবে সামনে এসে পড়ায় ঘরের সব কিছু গুছিয়ে ফেলার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে ওঁর হাত দুখানা।

'শুনুন, আমাকে একটা ছুঁচ আর সুতো দিন তো—আমি আপনাদের মশারিটা রিফু করে দিচ্ছি। আপনি ততোক্ষণ আপনাদের জিনিসপত্রগুলো নামাতে থাকুন। একটার সময় খাবার দেওয়া হবে। ডক্টর ম্যাকফেইল, আপনি বরং একবার জাহাজ-ঘাটায় গিয়ে দেখে আসুন, আপনাদের ভারি মালপত্রগুলো শুকনো জায়গায় রাখা হয়েছে কি না। এখানকার স্থানীয় লোকগুলো কেমন জানেন তো—সব সময় বৃষ্টি লাগবে এমন জায়গাতেও ওরা স্বচ্ছন্দে মালগুলো ফেলে রাখতে পারে।'

ফের বর্ষাতিটা পরে ডাক্তার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মিঃ হর্ণ তখন জাহাজের কোয়ার্টার মাস্টারের সঙ্গে কথা বলছিলো। ওদের সঙ্গে জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর আর একজন যাত্রী, যাকে ডাক্তার জাহাজে বেশ কয়েক বারই দেখেছেন। কোয়ার্টার মাস্টার লোকটার ছোটখাটো শুঁটকো চেহারা, বেজায় নোংরা। ডাক্তার পাশ দিয়ে যাবার সময় লোকটা ঘাড় নেড়ে বললো, 'হামটা সত্যিই ভারি ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে, ডাক্তারবাবু। তা আপনি তো দেখছি এর মধ্যেই নিজেদের বন্দোবস্ত সেরে ফেলেছেন!'

লোকটাকে খানিকটা গায়ে-পড়া বলে মনে হলো ডক্টর ম্যাকফেইলের। কিন্তু তিনি ভীতু স্বভাবের মানুষ, সহজে কারুর দোষ ধরেন না। তাই বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা ওপরতলায় একখানা ঘর পেয়েছি।'

'মিস টমসনও আপনাদের সঙ্গে অ্যাপিয়ায় যাচ্ছিলেন। তাই ওঁকে আমি এখানেই নিয়ে এলুম।'

কোয়ার্টার মাস্টার বুড়ো আঙুল তুলে তার পাশে দাঁড়ানো মহিলাটিকে দেখালো। মেয়েটির বয়স বছর সাতাশ, গোলগাল চেহারা, একটু স্থূল দৃষ্টিতে সুশ্রীই বলা চলে। ওর পরনে সাদা পোশাক, মাথায় বিশাল একটা সাদা টুপি। সাদা গ্রেজ কিডের উঁচু জুতোর ওপরে সুতির সাদা মোজার ভেতর থেকে স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুচ্ছে ওর পায়ের গোছ দুটো। ম্যাকফেইলের দিকে একচিলতে করুণার হাসি ছড়িয়ে মেয়েটি কর্কশ কণ্ঠে বললো, 'সবচাইতে পুঁচকে ঘরটার জন্যে লোকটা আমার কাছ থেকে দিনে দেড় ডলার করে খিঁচে নেবার তাল করছে।'

'আমি তোমাকে বলছি জো, ও আমার বন্ধু।' কোয়ার্টার মাস্টার বললো, 'ও এক ডলারের বেশি ভাড়া দিতে পারবে না। তোমাকে ওই ভাড়াতেই ওকে ঘর দিতে হবে।'

মোটাসোটা ব্যবসায়ীটি নিঃশব্দে হাসি ছড়ালো, 'আপনি ওভাবে বললে আর কি করবো মিঃ সোয়ান! দেখি কি করতে পারি। মিসেস হর্ণের সঙ্গে কথাবার্তা বলি—যদি আমাদের মনে হয় ভাড়া কমানো যায়, তাহলে অবশ্যই কমাবো।'

'আমার সঙ্গে ওসব চালাকি মারার চেষ্টা কোরো না,' মিস টমসন বললো। 'এখুনি সবকিছু ঠিক করে ফেলতে হবে। ঘরটার জন্যে তুমি দিনে এক ডলার করে পাবে, তার চাইতে এক আধলাও বেশি নয়।'

ডক্টর ম্যাকফেইল মৃদু হাসলেন। মেয়েটির দরদস্তুর করার ধৃষ্ট ভঙ্গিমাটুকুকে তারিফ করলেন উনি। তাঁর কাছে যে যা দর চায় তিনি সর্বদা তাই-ই দিয়ে থাকেন —তিনি ওই ধরনেরই মানুষ। দর কষাকষি নিয়ে তর্কাতর্কির চাইতে বেশি দাম দেওয়াটাই তিনি শ্রেয় বলে মনে করেন।

ব্যবসায়ীটি এবারে দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'ঠিক আছে, মিঃ সোয়ানের খাতিরে আমি তা-ই নেবো।'

'ওই হচ্ছে আমার মালপত্র,' মিস টমসন বললো। 'ভেতরে এসে এক পাত্তর খেয়ে যাও। মিঃ সোয়ান, আমার কাছে কিছু ভালো মদ আছে—ওটা তুমি ভেতরে বয়ে নিয়ে এলে একটু পাবে। আপনিও আসুন, ডাক্তারবাবু।'

'না, আমি যেতে পারছি না—ধন্যবাদ,' জবাব দিলেন ডাক্তার। 'আমি একটু দেখতে যাচ্ছি আমাদের মালপত্রগুলো সব ঠিকঠাক আছে কি না।'

বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন উনি। বন্দরের খোলা মুখ দিয়ে চাদরের মতো ঝেঁটিয়ে আসছে বৃষ্টিধারা। বিপরীত তীরে সবকিছু ঝাপসা। দু-তিনজন স্থানীয় বাসিন্দাকে পেরিয়ে গেলেন ডক্টর ম্যাকফেইল। ওদের পরনে লাভা-লাভা ছাড়া আর কোনো পোশাক নেই, মাথায় বিশাল ছাতা। সুন্দর, ঋজু আর অলস ভঙ্গিমায় হেঁটে গেলো ওরা। যেতে যেতে মৃদু হেসে এক অজানা ভাষায় অভিবাদন জানিয়ে গেলো ডাক্তারকে।

ডক্টর ম্যাকফেইল যখন ফিরে এলেন তখন খাওয়ার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। খাবার দেওয়া হয়েছে হর্ণের বৈঠকখানা-ঘরে। ঘরটা ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করা হয়নি, হয়েছে মালিকের জাঁক দেখাবার খাতিরে। একদফা মখমলের চাদর দেয়ালের চারধারে সযত্নে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। ছাদের মাঝখান থেকে ঝুলছে গিলটি-করা একটা ঝাড়বাতি। মাছি আটকাবার জন্যে ঝাড়বাতিটা হলদে রঙের টিস্যু কাগজে মোড়া। ডেভিডসন তখনও আসেননি।

'আমি জানি, উনি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন,' মিসেস ডেভিডসন বললেন, 'এবং আমার ধারণা, গভর্নর ওঁকে খেয়ে আসার জন্যে আটকে রেখেছেন।'

ছোটোখাটো চেহারার একটি স্থানীয় মেয়ে ওঁদের জন্যে হ্যামবার্গার স্টেক নিয়ে এলো এবং একটু পরেই, ওঁরা প্রয়োজনীয় সবকিছু পেয়েছেন কি না দেখার জন্যে, হাজির হলো স্বয়ং মিঃ হর্ণ।

'মিঃ হর্ণ, আমাদের আরও একজন সহযাত্রী আছেন না?' ডক্টর ম্যাকফেইল জিগেস করলেন।

'ও শুধু একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে, ব্যাস। নিজের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ও নিজেই করবে।' হর্ণ বিগলিত ভঙ্গিমায় মহিলা দুজনের দিকে তাকালো, 'আপনাদের যাতে ওর মুখোমুখি হতে না হয়, তাই আমি ওকে একতলায় রেখেছি। ও আপনা-দের কোনো অসুবিধে করবে না।'

'উনি কি জাহাজে ছিলেন?' প্রশ্ন করলেন মিসেস ম্যাকফেইল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ম্যাডাম—ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলো। অ্যাপিয়ায় যাচ্ছিলো। সেখানে ও একটা ক্যাশিয়ারের চাকরি পেয়েছে।'

'ও।'

হর্ণ চলে যেতে ম্যাকফেইল বললেন, 'নিজের ঘরে বসে খাওয়াদাওয়া সারতে মহিলার খুব একটা ভালো লাগবে বলে মনে হয় না।'

'দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনে থাকলে সম্ভবত লাগবে,' বললেন মিসেস ডেভিডসন। 'কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মহিলাটি কে হতে পারে।'

'কোয়ার্টার মাস্টার যখন মেয়েটিকে নিয়ে আসে, তখন আমি ওখানেই ছিলাম। ওর নাম টমসন।'

'গতকাল রাতে ওই মেয়েটাই কোয়ার্টার মাস্টারের সঙ্গে নাচছিলো না কি?' মিসেস ডেভিডসন জিগেস করলেন।

'নিশ্চয়ই তাই,' মিসেস ম্যাকফেইল বললেন। 'আমি তখনই ভাবছিলাম, মেয়েটা কে। দেখে মনে হয়েছিলো একটু যেন ছেনাল প্রকৃতির।'

মিসেস ডেভিডসন বললেন, 'মোটেই সুরুচিসম্পন্ন নয়।'

ওঁরা অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। তারপর খানা শেষ করে যে যার ঘরে শুতে চলে গেলেন—কারণ অনেক ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হয়েছিলো বলে প্রত্যেকেই তখন ক্লান্ত। ঘুম যখন ভাঙলো আকাশটা তখনও ধূসর, মেঘগুলো ঝুলে রয়েছে নিচু হয়ে। তবে বৃষ্টি হচ্ছে না, তাই উপসাগরের কোল ঘেঁষে মার্কিনীদের তৈরি করা রাস্তাটা ধরে ওঁরা একটু পায়ে হেঁটে বেড়াতে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন, ডেভিডসন তখুনি সবেমাত্র বাড়িতে ফিরেছেন। উত্তেজিত স্বরে উনি বললেন, 'এখানে আমাদের হয়তো পনেরো দিনও থাকতে হতে পারে। গভর্নরকে আমি অনেক বোঝালাম। কিন্তু উনি বললেন, কিছুই করার নেই।'

'মিঃ ডেভিডসন তাড়াতাড়ি গিয়ে নিজের কাজে যোগ দিতে চাইছিলেন,' স্বামীর দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন মিসেস ডেভিডসন।

'এক বছর ধরে আমরা বাইরে রয়েছি।' বারান্দায় পায়চারি করতে করতে মিঃ ডেভিডসন বলতে লাগলেন, 'মিশনের দায়িত্ব রয়েছে দেশী মিশনারিদের হাতে। পাছে তারা সবকিছু নষ্ট করে ফেলে, সেই ভেবে আমি ভয়ানক উদ্বিগ্ন। ওরা ভালো মানুষ, ওদের বিরুদ্ধে আমি একটি কথাও বলছি না। ওরা ধর্মভীরু, ভক্তজন এবং সত্যিকারের খ্রীষ্টান। ওদের ধর্মপ্রাণতা আমাদের দেশের তথাকথিত বহু খ্রীষ্টানকেই লজ্জায় লাল করে তুলবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা ওদের মধ্যে একেবারেই নেই। ওরা একবার উঠে দাঁড়াতে পারে, দুবার পারে, কিন্তু বারবার পারে না। একজন দেশী মিশনারির হাতে মিশনের দায়দায়িত্ব তুলে দিলে, তাকে যতো বিশ্বস্ত বলেই মনে হোক না কেন, কিছুদিন বাদে দেখবে প্রতিষ্ঠানের কাজে সে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে।'

মিঃ ডেভিডসন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওঁর দীর্ঘ কৃশ চেহারা আর পাংশুল মুখে ঝকঝকে আয়ত দুটি চোখ মনের মধ্যে গভীর ছাপ রেখে যায়। আগ্রেয় অঙ্গভঙ্গিমা আর গম্ভীর নিনাদিত কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে ওঁর একান্ত আন্তরিকতা।

'আমি চাই আমার কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক। আমি সেইমতো কাজ করবো এবং সেটা করবো অবিলম্বে। গাছটা পচে গেলে সেটাকে কেটেকুটে আগুনেই বিসর্জন দেওয়া হবে।'

দিনের শেষ খানা—চা-জলখাবার খাওয়ার পর সেদিন সন্ধ্যাবেলা সকলে যখন হতশ্রী বৈঠকখানা ঘরটাতে বসে রয়েছেন, মেয়েরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত আর ডক্টর ম্যাকফেইল তামাকের নলে ধূমপান করছেন, তখন মিঃ ডেভিডসন ওই দ্বীপগুলোতে তাঁর কাজকর্মের কথা সকলকে বললেন।

'আমরা যখন ওখানে যাই তখন পাপ সম্পর্কে ওদের মনে কোনো ধারণাই ছিলো না।' উনি বললেন, 'ওরা তখন একটার পর একটা অনুশাসন ভাঙতো, অথচ বুঝতেই পারতো না যে ওরা অন্যায় করছে। আমার ধারণা, ওটা ছিলো আমার কাজের সবচাইতে কঠিন অংশ—স্থানীয় মানুষদের মনে পাপবোধের অনুভূতি ঢুকিয়ে দেওয়া।'

ম্যাকফেইলরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন, স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবার আগে ডেভিডসন পাঁচ বছর সলোমন দ্বীপপুঞ্জে কাজ করেছেন। মিসেস ডেভিডসন চীনে একজন মিশনারি হিসেবে কাজ করতেন। বোস্টনে ওঁদের পরিচয়, মিশনারিদের এক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্যে ওঁরা দুজনেই তখন ছুটির কয়েকটা দিন সেখানে কাটাচ্ছিলেন। বিয়ের পরে ওঁদের এই দ্বীপগুলোতে পাঠানো হয় এবং সেই থেকে ওঁরা এখানেই

কাজ করে যাচ্ছেন।

মিঃ ডেভিডসনের সঙ্গে সমস্ত রকমের আলাপ-আলোচনা কথাবার্তার ভেতর দিয়ে একটা জিনিস একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে, সেটা হচ্ছে মানুষটির অসীম সাহস। উনি একজন চিকিৎসক, কাজেই যে কোনো দ্বীপে যে কোনো সময়ে তাঁর ডাক পড়তে পারে। বর্ষার দিনে ঝড়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা প্রশান্ত মহাসাগরে হোয়েল বোটও খুব একটা নিরাপদ যান নয়। কিন্তু প্রায়ই তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে ক্যানো পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেটা সত্যিই খুব বিপজ্জনক। অসুখ-বিসুখ বা দুর্ঘটনা হলে তিনি কোনোদিনও কোথাও যেতে দ্বিধা করেন না। বহুবার অন্যের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে তিনি সারাটা রাত নৌকোর জল সেচে কাটিয়ে দিয়েছেন এবং একাধিকবার মিসেস ডেভিডসনও চিরদিনের মতো তাঁর ফেরার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

'মাঝে মাঝে আমি ওকে না যাবার জন্যে মিনতি করি, কিংবা আবহাওয়াটা অন্তত ফের একটু শান্ত হয়ে ওঠা অব্দি অপেক্ষা করতে বলি। কিন্তু উনি কোনোদিনও সে সমস্ত কথা কানে তোলেন না।' মিসেস ডেভিডসন বললেন, 'আসলে উনি ভীষণ জেদী, একবার মনস্থির করলে কোনো কিছুই ওঁকে টলাতে পারে না।'

'আমি নিজেই যদি ভয় পাই, তাহলে কি করে আমি স্থানীয় অধিবাসীদের ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে বলবো?' মিঃ ডেভিডসন উঁচু গলায় বলে উঠলেন। 'আমি ভয় পাই না, সত্যিই আমি ভয় পাই না। ওরা জানে, বিপদে পড়ে ওরা যদি আমাকে ডেকে পাঠায় তাহলে মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হলে আমি নিশ্চয়ই যাবো। আপনারা কি মনে করেন, ঈশ্বরের কাজে যাবার সময় তিনি নিজেই আমাকে ত্যাগ করে যাবেন? তাঁরই নির্দেশে বাতাস বয়, তাঁরই কথায় ঢেউ ওঠে-পড়ে, গর্জন করে।'

ডক্টর ম্যাকফেইল ভীরু প্রকৃতির মানুষ। ট্রেঞ্চের ওপরে গুলি-গোলা ফাটার গর্জনে তিনি কোনোদিনও অভ্যস্ত হতে পারেননি। অগ্রবর্তী কোনো ঘাঁটিতে অপারেশন করার সময় নিজের কেঁপে কেঁপে ওঠা হাত দুটোকে সংযত করার চেষ্টায় তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম নেমে এসে চশমার কাচ দুটোকে ঝাপসা করে তুলতো। মিশনারি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে তিনি সামান্য শিউরে উঠলেন, 'আমি যদি বলতে পারতাম, আমি কোনোদিনও ভয় পাইনি—তাহলে খুব খুশি হতাম!'

'আপনি যদি বলতে পারতেন, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন—তাহলে আমি খুব খুশি হতাম,' অন্যজন জবাব দিলেন।

যে কোনো কারণেই হোক, সেদিন মিশনারিটির চিন্তাধারা পেছনের দিকে ফিরে যাচ্ছিলো—মনে পড়ছিলো স্ত্রীকে নিয়ে ওই দ্বীপগুলোতে কাটানো প্রথম দিককার

দিনগুলোর কথা।

'মাঝে মাঝে আমি আর মিসেস ডেভিডসন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আমাদের দু গাল বেয়ে চোখের জল নেমে আসতো। আমরা দিন-রাত লাগাতার কাজ করে যেতাম, অথচ মনে হতো একটুও এগুতে পারিনি। তখন মিসেস ডেভিডসন কাছে না থাকলে আমি কি করতাম জানি না। যখন মন ভেঙে যেতো, প্রায় হতাশ হয়ে পড়তো—তখন উনি আমাকে সাহস দিতেন, আশা যোগাতেন।'

মিসেস ডেভিডসন হাতের কাজটার দিকে দৃষ্টি নামিয়ে রাখলেন। ওঁর কপোল দুটিতে মৃদু গোলাপি আভাস, হাত দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে সামান্য। নিজের কণ্ঠস্বরে আস্থা রাখতে পারছিলেন না উনি।

'তখন আমাদের সাহায্য করার মতো কেউ ছিলো না। আমরা ছিলাম নিঃসঙ্গ, আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, অন্ধকারে ঘেরা অবস্থায়। আমি ভেঙে পড়লে কিংবা অবসন্ন হয়ে উঠলে, মিসেস ডেভিডসন হাতের কাজ নামিয়ে রেখে বাইবেলটা তুলে নিয়ে আমাকে পড়ে শোনাতেন—যতোক্ষণ না শিশুর চোখের পাতায় নেমে আসা ঘুমের মতো শান্তি নেমে আসতো আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। অবশেষে বইটা বন্ধ করে উনি বলতেন, 'ওদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা ওদের ত্রাণ করবো'। ফের ঈশ্বর সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস অনুভব করে আমি তখন জবাব দিতাম, 'হ্যাঁ, ঈশ্বরের করুণা পেলে আমি ওদের ত্রাণ করবোই—নিশ্চয়ই করবো।'

এগিয়ে গিয়ে টেবিলটার সামনে দাঁড়ালেন মিঃ ডেভিডসন, যেন উনি গির্জায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

'বুঝতেই পারছেন, স্বাভাবিক ভাবেই ওদের নৈতিক চরিত্র এতো কলুষিত ছিলো যে নিজেদের দুর্নীতিগুলোও ওদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যেতো না। ওরা যেগুলোকে স্বাভাবিক আচরণ বলে মনে করতো, সেগুলোকেই আমাদের অপরাধ বলে ঘোষণা করতে হয়েছিলো। আমাদের বলতে হয়েছিলো শুধু ব্যভিচার, মিথ্যে বলা আর চুরি করাই পাপ নয়—শরীর অবারিত করা, নাচা এবং গির্জায় না আসাও পাপ। আমি নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলাম, মেয়েদের বুক খুলে রাখা আর ছেলেদের পাতলুন না পরাও অপরাধ।'

'কি করে?' ডক্টর ম্যাকফেইল বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।

'আমি জরিমানা প্রথা চালু করলাম। কোনো একটা কাজ অন্যায় কিনা সেটা মানুষকে বোঝাবার একমাত্র উপায়, তেমন কাজ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া। ওরা গির্জায় না এলে আমি ওদের জরিমানা করতাম, নাচলে জরিমানা করতাম, সঠিক ভাবে পোশাক না পরলেও জরিমানা করতাম। জরিমানার একটা তালিকাও আমি

তৈরি করে রেখেছিলাম। প্রতিটি পাপের জন্তে নগদ টাকায় কিংবা গায়ে খেটে জরিমানা দিতে হতো। শেষ পর্যন্ত আমি ব্যাপারটা ওদের বোঝাতে পেরেছিলাম।'

'ওরা কি কখনও জরিমানা দিতে নারাজ হয়নি?'

'কি করে হবে?'

'মিঃ ডেভিডসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গেলে সাহসী লোকের প্রয়োজন,' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বললেন মিসেস ডেভিডসন।

ডক্টর ম্যাকফেইল বিব্রত দৃষ্টিতে ডেভিডসনের দিকে তাকালেন। কথাটা তাঁকে আঘাত করলেও নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করতে তাঁর দ্বিধা লাগছিলো।

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, শেষ পন্থা হিসেবে আমি ওদের গির্জার সদস্যপদ খারিজ করে দিতে পারি।'

'তাতে ওদের কিছু এসে যায় কি?'

ডেভিডসন মৃদু হেসে আস্তে আস্তে নিজের হাতে হাত ঘষলেন, 'সে ক্ষেত্রে ওরা ওদের নারকেলের শাঁস বিক্রি করতে পারবে না, মাছ ধরা হলে তার ভাগ পাবে না —তার মানে প্রায় উপোস করে থাকা, আর কি। কাজেই ওদের তাতে এসে যায় বইকি।'

'ওঁকে ফ্রেড ওলসনের কথাটা বলো না,' মিসেস ডেভিডসন বললেন।

'ফ্রেড ওলসন বলে এক ওলন্দাজ ব্যবসায়ী বহু বছর ধরে ওই দ্বীপে থাকতো। ব্যবসায়ীরা যেমন হয়ে থাকে, ওই লোকটাও তেমনি বেশ বড়োলোকই ছিলো। আমরা দ্বীপে যাওয়াতে লোকটা খুব একটা খুশি হয়নি। কারণ বুঝতেই পারছেন, সে নিজের ইচ্ছেমতো যা খুশি তাই করতো। নিজের খুশিমতো দরে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে নারকেলের শাঁস কিনতো—অন্য কোনো জিনিস বা হুইস্কি দিয়ে দাম মেটাতো। একটি এদেশী স্ত্রী ছিলো লোকটার, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি সে আদৌ বিশ্বস্ত ছিলো না। এদিকে ছিলো প্রচণ্ড মাতাল। আমি তাকে চরিত্র শুধরে নেবার সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা নেয়নি। আমাকে সে উপহাস করেছিলো।'

শেষ কথাগুলো বলার সময় মিঃ ডেভিডসনের কণ্ঠস্বর একেবারে খাদে নেমে গেলো। দু-এক মিনিট নিশ্চুপ হয়ে রইলেন উনি। স্তব্ধতা ভারি হয়ে উঠলো আতঙ্কের আভাসে।

'দু বছরের মধ্যে লোকটার চূড়ান্ত সর্বনাশ হয়ে গেলো। পঁচিশ বছর ধরে সে যা কিছু সঞ্চয় করেছিলো, তা সবই খুইয়ে ফেললো। আমিই তার সর্বনাশ করেছিলাম। শেষ অব্দি সে ভিখিরির মতো আমার কাছে আসতে বাধ্য হয়—এসে সিডনিতে ফিরে যাবার জন্তে জাহাজের ভাড়া চায়।'

'লোকটা যখন মিঃ ডেভিডসনের সঙ্গে দেখা করতে এলো, তখন তাকে যদি দেখতেন!' মিসেস ডেভিডসন বললেন, 'আগে তার দিব্যি বলিষ্ঠ চেহারা ছিলো, গায়ে যথেষ্ট মেদ, দরাজ গলা। আর তখন তার চেহারা অর্ধেক হয়ে গেছে, সমস্ত শরীর কাঁপছে, হঠাৎ যেন বুড়ো হয়ে গেছে লোকটা।'

অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে বাইরে রাতের অন্ধকারের দিকে তাকালেন মিঃ ডেভিডসন। ফের বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

হঠাৎ নিচ থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। ডেভিডসন মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্নালু চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। আওয়াজটা কলের গানের। কর্কশ, চড়া, কাটা-কাটা একটা সুর খ্যাসখ্যাস করে বেরিয়ে আসছে যন্ত্রটা থেকে।

'ওটা কি?' জিগেস করলেন ডেভিডসন।

মিসেস ডেভিডসন প্যাশনেটা আরও ভালোভাবে নাকের ওপর এঁটে নিলেন, 'দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন যাত্রী এ বাড়িতে একটা ঘর নিয়েছে। আওয়াজটা সম্ভবত সেখান থেকেই আসছে।'

ওঁরা নীরবে শুনতে থাকেন। একটু পরেই নাচের শব্দ শোনা যায়। তারপর বাজনা থামে, ভেসে আসে বোতলের ছিপি খোলার মৃদু শব্দ আর উঁচু গলায় উচ্ছল কথামালা।

'মনে হচ্ছে মেয়েটি ওর জাহাজী বন্ধুদের বিদায় জানাবার জন্যে একটু খানা-পিনার আয়োজন করেছে,' ডক্টর ম্যাকফেইল বললেন। 'জাহাজ তো বারোটায় ছাড়ছে, তাই না?'

ডেভিডসন কোনো মন্তব্য না করে নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকালেন। তারপর স্ত্রীকে জিগেস করলেন, 'তোমার হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।' মিসেস ডেভিডসন হাতের সেলাইটা ভাঁজ করে উঠে দাঁড়ালেন।

'শুতে যাবার পক্ষে সময়টা বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে গেলো না?' ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

'আমাদের অনেক পড়াশুনো আছে,' ডেভিডসন বললেন। 'আমরা যেখানেই থাকি না কেন, রাতে শুতে যাবার আগে বাইবেলের একটা অধ্যায় পাঠ করি, তার টিকা-টিপ্পনিগুলো পড়ি, তারপর সেটা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করি। এটা মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পক্ষে এক অপূর্ব অনুশীলন।'

দুটি দম্পতিই পরস্পরকে শুভরাত্রি জানালেন। ডক্টর আর মিসেস ম্যাকফেইল একা একা বসে রইলেন। দু-তিন মিনিট দুজনেই নির্বাক। শেষ অব্দি ডাক্তার বললেন,

'আমি বরং তাসগুলো নিয়ে আসি।'

মিসেস ম্যাকফেইল দ্বিধান্বিত চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন। ডেভিডসনদের কথাবার্তা ওঁকে খানিকটা অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। অথচ ডেভিডসনরা যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন বলে এখন তাসটা বোধহয় না খেললেই ভালো হয়—এ কথাটা ওঁর কিছুতেই বলতে ইচ্ছে করছে না। ডক্টর ম্যাকফেইল তাস নিয়ে এসে পেশেন্স খেলার জন্যে সেগুলোকে বিছিয়ে ফেললেন, আবছা একটা অপরাধবোধ নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন মিসেস ম্যাকফেইল। নিচে তখনও পানভোজনের একটানা আওয়াজ হয়ে চলেছে।

পরের দিনটা বেশ ভালোই। পনেরোটা দিন বিনা-কাজে বাধ্য হয়ে প্যাগো-প্যাগোতে পড়ে থাকতে হবে বলে ম্যাকফেইল দম্পতি সময়টা যথাসম্ভব ভালোভাবে কাটাবার জন্যে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। জাহাজঘাটায় গিয়ে ওঁরা বাক্স-প্যাঁটরা খুলে বেশ কয়েকটা বই বার করে আনলেন। ডাক্তার নৌ-হাসপাতালে গিয়ে সেখানকার প্রধান শল্য চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করে, তাঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে রোগীদের দেখলেন। গভর্নরের বাড়িতেও ওঁরা কার্ড রেখে এলেন। পথে মিস টমসনের সঙ্গে ওঁদের দেখা হলো। ডাক্তার টুপি খুলে অভিবাদন জানালেন, মেয়েটিও উঁচু গলায় উচ্ছল স্বরে বললো, 'সুপ্রভাত ডাক্তারবাবু!' ওর পরনে আগের দিনের মতোই সাদা ফ্রক। ওর উঁচু গোড়ালির চকচকে সাদা জুতো আর তার ওপরের দিকে ফুলে-ফেঁপে ওঠা মোটা মোটা পায়ের গোছ এই বিদেশের পরিবেশে কেমন যেন অদ্ভুত বেখাপ্পা বলে মনে হলো।

বাড়িতে ফিরে ওঁরা দেখলেন, মেয়েটি হর্নের একটা কেলে বাচ্চার সঙ্গে বারান্দায় খেলা করছে।

'ওর সঙ্গে দু-একটা কথা বলো,' ডক্টর ম্যাকফেইল ফিসফিসিয়ে স্ত্রীকে বললেন। 'এখানে ও একেবারে একা। এভাবে ওকে উপেক্ষা করলে সেটা খানিকটা অমানবিক বলে মনে হবে।'

মিসেস ম্যাকফেইল স্বভাবে লাজুক, কিন্তু স্বামীর কথা মেনে চলাই ওঁর অভ্যেস। তাই খানিকটা বোকার মতোই উনি মিস টমসনকে বললেন, 'আমরা তাহলে এই একই বাড়িতে এসে উঠেছি!'

'এমন একটা জঘন্য বাড়িতে এভাবে বন্দী হয়ে থাকা কি ভয়ঙ্কর, তাই না?' মিস টমসন জবাব দিলো। 'আর ওরা আমাকে বলছে, আমার ভাগ্যি ভালো—একখানা ঘর পেয়েছি। আমাকে তো আর কোনো এদেশী লোকের বাড়িতে গিয়ে উঠতে হয়নি! অনেককে তো তাই-ই করতে হয়েছে। কেন যে এদের কোনো

হোটেল-ফোটেল নেই, জানিনে।'

আরও কয়েকবার ওঁদের মধ্যে বাক-বিনিময় হলো। মিস টমসন চড়া গলায় অনর্গল কথা বলতে থাকে। স্পষ্টই বোঝা যায় ও এমনিভাবে গালগল্প চালিয়ে যেতে উৎসুক। কিন্তু মিসেস ম্যাকফেইলের ছোটোখাটো কথার ভাণ্ডার বড্ড সীমিত। তাই খানিকক্ষণের মধ্যেই উনি বললেন, 'এবারে আমরা তাহলে ওপরে যাই।'

সন্ধ্যাবেলা ওঁরা চা-জলখাবার নিয়ে বসেছেন, এমন সময় ডেভিডসন ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'নিচের তলায় মেয়েটির ওখানে দেখলাম কয়েকজন নাবিক বসে রয়েছে। ওদের সঙ্গে মেয়েটির কি করে আলাপ-পরিচয় হলো, ভেবে পাচ্ছি না।'

'ও খুব একটা লোক বুঝে আলাপ করে বলে মনে হয় না,' মিসেস ডেভিডসন বললেন।

একটা অলস উদ্দেশ্যহীন দিন কাটিয়ে সকলেই তখন খানিকটা ক্লান্ত।

ডক্টর ম্যাকফেইল বললেন, 'পনেরোটা দিন এইভাবে চললে শেষ অব্দি আমাদের কেমন লাগবে জানি না।'

'একমাত্র উপায় হচ্ছে, বিভিন্ন কাজের জন্যে দিনটাকে ভাগ করে নেওয়া,' জবাব দিলেন মিঃ ডেভিডসন। 'আমি পড়াশুনোর জন্যে কয়েকটা ঘণ্টা আলাদা করে রাখবো। আর কয়েকটা ঘণ্টা রাখবো ব্যায়ামের জন্যে—তা সে বৃষ্টি হোক বা না হোক—বর্ষার দিনে বৃষ্টির দিকে নজর রাখতে গেলে চলে না। তা ছাড়া আর কয়েকটা ঘণ্টা থাকবে অবসর বিনোদনের জন্যে।'

ডক্টর ম্যাকফেইল আশঙ্কিত দৃষ্টিতে তাঁর সঙ্গীটির দিকে তাকালেন। ডেভিডসনের কর্মসূচী তাঁকে দমিয়ে দিয়েছিলো। এ বেলাতেও ফের তাঁরা সেই হ্যামবার্গারই খাচ্ছেন। মনে হচ্ছে এ বাড়ির পাচক এই একটা জিনিসই তৈরি করতে জানে। তারপরেই নিচে কলের গান বাজতে শুরু করলো। ডেভিডসন আওয়াজটা শুনেই বিচলিত হয়ে চমকে উঠলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। পুরুষ মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। মিস টমসনের অতিথিরা একটা সুপরিচিত গানের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে। পরক্ষণেই ওঁরা মিস টমসনের গলাও শুনতে পেলেন—চড়া আর কর্কশ গলা। খুব চিৎকার চেঁচামেচি আর হাসাহাসি চলেছে ওখানে। ওপরের তলায় এঁরা চারজন কথাবার্তা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্লাসের ঠুংঠাং শব্দ আর কুর্সি টেনে নেবার আওয়াজ শুনতে পেলেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ওখানে আরও লোকজন এসেছে।

ডেভিডসন ও ম্যাকফেইলের মধ্যে চলতে থাকা ডাক্তারি আলোচনাটা ভেঙে দিয়ে আচমকা মিসেস ম্যাকফেইল বলে উঠলেন, 'মেয়েটা কি করে ওদের সবাইকে

এনে জোটালো, ভেবে পাচ্ছি না।'

কথাতেই বোঝা গেলো, এতোক্ষণ ওঁর চিন্তাধারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। ডেভিডসনের মুখেও পেশীর কুঞ্চন বুঝিয়ে দিলো, বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বললেও এতোক্ষণ তাঁর মনটাও ওই একই দিকে ব্যস্ত ছিলো। হঠাৎ—ডাক্তার যখন ফ্ল্যানডার্স সীমান্তে তাঁর কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা খানিকটা নীরস গদ্যে বর্ণনা করছেন, তখন মিঃ ডেভিডসন একটা চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন।

'কি হলো, অ্যালফ্রেড ?' মিসেস ডেভিডসন জিগেস করলেন।

'ঠিক তাই ! এতোক্ষণ আমার একবারের জন্যেও মনে হয়নি। মেয়েটা আই-উইলি থেকে এসেছে।'

'হতে পারে না।'

'হনলুলু থেকে ও জাহাজে চেপেছিলো। এবারে সবকিছু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আর এখানেও ও ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে।' প্রচণ্ড ঘৃণায় শেষ শব্দটা উচ্চারণ করলেন ডেভিডসন।

'আইউইলিটা কি ?' মিসেস ম্যাকফেইল জানতে চাইলেন।

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকালেন ডেভিডসন। তারপর আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে ওঠা কণ্ঠস্বরে বললেন, 'ওটা হনলুলুর কুখ্যাত অঞ্চল। লাল বাতির এলাকা। আমাদের সভ্যতার কলঙ্ক।'

শহরের প্রান্তভাগে আইউইলি অঞ্চল। বন্দরের কাছাকাছি অন্ধকার গলিগুলো দিয়ে এগিয়ে একটা নড়বড়ে সাঁকো পেরোলে খানাখন্দে ভরা একটা নির্জন রাস্তা পড়বে। আর তারপরেই আপনি আচমকা আলোয় গিয়ে হাজির হবেন। সেখানে রাস্তার দু ধারে গাড়ি রাখার জায়গা, যান্ত্রিক পিয়ানোর আওয়াজে মুখর আর জমকালো আলোয় রুচিহীনভাবে সাজানো অনেক সাধারণ ভোজনগৃহ, নাপিতের দোকান, আর সিগারেটের দোকান। সেখানে বাতাসে শুধু চঞ্চলতা আর প্রত্যাশিত বিনোদনের অনুভূতি। এবারে আপনি একটা সরু গলি ধরে ডাইনে বা বাঁয়ে গেলেই আইউইলির মাঝখানে পৌঁছে যাবেন—কারণ গলিটা আইউইলিকে দু ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। এখানে রাস্তার ধারে নিখুঁত সবুজ রঙ করা ছোটো ছোটো ছিমছাম বাংলোর সারি। বাড়িগুলোর মাঝখানকার রাস্তা বেশ চওড়া আর সোজা। জায়গাটা যেন উদ্যান-নগরীর মতো সাজানো-গোছানো। সম্রান্ত সুষমতা, সুশৃঙ্খলা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় জায়গাটা মনের মধ্যে এক ঘৃণিত আতঙ্কের ছাপ রেখে যায়। কারণ প্রেমপিয়াসীর যাত্রাপথ কোথাও এমন সুনিয়ন্ত্রিত আর সুশৃঙ্খল হয় না। গলিগুলোতে মাঝে মাঝে দু-একটা বাতি। বাংলোর খোলা জানলাগুলো দিয়ে

ভেতরের আলো বাইরে না এসে গলিগুলো অন্ধকারই থাকতো। জানলার বসে থাকা মেয়েদের দিকে তাকাতে তাকাতে এখানে লোকে পথ চলে। মেয়েরা বসে বসে বই পড়ে বা সেলাই করে এবং অধিকাংশ সময় পথিকদের লক্ষ্যই করে না। ওই মেয়েদের মতো পথিকরাও নানান জাতের মানুষ। ওদের মধ্যে মার্কিনরা আছে। আছে বন্দরে নোঙর করে থাকা জাহাজের মাঝিমাল্লা, কামানবাহী জাহাজের তালিকাভুক্ত পাঁড় মাতাল সেপাই, আর দ্বীপের শিবিরে থাকা সেনাবাহিনীর শ্বেতকায় আর কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকরা। সেই সঙ্গে আরও আছে দু-তিনজনে দল বেঁধে হেঁটে চলা জাপানী, হাওয়াই দ্বীপের বাসিন্দা, লম্বা আলখাল্লা পরা চীনে আর উদ্ভট টুপি মাথায় ফিলিপাইনের মানুষ। ওরা সকলেই নির্বাক, যেন সকলেই ভারাক্রান্ত। আসলে কামনা জিনিসটাই দুঃখদায়ক।

'ওটা ছিলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সব চাইতে উচ্চকিত কেচ্ছা,' ডেভিডসন উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন। 'মিশনারীরা বছরের পর বছর ওটার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় প্রেস ব্যাপারটা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। কিন্তু পুলিস তবু নড়ে বসে না। ওদের যুক্তিগুলো কি, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। ওদের বক্তব্য : এ পাপ অনিবার্য, কাজেই এ ব্যাপারটাকে একটা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করে নিয়ন্ত্রণে রাখাই সব চাইতে ভালো। আসল সত্য হচ্ছে, ওদের ঘুষ দেওয়া হতো—ঘুষ। ঘুষ দিতো দোকানগুলোর মালিক, ভাড়াটে গুণ্ডা আর ওই মেয়েগুলোও। তবে শেষ অব্দি ওরা ওখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়।'

'হনলুলুতে জাহাজে যে পত্রিকাগুলো এসেছিলো, আমি তাতেই এ ঘটনাটার কথা পড়েছি,' ডক্টর ম্যাকফেইল বললেন।

'যেদিন আমরা ওখানে পৌঁছুই, সেদিনই আইউইলি তার সমস্ত পাপ আর লজ্জা নিয়ে নিজের অস্তিত্ব হারায়। ওই অঞ্চলের প্রত্যেককেই বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছিলো। জানি না, ওই মেয়েমানুষটাকে দেখেই কেন আমি বুঝতে পারলাম না অতীতে ও কি ছিলো।'

'এখন আপনি বললেন বলে আমার মনে পড়ছে, জাহাজ ছাড়ার মাত্র কয়েক মিনিট আগে ও জাহাজে এসে ওঠে।' মিসেস ম্যাকফেইল বললেন, 'মনে পড়ছে তখন আমি ভাবছিলাম, দারুণ সময়মতো এসেছে মেয়েটি।'

'কোন্ সাহসে ও এখানে এসে উঠেছে!' ডেভিডসনের কণ্ঠস্বরে একরাশ ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে। 'এ আমি কিছুতেই মেনে নেবো না।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন উনি।

'কি করবেন আপনি?' ম্যাকফেইল প্রশ্ন করলেন।

'আপনি কি করতে বলেন ? এ সব আমি বন্ধ করে দেবো। এ বাড়িটাকে আমি একটা···একটা ইয়ে হতে দেবো না।'

মহিলাদের কানে খারাপ না লাগে, এমন একটা শব্দ খুঁজছিলেন ডেভিডসন। ভদ্রলোকের চোখে আগুন, পাংশুল মুখখানা এতো উত্তেজনা সত্ত্বেও আরও বেশি পাংশুল।

'শব্দ শুনে মনে হচ্ছে, নিচে তিন-চারজন পুরুষমানুষ রয়েছে,' ডাক্তার বললেন। 'এখুনি গিয়ে হুট করে ওর ঘরে ঢুকে পড়াটা একটু হঠকারিতা হবে নাকি ?'

ডেভিডসন একবার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বিনা বাক্য-ব্যয়ে তীর বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'আপনারা যদি মনে করে থাকেন ব্যক্তিগত বিপদের আশঙ্কা ওঁকে কর্তব্য থেকে বিরত রাখতে পারে, তাহলে ওঁকে আপনারা আদৌ চিনতে পারেননি,' মিসেস ডেভিডসন বললেন। বিচলিত ভঙ্গিমায় নিজের হাত দুটো চেপে বসে রইলেন উনি। ওঁর চোয়ালের উচু হাড় দুটিতে ঈষৎ রঙের স্পর্শ। নিচে কি ঘটতে চলেছে তা শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রয়েছেন ভদ্রমহিলা। উৎকর্ণ হয়ে রয়েছেন সকলেই। শব্দ শুনে ওঁরা বুঝলেন, ডেভিডসন কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এক ঝটকায় ঘরের দরজা খুলে দিয়েছেন। আচমকা গান থেমে গেলো, কিন্তু গ্রামোফোনটা তখনও কদর্য সুর-লহরী উগরে চলেছে একটানা। ডেভিডসনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন ওঁরা, তারপরেই ভারি কিছু পড়ার আওয়াজ। কলের গান থেমে গেছে, ডেভিডসন মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলেছেন গ্রামোফোনটাকে। ফের ডেভিডসনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন ওঁরা, কিন্তু উনি কি বলছেন তা বোঝা গেলো না। তারপর মিস টমসনের গলা—চড়া, কর্কশ স্বর। এবং তারপরে একটা প্রচণ্ড কোলাহল—যেন একসঙ্গে বহু লোক প্রাণপণে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। মিসেস ডেভিডসন একবার সজোরে নিঃশ্বাস নিয়ে নিজের হাত দুটো আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন। ডক্টর ম্যাকফেইল অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ওঁর দিক থেকে নিজের স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তিনি নিচে যেতে চাই-ছিলেন না, কিন্তু বুঝতেও পারছিলেন না মহিলারা তাঁর কাছ থেকে সেটাই প্রত্যাশা করছেন কি না। তারপরেই ধাক্কাধাক্কি হুটোপুটির মতো একটা আওয়াজ। আওয়াজটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। হয়তো ডেভিডসনকে ঘর থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো। এক মুহূর্তের জন্যে সবকিছু নিস্তব্ধ। তারপর ওঁরা ফের সিঁড়ি বেয়ে ডেভিডসনের ওপরে উঠে আসার শব্দ শুনলেন। নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন উনি।

'আমি বরং ওঁর কাছে যাই,' মিসেস ডেভিডসন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'দরকার হলে আমাকে ডাকবেন কিন্তু,' মিসেস ম্যাকফেইল বললেন। মিসেস ডেভিডসন চলে যেতেই উনি ফের বললেন, 'আশা করি ওঁর চোট লাগেনি।'

'ভদ্রলোক নিজের চরকায় তেল দিলেই পারতেন ?' বললেন ডক্টর ম্যাকফেইল।

দু-এক মিনিট ওঁরা দুজনে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন। তারপর দুজনেই চমকে উঠলেন—কারণ গ্রামোফোনটা তখন আবার বেয়াদপের মতো বাজতে শুরু করেছে আর কতকগুলো বিদ্রূপভরা কণ্ঠস্বর কর্কশ চিৎকারে উগরে চলেছে একটা অশ্লীল গানের অশ্রাব্য পদগুলি।

পরদিন মিসেস ডেভিডসনকে পাংশুল আর ক্লান্ত বলে মনে হলো। মনে হলো যেন ওঁর বয়স অনেক বেড়ে গেছে, উনি শুকিয়ে গেছেন। বললেন, ওঁর মাথাটা ধরে রয়েছে। মিসেস ম্যাকফেইলকে উনি আরও বললেন, ডেভিডসন নাকি সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারেননি—গোটা রাতটা এক ভয়ঙ্কর উত্তেজনার মধ্যে কাটিয়ে, তিনি ভোর পাঁচটার সময় উঠে কোথায় যেন বেরিয়ে গেছেন। তাঁর গায়ে এক গ্লাস বিয়ার ঢেলে দেওয়া হয়েছিলো, তাই তাঁর পোশাকে বিয়ারের দাগ আর দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। মিস টমসনের কথা বলতে গিয়ে মিসেস ডেভিডসনের চোখ দুটো মরা-আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলতে লাগলো। 'যে দিনটাতে ও মিঃ ডেভিডসনকে বিদ্রূপ করেছে, সেদিনটার কথা ভেবে পরে ওকে প্রচণ্ড অনুতাপ করতে হবে,' উনি বললেন। 'মিঃ ডেভিডসনের মনটা ভারি অদ্ভুত। বিপাকে পড়ে যে কেউই ওঁর কাছে গেছে, সান্ত্বনা না পেয়ে ফেরেনি। কিন্তু পাপের সম্পর্কে ওঁর মনে কোনো করুণা নেই। ন্যায়ের তীব্র ক্রোধ যখন ওঁর মধ্যে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তখন উনি একেবারে ভয়ঙ্কর।'

'কেন, উনি কি করবেন ?' মিসেস ম্যাকফেইল জিগেস করলেন।

'জানি না। তবে পৃথিবীতে কোনো কিছুর বিনিময়েই আমি নিজে ওই মেয়েটার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবো না।'

মিসেস ম্যাকফেইল শিউরে উঠলেন। ওই ছোট্টখাট্টো মহিলাটির বিজয়-বিশ্বাসের মধ্যে স্পষ্টতই ভীতিপ্রদ কি যেন একটা জিনিস রয়ে গেছে। সকালবেলা বেড়াতে বেরুচ্ছিলেন দুজনে। পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওঁরা দেখলেন, মিস টমসনের দরজাটা খোলা—বিছানায় ধামসানো একটা অঙ্গাবরণী গায়ে চাপিয়ে চাটুতে করে কি যেন রান্না করছে ও। 'সুপ্রভাত,' ওদের দেখতে পেয়ে মিস টমসন গলা চড়িয়ে জিগেস করলো, 'আজ সকালে মিঃ ডেভিডসন আগের চাইতে ভালো আছেন তো ?'

নাক উঁচু করে নিঃশব্দে ওকে পেরিয়ে এলেন দুজনে, যেন মিস টমসনের কোনো

অস্তিত্বই নেই ওখানে। কিন্তু মিস টমসন ব্যঙ্গের হাসিতে ফেটে পড়াতে ওঁরা দুজনেই লাল হয়ে উঠলেন। চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন মিসেস ডেভিডসন। তারপর চিৎকার করে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলার মতো দুঃসাহস কোরো না। আমাকে অপমান করলে, আমি তোমাকে এখান থেকে দূর করে দেবার ব্যবস্থা করবো।'

'আমি কি মিঃ ডেভিডসনকে আমার ঘরে আসতে বলেছিলাম?'

'ওর কথার জবাব দেবেন না,' মিসেস ম্যাকফেইল তাড়াতাড়ি ফিসফিসিয়ে বললেন।

'ও একটা নির্লজ্জ, বেহায়া—' শ্রুতির আওতার বাইরে এসেই ফেটে পড়লেন মিসেস ডেভিডসন। রাগে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিলো ওঁর।

বাড়ি ফেরার সময় ফের মিস টমসনের সঙ্গে দেখা হলো ওঁদের। পায়ে পায়ে জাহাজঘাটার দিকে এগিয়ে চলেছে মেয়েটা। পরনে সুন্দর সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ। বিশ্রী জমকালো ফুল সমেত বিশাল সাদা টুপিটা যেন একটা মূর্তিমান অপমান। যেতে যেতে খুশিয়াল সুরে ওঁদের দেখে চেঁচিয়ে উঠলো মিস টমসন আর ওঁদের কঠিন মুখের হিমশীতল দৃষ্টি দেখে দাঁত বের করে হাসতে লাগলো কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মার্কিন নাবিকগুলো। ফের বৃষ্টি শুরু হবার ঠিক আগেই বাড়িতে পৌঁছে গেলেন ওঁরা।

'ওর সুন্দর পোশাক-আশাকগুলো এবারে বোধহয় ভিজে বারোটা বাজলো,' তিক্ত স্বরে পরিহাস করলেন মিসেস ডেভিডসন।

ডেভিডসন যখন এলেন, ওঁদের রাতের খাওয়াদাওয়া তখন অর্ধেক এগিয়ে গেছে। ওঁর সর্বশরীর ভিজে জুবজুবে, তবু উনি পোশাক বদলালেন না। নিঃশব্দে বিমর্ষ মুখে বসে বসে উনি খেলেন, এক মুঠোর বেশি কিছুতেই মুখে তুললেন না। তারপর তাকিয়ে রইলেন তির্যক ভঙ্গিতে ঝরতে থাকা বৃষ্টিধারার দিকে। মিসেস ডেভিডসন যখন মিস টমসনের সঙ্গে দুবার করে ওঁদের দেখা হবার কথা বললেন, তখনও উনি কোনো জবাব দিলেন না। শুধুমাত্র ওঁর ভ্রূকুটি আরও গভীর হয়ে ওঠায় বোঝা গেলো, কথাটা উনি শুনতে পেয়েছেন।

'মিঃ হর্নকে বলে মেয়েটাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত,' মিসেস ডেভিডসন বললেন। 'আপনারা কি বলেন? ও আমাদের অপমান করবে, আমরা তা কিছুতেই হতে দিতে পারি না।'

'এখানে ওর যাবার মতো আর কোনো জায়গা আছে বলে তো মনে হয় না,' ম্যাকফেইল বললেন।

'এদেশী কারুর সঙ্গে থাকলেই পারে!'

'এমন আবহাওয়ায় এদেশী কুটির থাকার পক্ষে নিশ্চয়ই খুব একটা আরামদায়ক জায়গা হবে না।'

'বেশ কয়েকটা বছর আমি অমনি একটা কুটিরেই বাস করেছি,' মিশনারি বললেন।

ছোট্ট এদেশী মেয়েটি ওঁদের জন্যে প্রতিদিনকার মিঠাই—কলাভাজা—নিয়ে আসতেই ডেভিডসন তার দিকে ফিরে তাকালেন, 'মিস টমসনকে জিগেস করে এসো আমি কখন দেখা করতে গেলে ওর পক্ষে সুবিধে হবে।'

মেয়েটি লাজুক ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে চলে গেলো।

'তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইছো কেন, অ্যালবার্ট ?' স্ত্রী জিগেস করলেন।

'দেখা করা আমার কর্তব্য। সমস্ত রকমের সুযোগ দেবার আগে আমি ওর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবো না।'

'তুমি জানো না, ও কি বস্তু। ও তোমাকে অপমান করবে!'

'করুক। থুথু দিক আমাকে। কিন্তু ওর নষ্ট হয়ে যাওয়া আত্মাটাকে উদ্ধার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করবোই।'

মিসেস ডেভিডসনের কানে তখনও ওই নষ্ট হয়ে যাওয়া মেয়েমানুষটার উপহাসের হাসি বেজে বেজে উঠছে।

'কিন্তু ও সীমা ছাড়িয়ে বড্ড দূরে চলে গেছে।'

'ঈশ্বরের করুণা পৌছনোর পক্ষেও দূরে ?' চকিতে ডেভিডসনের দু চোখে আলো জ্বলে ওঠে, কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে মধুর ও কোমল। 'কক্ষনো না। পাপী নরকের চাইতে গভীর পাপে তলিয়ে গেলেও যীশুর প্রেম তার কাছে গিয়ে পৌছুতে পারে।'

মেয়েটি খবর নিয়ে এলো, 'মিস টমসন নমস্কার জানিয়ে বলেছেন, ব্যবসার সময়টা বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো সময়ে গেলে উনি খুশি হয়েই রেভারেণ্ড ডেভিডসনের সঙ্গে দেখা করবেন।'

পাথুরে স্তব্ধতায় সকলে খবরটা শুনলেন। নিজের ঠোঁটের পাতায় ফুটে ওঠা হাসিটুকু দ্রুত মুছে ফেললেন ডক্টর ম্যাকফেইল। কারণ তিনি জানেন, মিস টমসনের ঔদ্ধত্যে তিনি মজা পেয়েছেন বুঝলে তাঁর স্ত্রী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন।

নীরবে খাওয়াদাওয়া শেষ করলেন ওঁরা। তারপর মেয়েরা গিয়ে সেলাই নিয়ে বসলেন। যুদ্ধের শুরু থেকে মিসেস ম্যাকফেইল অগুন্তি মাফলার বুনে যাচ্ছেন, এখনও তিনি ফের একটা মাফলারই বুনছেন। ডাক্তার তামাকের নলটা ধরালেন। শুধু ডেভিডসনই তখনও কুর্সিতে বসে রয়েছেন আর অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে রয়েছেন টেবিলটার দিকে। শেষ পর্যন্ত তিনিও উঠলেন এবং একটিও কথা না বলে ঘর থেকে

বেরিয়ে গেলেন। সকলে শব্দ শুনলেন—ডেভিডসন সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামছেন। তারপর উনি দরজায় টোকা দিতেই মিস টমসন উদ্ধত কণ্ঠে বললো, 'ভেতরে আসুন।' মেয়েটার কাছে উনি এক ঘণ্টা রইলেন। ডক্টর ম্যাকফেইল ততোক্ষণ বসে বসে বৃষ্টি দেখতে লাগলেন। বৃষ্টিটা এবারে তাঁর স্নায়ুর ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। এ বৃষ্টি ইংলণ্ডের মতো মৃদু নয়—সেখানে বৃষ্টির ফোঁটা টুপটাপ করে শান্তভাবে পৃথিবীতে ঝরে পড়ে। এ বৃষ্টি একেবারে অকরুণ, খানিকটা ভয়ঙ্করও বটে। এর মধ্যে যেন প্রকৃতির আদিম শক্তিগুলির প্রবলতা অনুভব করা যায়। এ বৃষ্টি ঝরে না, বয়ে যায়। এ যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা প্রলয়ধারা। ঢেউ-তোলা টিনের ছাদে এর অবিচ্ছিন্ন শব্দের মাদল মানুষকে যেন পাগল করে তোলে। মনে হয় এ বৃষ্টির যেন একটা নিজস্ব আক্রোশ রয়েছে। বৃষ্টি না থামলে মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু তারপরেই আচমকা নিজেকে শক্তিহীন বলে মনে হয়, মনে হয় শরীরের হাড়গুলো যেন হঠাৎ নরম হয়ে গেছে। নিজেকে ভারি হীন আর হতাশ বলে মনে হয় তখন।

মিশনারিটি ঘরে এসে ঢুকতেই মহিলারা চোখ তুলে তাকালেন।

'আমি ওকে সমস্ত রকমের সুযোগ দিয়েছি। অনুতাপ করার জন্যে সনির্বন্ধ মিনতি করেছি। কিন্তু ও একটা শয়তানী।' ডেভিডসন একটু সময়ের জন্যে চুপ করলেন। ডক্টর ম্যাকফেইল লক্ষ্য করলেন, ভদ্রলোকের চোখ দুটো ম্লান হয়ে উঠেছে —কঠিন আর কঠোর হয়ে উঠেছে ওঁর পাংশুল মুখখানা।

'যে চাবুক দিয়ে প্রভু যীশু মহাজন আর পোদ্দারদের ঈশ্বরের মন্দির থেকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবারে আমি সেই চাবুক ধরবো।' ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন ডেভিডসন। ওঁর ঠোঁট দুটি চাপা, কালো ভ্রূ দুটি ভ্রূকুটি-লাঞ্ছিত। 'পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে পালিয়ে গেলেও আমি ওর পিছু নেবো।'

এক ক্ষিপ্র ভঙ্গিমায় ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ডেভিডসন। ফের সিঁড়ি ভেঙে ওঁর নিচে নেমে যাবার শব্দ শুনতে পেলেন সকলে।

'কি করতে যাচ্ছেন উনি?' মিসেস ম্যাকফেইল জিগেস করলেন।

'জানি না।' প্যাশনেটা খুলে মুছতে লাগলেন মিসেস ডেভিডসন, 'উনি প্রভুর কাজে ব্যস্ত থাকার সময় আমি কক্ষনো ওঁকে কোনো প্রশ্ন করি না।'

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস ডেভিডসন।

'কি হলো?'

'উনি নিজেকে শেষ করে ফেলবেন। নিজের দিকে তাকানো কাকে বলে, তা উনি জানেন না।'

মিশনারির কার্যকলাপের প্রথম ফলাফল ডক্টর ম্যাকফেইল জানতে পারলেন দো-আঁশলা বাড়িওলা হর্ণের কাছ থেকে। হর্ণের দোকানের কাছ দিয়ে যাবার সময় হর্ণ তাঁকে থামতে বলে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্যে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। লোকটার মোটাসোটা মুখখানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত।

'দেখুন, মিস টমসনকে এখানে একখানা ঘর ভাড়া দিয়েছি বলে রেভারেণ্ড ডেভিডসন আমাকে যাচ্ছেতাই বলে গেলেন।' সে বলে, 'কিন্তু ওকে ঘরটা ভাড়া দেবার সময় আমি জানতাম না, ও কি করে। লোকে ঘর ভাড়া চাইতে এলে আমার যেটুকু জানা দরকার তা হচ্ছে, ঘরের ভাড়া মেটাবার মতো রেস্তো তার আছে কি না। মিস টমসন আমাকে দু হপ্তার ভাড়া আগাম দিয়ে দিয়েছে।'

ডক্টর ম্যাকফেইল নিজে কোনো পক্ষে যোগ দিতে চাইছিলেন না। তাই বললেন, 'যে যা বলুক বা করুক, বাড়িটা আপনার। আপনি আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন বলে আমরা সবাই আপনার কাছে প্রচণ্ড কৃতজ্ঞ।'

হর্ণ দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকালো। উনি কতোটা নিশ্চিতভাবে মিশনারিটির পক্ষে তা সে তখনও সঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

'মিশনারিদের মধ্যে ভীষণ সমঝোতা।' সামান্য ইতস্তত করে হর্ণ বললো, 'ওঁরা কোনো ব্যবসায়ীর পেছনে লাগলে, সে বেচারা হয়তো দোকানপাটের ঝাঁপ বন্ধ করে পালাতে পথ পাবে না।'

'উনি কি মেয়েটিকে বার করে দিতে বলেছেন?'

'না। উনি বলেছেন, মেয়েটা ভদ্রভাবে থাকলে উনি তা বলতে পারেন না। বলেছেন, উনি আমার ওপরেও অবিচার করতে চান না। আমি কথা দিয়েছি, মেয়েটা ঘরে কোনো লোক আনতে পারবে না। এইমাত্র গিয়ে আমি মেয়েটাকে তা-ই বলে এলাম।'

'মেয়েটি কথাটা কিভাবে নিলো?'

'আমাকে যা-তা বললো।'

পুরনো পোশাকের খাঁচায় হর্ণের শরীরটা ছটফটিয়ে উঠলো। ইতিমধ্যেই সে বুঝে ফেলেছে, মিস টমসন বড় রুক্ষ ধাতের খদ্দের।

'আমার ধারণা, ও এখান থেকে চলে যাবে। ঘরে কাউকে আনতে না পারলে ও আর এখানে থাকতে চাইবে বলে মনে হয় না।'

'এদেশী লোকের কুঁড়েঘর ছাড়া এখানে ওর যাবার আর কোনো জায়গা নেই। তবে মিশনারিরা পেছনে লেগেছে বলে এখন স্থানীয় কোনো বাসিন্দাও ওকে ঘরে নেবে না।'

ডক্টর ম্যাকফেইল ঝরতে থাকা বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'নাঃ, আকাশ পরিষ্কার হবার আশায় এখানে আর অপেক্ষা করে কোনো লাভ হবে না বোধহয়।'

সেদিন সন্ধ্যায় বৈঠকখানা ঘরে বসে ডেভিডসন কলেজে তাঁর প্রথম জীবনের কথা বলছিলেন সকলকে। টাকাকড়ির জোর ছিলো না বলে লম্বা ছুটির দিনগুলোতে নানান ধরনের কাজ করে তাঁকে পড়াশুনো চালাতে হয়েছে। ওদিকে এক তলায় তখন সব চুপচাপ। মিস টমসন একা একা ওর ছোট্ট ঘরটাতে বসে রয়েছে। কিন্তু আচমকা ফের গ্রামোফোনটা বাজতে শুরু করলো। নিজের ঔদ্ধত্যকে প্রকাশ করার জন্যে, নিঃসঙ্গতাকে প্রতারিত করার জন্যে গ্রামোফোনটা চালিয়েছে মিস টমসন। কিন্তু বাজনাটার সঙ্গে গাইবার মতো কেউ নেই, সুরটাও করুণ। ঠিক যেন সাহায্যের আবেদন। ডেভিডসন সেদিকে কান দিলেন না। তিনি তখন একটা দীর্ঘ কাহিনীর মাঝামাঝি জায়গায় পৌছেছেন, অভিব্যক্তির এতোটুকুও পরিবর্তন না করে উনি কাহিনীটা বলেই চললেন। গ্রামোফোনটা অনবরত বেজে চলেছে। মিস টমসন একটার পর একটা রেকর্ড চাপিয়েই যাচ্ছে। মনে হচ্ছে রাতের নীরবতা ক্রমশ যেন ওর স্নায়ুর ওপরে চেপে বসছে। দমবন্ধ করা ভ্যাপসা গরম। রাতে বিছানায় শুয়েও ম্যাকফেইল দম্পতি ঘুমোতে পারলেন না। সজাগ চোখ মেলে পাশাপাশি শুয়ে রইলেন ওঁরা, শুনতে লাগলেন মশারির বাইরে মশককুলের অকরুণ সঙ্গীতচর্চা।

'ওটা কি হচ্ছে?' শেষ অব্দি ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করলেন মিসেস ম্যাকফেইল।

কাঠের বিভাজকটার ওধার থেকে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলেন ওঁরা। ডেভিডসনের কণ্ঠস্বর। একটানা একঘেয়ে আন্তরিক মিনতিমাখা স্বর। মুখর হয়ে প্রার্থনা করছেন উনি। প্রার্থনা করছেন মিস টমসনের আত্মার জন্যে।

দু-তিন দিন কেটে গেলো। এখন পথে দেখা হলে মিস টমসন আর বিদ্রূপের সুরে ওঁদের সম্ভাষণ জানায় না বা হাসে না। নাকটা ওপরের দিকে তুলে, প্রসাধিত মুখে বিমর্ষ অভিব্যক্তি নিয়ে, ভ্রূ কুঁচকে চলে যায়—যেন ওঁদের সে দেখতেই পায়নি। হর্ণ ম্যাকফেইলকে জানিয়েছে, মেয়েটি নাকি অন্য কোথাও আশ্রয় পাবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু সফল হয়নি। সন্ধ্যাবেলা ও একটার পর একটা রেকর্ড চালায়, কিন্তু আনন্দের ছলনাটা এখন একেবারে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। মার্কিন নিগ্রো সঙ্গীতের একটা তীক্ষ্ণ হৃদয়বিদারী ছন্দ আছে, সেটা যেন হতাশার একেবারে কাছাকাছি। রোববার মিস টমসন যন্ত্রটা বাজাতে শুরু করতেই ডেভিডসন হর্ণকে দিয়ে অবিলম্বে সেটা বন্ধ করে দেবার অনুরোধ জানালেন, কারণ রোববার পবিত্র দিন। রেকর্ডটা তখুনি তুলে নেওয়া হলো—লোহার ছাদে বৃষ্টির একটানা টুপটাপ শব্দ ছাড়া এক-

-বারে নিস্তব্ধ হয়ে রইলো সমস্ত বাড়িটা।

'মেয়েটা বোধহয় একটু অস্থির হয়ে উঠছে।' পরদিন হর্ণ ম্যাকফেইলকে বললো, 'মিঃ ডেভিডসন কি করতে যাচ্ছেন তা ও জানে না, আর তা-ই ও ভয় পাচ্ছে।'

সেদিন সকালেই মেয়েটিকে এক ঝলক দেখেছিলেন ম্যাকফেইল। তাঁর মনে হয়েছিলো, ওঁর উদ্ধত অভিব্যক্তিটা যেন বদলে গেছে। এখন ওর মুখের ভাব তাড়া-খাওয়া শিকারের মতো। দো-আঁশলা ব্যবসায়ীটা অপাঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলো, 'মিঃ ডেভিডসন ওই ব্যাপারে কি করতে যাচ্ছেন, তা আপনি জানেন না বোধহয়?'

'না, জানি না।'

হর্ণের পক্ষে ম্যাকফেইলের কাছে এ প্রশ্নটা তোলা আশ্চর্যজনক। কারণ ম্যাক-ফেইলেরও ধারণা, ডেভিডসন রহস্যজনক কিছু করছেন। তাঁর মনে হয়েছে, ডেভিডসন সতর্ক ও সুসম্বদ্ধভাবে মহিলাটির চারপাশে একটা জাল বুনে চলেছেন এবং সব কিছু প্রস্তুত হয়ে গেলেই উনি আচমকা জালের দড়িগুলোকে আঁট করে টেনে দেবেন।

'মেয়েটিকে উনি বলতে বলেছিলেন, যে কোনো সময় দরকার হলেই ও যেন একটা ডাক পাঠায়। তাহলে তখনই উনি মেয়েটির কাছে যাবেন।' হর্ণ বললো।

'আপনি কথাটা জানাবার পর মেয়েটি কি বললো?'

'কিছু বলেনি। আমিও আর ওখানে দাঁড়াইনি। উনি যা বলতে বলেছিলেন তা বলেই পালিয়ে এসেছি। মনে হয়েছিলো মেয়েটা বোধহয় কেঁদে ফেলবে।'

'নিঃসঙ্গতা ওর স্নায়ুগুলোর ওপরে চেপে বসছে, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া এই বৃষ্টি—এ তো যে কোনো মানুষকেই পাগল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট!' ডাক্তারের কণ্ঠস্বর বিরক্তিতে ভরে উঠলো, 'আচ্ছা, এই হতচ্ছাড়া জায়গাটাতে বৃষ্টি কি কখনই থামে না?'

'বর্ষাকালে মোটামুটি একটানাই হয়। বছরে তিনশো ইঞ্চি। আসলে দেখুন না, উপসাগরের আকৃতিটাই এর কারণ। উপসাগরটা যেন সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগর থেকে এখানে বৃষ্টি টেনে আনে।'

'গোল্লায় যাক আপনার উপসাগরের আকৃতি!' মশায় কামড়ানো জায়গাগুলো চুলকে নিলেন ডক্টর ম্যাকফেইল। নিজেই অনুভব করছিলেন, মেজাজটা ভীষণ চড়ে রয়েছে। বৃষ্টি থেমে রোদ উঠলেই এ অঞ্চলটা একেবারে হট-হাউসের মতো হয়ে ওঠে—ভ্যাপসা, ভিজে, গুমোট, দমবন্ধ করা অবস্থা। মনের মধ্যে তখন একটা আশ্চর্য অনুভূতি জেগে ওঠে—মনে হয় চতুর্দিকের সমস্ত কিছুই এক বর্বর হিংস্রতা

নিয়ে গড়ে উঠেছে। খোসমেজাজী এবং শিশুর মতো সরল বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সুনাম আছে। অথচ ওই সমস্ত সময়ে ওদের উল্কি আঁকা শরীর আর রঙ করা চুলগুলো দেখলে ওদের কেমন যেন অমঙ্গুলে বলে মনে হয়। খালি পায়ে থপ থপ করতে করতে ওরা আপনার পায়ে পায়ে পথ চললে সহজাত প্রবৃত্তিবশেই আপনি পেছন দিকে ফিরে তাকাবেন। আপনার মনে হবে, যে কোনো মুহূর্তে ওরা পেছন থেকে ছুটে এসে একটা লম্বা ছুরি আপনার পিঠের পাখনা দুটোর মাঝখানে ঢুকিয়ে দিতে পারে। ওদের দূর-বিচ্ছিন্ন চোখ দুটোতে কি যে কুচিন্তা খেল্যা করছে তা আপনি বুঝে উঠতে পারবেন না। মন্দিরের গায়ে খোদাই করা প্রাচীন মিশরিয়দের মতো ওদের চেহারা, ওদের অস্তিত্বে অপরিমেয় প্রাচীনতার বিভীষিকা।

ডেভিডসন এলেন এবং চলেও গেলেন। উনি ভারি ব্যস্ত, কিন্তু কি যে করছেন তা ম্যাকফেইলরা জানেন না। হর্ণ বলেছে, উনি নাকি রোজই গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে যান। ডেভিডসন নিজেও একদিন বললেন, 'গভর্নরকে দেখে মনে হয় লোক-টার মধ্যে দৃঢ়তা আছে ; কিন্তু কাজের সময় বোঝা যায় আসলে ওঁর মেরুদণ্ডই নেই।'

'তার মানে মনে হচ্ছে, আপনি যা চান উনি ঠিক তা করেন না।' ডাক্তার ঠাট্টা করে বললেন।

মিশনারিটি হাসলেন না।

'যা ন্যায়, আমি চাই উনি তা-ই করুন। এ জন্যে কাউকে রাজি করাবার দরকার হওয়া উচিত নয়।'

'কিন্তু কোন্‌টা ন্যায়, সে বিষয়ে মতের পার্থক্য থাকতে পারে।'

'পায়ে পচন-ধরা ঘা থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি সেটা কেটে বাদ দিতে দ্বিধা করে, তাহলে তার ওপরে আপনার মেজাজ ঠিক থাকবে কি ?'

'পচন-ধরা ঘা নেহাতই বাস্তব ব্যাপার !'

'আর পাপ ?'

ডেভিডসন কি করেছেন তা শীগগিরি বোঝা গেলো। ওঁরা চারজনে তখন সবে-মাত্র দুপুরের খাওয়া শেষ করেছেন, দিবানিদ্রার জন্যে তখনও পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। গরমের দরুন মহিলা দুজন এবং ডাক্তার ভদ্রলোককে এ অভ্যেসটা পেয়ে বসেছে। ডেভিডসন এ সমস্ত আলসেমির অভ্যেস আদৌ পছন্দ করেন না। হঠাৎ দরজাটা সপাটে খুলে গেলো, ঘরে এসে ঢুকলো মিস টমসন। ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে ডেভিডসনের দিকে এগিয়ে গেলো ও।

'হতচ্ছাড়া, গভর্নরের কাছে আমার নামে তুই কি বলেছিস ?'

রাগে ফুঁসছিলো মিস টমসন। মুহূর্তের জন্যে সবাই চুপচাপ। তারপর ডেভিড-সন একটা কুর্সি এগিয়ে দিলেন ওর দিকে, 'তুমি বসবে না, মিস টমসন? তোমার সঙ্গে আর এক দফা আলোচনা হবে বলে আমি কিন্তু আশা করছিলাম।'

'হতভাগা, নিচ, বেজন্মা!'

একরাশ নোংরা অপমানকর গালাগালিতে ফেটে পড়লো মিস টমসন। ডেভিড-সন গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে।

'তুমি আমাকে যে গালাগালই দাও না কেন মিস টমসন, তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। কিন্তু আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি, এখানে কিন্তু মহিলারা রয়েছেন।'

রাগের সঙ্গে সঙ্গে এখন ওর অশ্রুও নেমে আসতে চাইছে। মুখখানা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে—দেখে মনে হয় বুঝি ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে।

'কি হয়েছে?' জিগেস করলেন ডক্টর ম্যাকফেইল।

'এইমাত্র একটা লোক এসে বলে গেলো, আমাকে নাকি পরের জাহাজেই এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

মিশনারির চোখ দুটিতে কি একটু আলোর ঝিলিক লাগলো? মুখখানা কিন্তু আগের মতোই নৈর্ব্যক্তিক।

'এই পরিস্থিতিতে গভর্নর তোমাকে এখানে থাকতে দেবেন, তা তুমি আশা করতে পারো না।'

'তুই করেছিস,' চিৎকার করে উঠলো মিস টমসন। 'এখন অন্য কথায় আমাকে ভোলাতে পারবি না—তুই-ই করিয়েছিস সবকিছু।'

'আমি তোমাকে ভোলাতে চাই না। গভর্নরের দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে একটি মাত্র পথ ছিলো, আমি সেটাই তাঁকে নিতে পরামর্শ দিয়েছিলাম।'

'কেন তুই আমার পেছনে লাগলি? আমি তো তোর কোনো ক্ষতি করিনি?'

'আমার কোনো ক্ষতি করলে আমি তাতে অসন্তুষ্ট হতাম না, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

'তুই কি মনে করেছিস আমি এই ছ্যাকড়া হোটেলেই পড়ে থাকতে চাই? কেন, আমাকে দেখে কি ভিখিরি বলে মনে হয়?'

'সে ক্ষেত্রে এখান থেকে চলে যেতে বলায় তোমার অভিযোগ করার আর কি কারণ থাকতে পারে, তা তো আমি বুঝতে পারছি না।'

রাগে একটা অসংলগ্ন চিৎকার তুলে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো মিস টমসন। তারপর খানিকক্ষণের এক সংক্ষিপ্ত নীরবতা।

'শেষ অব্দি গভর্নর সাহেব যে একটা ব্যবস্থা নিয়েছেন, এটা স্বস্তির কথা।' ডেভিডসন বললেন, 'ভদ্রলোক দুর্বল চরিত্রের মানুষ, এ ব্যাপারটা নিয়ে অহেতুক দ্বিধায় ভুলছিলেন। বলেছিলেন, মেয়েটি এখানে থাকবে তো মোটে পনেরো দিন। আর ও যদি অ্যাপিয়াতেই চলে যায়—সেটা ব্রিটিশ এলাকা—তাহলে ওর ব্যাপারে গভর্নরের আর কিছুই করার থাকবে না।'

এক লাফে উঠে ডেভিডসন লম্বা লম্বা পায়ে ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করলেন।

'শাসক গোষ্ঠীর লোকগুলো ভারি বিশ্রী ভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। এমন ভাবে কথা বলে যেন চোখের আড়ালে গেলে পাপ আর পাপ থাকে না। ওই মেয়েমানুষটির অস্তিত্বটাই একটা কলঙ্ক, ওকে অন্য কোনো দ্বীপে চালান করে দিলে সমস্যাটার সমাধান হয় না। শেষ পর্যন্ত আমাকে সরাসরিই কথা বলতে হলো।'

ডেভিডসন ভুরু নিচু করলেন, সামনের দিকে এগিয়ে ধরলেন নিজের দৃঢ় চিবুক-খানাকে। হিংস্র আর দৃঢ়প্রত্যয়ী বলে মনে হলো তাঁকে।

'তার মানে?'

'ওয়াশিংটনে আমাদের মিশনের একেবারেই প্রতিপত্তি নেই—তা নয়। গভর্নরকে আমি বুঝিয়ে দিলাম, উনি যেভাবে এখানে কাজকর্ম চালাচ্ছেন সে সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করা হলে, ব্যাপারটা ওঁর পক্ষে ভালো হবে না।'

'মেয়েটিকে কবে যেতে হবে?' খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

'আসছে মঙ্গলবার স্যান ফ্র্যানসিসকোর জাহাজ সিডনি থেকে এখানে এসে পৌঁছবে। সেই জাহাজেই ওকে যেতে হবে।'

তার মানে আর পাঁচদিন।

অন্য তেমন কিছু করার না থাকায় ডাক্তার অধিকাংশ দিনই সকাল বেলাটা হাসপাতালে গিয়ে কাটিয়ে আসেন। পরের দিন সেখান থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দো-আঁশলা লোকটা তাঁকে থামিয়ে বললো, 'মাফ করবেন ডক্টর ম্যাক-ফেইল, মিস টমসন অসুস্থ। ওকে আপনি একবারটি একটু দেখবেন?'

'অবশ্যই!'

হর্ণ তাঁকে মেয়েটির ঘরে নিয়ে গেলো। অলস ভঙ্গিমায় একখানা কুর্সিতে বসে-ছিলো মেয়েটি—পড়ছিলো না, সেলাইও করছিলো না—শুধু বসেছিলো সামনের দিকে তাকিয়ে। ওর পরনে সাদা পোশাক, মাথায় ফুল লাগানো সেই মস্তো বড়ো টুপিটা। ম্যাকফেইল লক্ষ্য করলেন, পাউডারের তলায় ওর গায়ের চামড়াটা হলুদ আর ময়লা দেখাচ্ছে। চোখ দুটো ভারি।

'দুঃখিত, শুনলাম তুমি অসুস্থ।'

'আসলে আমি ঠিক অসুস্থ নই। তবু অসুস্থ বলেছি তার কারণ, আপনার সঙ্গে আমার দেখা করার দরকার ছিলো। জানেন, স্যান ফ্র্যানসিসকোর জাহাজে চেপে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে!'

মিস টমসন ডাক্তারের দিকে তাকালো। ডাক্তার দেখলেন, আচমকা ওর চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। হাত দুটো প্রচণ্ড বিক্ষোভে বারবার মুঠিবদ্ধ হচ্ছে আর খুলছে। ওদিকে দরজার কাছে হর্ণ দাঁড়িয়ে আছে উৎকর্ণ হয়ে।

'আমিও তাই শুনেছি,' বললেন ডাক্তার।

'এখুনি স্যান ফ্র্যানসিসকোয় ফিরে যাওয়াটা আমার পক্ষে খুব একটা সুবিধে-জনক হবে না,' মেয়েটি ছোটো করে একটা ঢোক গিললো। 'গতকাল বিকেলে আমি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখা হয়নি। ওঁর সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করলাম—তিনি বললেন ওই জাহাজটাই আমাকে ধরতে হবে, তা ছাড়া আর কিছু করার নেই। গভর্নরের সঙ্গে দেখা করা ছাড়া আমার উপায় ছিলো না। তাই আজ সকালে আমি ওঁর বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। উনি বাড়ি থেকে বেরুতেই আমি ওঁর সঙ্গে কথা বললাম। উনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন না, কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। শেষ অব্দি উনি বললেন, রেভারেণ্ড ডেভিডসন রাজি থাকলে সিডনির পরের জাহাজটা অব্দি আমি এখানে থাকলে উনি আপত্তি করবেন না।'

কথা থামিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে ডাক্তারের দিকে তাকালো মেয়েটি।

'এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি, বুঝতে পারছি না।'

'আমি ভাবছিলাম, আপনি যদি কিছু মনে না করেন…যদি আমার হয়ে ওঁর কাছে একটু অনুরোধ করেন! আমি ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি, উনি আমাকে এখানে একটু থাকতে দিলে আমি আর কিচ্ছুটি করবো না। উনি চাইলে আমি বাড়ি থেকেও বেরুবো না। মাত্র পনেরোটা দিন—তার বেশি কিছু তো নয়!'

'আমি ওঁকে জিগেস করে দেখবো।'

'উনি রাজি হবেন না,' হর্ণ বললো। 'উনি মঙ্গলবারই তোমাকে এখান থেকে তাড়াবেন। কাজেই তুমি সেভাবেই বরং মনস্থির করে নাও।'

'ওঁকে বলবেন, সিডনিতে আমি কাজ পাবো—মানে সত্যিকারের কাজ। আমি তো বেশি কিছু চাইছি না!'

'দেখি, আমি যতোটুকু করতে পারি করবো।'

'কথাটা ওঁকে বলেই আমাকে সবকিছু জানিয়ে যাবেন, কেমন? এ ব্যাপারে

একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া অব্দি আমি কোনো কিছুতেই মন দিতে পারছি না।'

বার্তাবহের এ কাজটা ডাক্তারকে খুব একটা খুশি করেনি। তাই, সম্ভবত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই, তিনি এ ব্যাপারে পরোক্ষভাবে এগুলেন। মিস টমসন তাঁকে যা কিছু বলেছে, তিনি সেগুলো তাঁর স্ত্রীকে জানালেন এবং স্ত্রীকে বললেন সেগুলো মিসেস ডেভিডসনকে জানাতে। মিশনারিটি আচার-আচরণে যেন খানিকটা স্বেচ্ছাচারী। মেয়েটিকে আর পনেরোটা দিন প্যাগো-প্যাগোতে থাকতে দিলে এমন কিছু ক্ষতি হতো না। কিন্তু তাঁর এই দৌত্যের ফলাফলের জন্যেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। মিশনারিটি সোজা তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন।

'মিসেস ডেভিডসনের মুখে শুনলাম, টমসন নাকি আপনার সঙ্গে কি কথা বলেছে?'

এভাবে সরাসরি আক্রান্ত হয়ে লাজুক মানুষটি বাধ্য হয়ে খোলা ময়দানে গিয়ে পড়ার বিরক্তি অনুভব করলেন। বুঝতে পারলেন, তাঁর রাগ চড়ে উঠছে। মুখখানা লাল হয়ে উঠলো চকিতে। বললেন, 'মেয়েটা স্যান ফ্র্যানসিসকোর বদলে সিডনিতে গেলে কি এমন এসে-যায় আমি বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া ও যখন কথা দিয়েছে যতোদিন এখানে থাকবে ভদ্রভাবে থাকবে, তখন ওকে এভাবে হয়রান করাটাও ঠিক নয়।'

মিশনারি কঠিন দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকালেন, 'ও স্যান ফ্র্যানসিসকোতে ফিরতে চায় না কেন?'

'তা আমি জিগেস করিনি,' খানিকটা কঠোর হয়ে ডাক্তার জবাব দিলেন, 'তা ছাড়া আমি মনে করি, প্রত্যেকেরই নিজের চরকাতে তেল দেওয়া উচিত।'

জবাবটা হয়তো খুব উচিত মতো হয়নি।

'এ দ্বীপ থেকে যে জাহাজটা প্রথম ছাড়ছে, গভর্নর সেই জাহাজেই ওকে চালান করে দেবার হুকুম দিয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র তাঁর কর্তব্যটুকুই করেছেন এবং আমিও তাতে নাক গলাবো না। এখানে মেয়েটির উপস্থিতিই বিপজ্জনক।'

'আমার মতে আপনি ভীষণ নির্মম এবং অত্যাচারী।'

মহিলা দুজন কিছুটা ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে ডাক্তারের দিকে তাকালেন। কিন্তু ঝগড়াঝাঁটি হবে বলে তাঁদের আশঙ্কার কোনো কারণ ছিলো না। কারণ মিশনারিটি মৃদু হেসে বললেন, 'আমার সম্পর্কে আপনাকে এমনটি ভাবতে হচ্ছে বলে আমি ভীষণ দুঃখিত, ডক্টর ম্যাকফেইল। বিশ্বাস করুন, ওই হতভাগিনীর জন্যে আমারও বুকের মধ্যে রক্তপাত হচ্ছে। তবে আমি শুধু আমার কর্তব্যটুকুই পালন করার চেষ্টা করছি।'

ডাক্তার কোনো জবাব না দিয়ে বিমর্ষ মুখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ কদিনে এই প্রথম এখন আর বৃষ্টি হচ্ছে না। উপসাগরের ওধারে গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ কুটির।

'বৃষ্টিটা ধরেছে,' ডাক্তার বললেন, 'আমি বরঞ্চ এই সুযোগে একটু বেরিয়ে পড়ি।'

'আমি আপনার ইচ্ছেটা মেটাতে পারলাম না বলে, দয়া করে আমার সম্পর্কে মনে কোনো বিদ্বেষ পুষে রাখবেন না,' ডেভিডসন বিষণ্ন হাসলেন। 'আমি আপনাকে খুবই শ্রদ্ধা করি, ডাক্তার। আপনি আমার সম্পর্কে মন্দ ভাবলে আমি সত্যিই দুঃখ পাবো।'

'নিজের সম্পর্কে আপনার ধারণা যথেষ্টই ভালো। কাজেই আমার মতামতে আপনার যে কিছুই এসে যাবে না সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'এটা কিন্তু আমাকে গালাগালিই দেওয়া হলো,' সশব্দে হাসলেন ডেভিডসন।

অভদ্রতা করেও কোনো লাভ হলো না—তাই নিজের ওপরেই রাগ করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলেন ম্যাকফেইল। মিস টমসন দরজা খুলে অপেক্ষা করছিলো তাঁর জন্যে। জিগ্গেস করলো, 'আপনি ওর সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'হ্যাঁ।' বিব্রত হয়ে মেয়েটির দিকে না তাকিয়ে ডাক্তার জবাব দিলেন, 'কিন্তু দুঃখিত, উনি কিছুই করবেন না।'

পরক্ষণেই মেয়েটির দিক থেকে একটা ফোঁপানির শব্দ শুনে চকিতে ওর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন ম্যাকফেইল। তিনি দেখলেন, আতঙ্কে মেয়েটির মুখ সাদা হয়ে গেছে। দৃশ্যটা দেখে তিনি আঘাত পেলেন এবং আচমকা তাঁর মাথায় একটা মতলব এসে গেলো।

'তবে এখনই আশা ছেড়ো না। ওঁরা তোমার সঙ্গে যে ব্যবহারটা করছেন, আমার মতে সেটা লজ্জাজনক। তাই আমি নিজে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'এখুনি?'

ম্যাকফেইল ঘাড় নেড়ে সায় জানালেন। মেয়েটির মুখখানা ঝলমলে হয়ে উঠলো।

'সত্যি আপনার অনেক দয়া। আমি জানি, আপনি আমার হয়ে বললে উনি নিশ্চয়ই আমাকে এখানে থাকতে দেবেন। এখানে যদ্দিন থাকবো, তদ্দিন আমি একটাও অনুচিত কাজ করবো না।'

কেন যে গভর্নরের কাছে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিলেন, ডক্টর ম্যাকফেইল

নিজেই তা জানেন না। মিস টমসনের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার। কিন্তু ডেভিডসন তাঁকে রাগিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর রাগ একেবারে চাপা আগুনের মতো। গভর্নরকে তিনি বাড়িতেই পেলেন। ভদ্রলোক বিশাল চেহারার সুদর্শন এক নাবিক, ঠোঁটের ওপরে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া দাঁতের বুরুশের মতো মোচ, পরনে নিষ্কলঙ্ক উর্দি।

'আমি এক মহিলার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' ম্যাকফেইল বললেন। 'আমরা যে বাড়িতে রয়েছি, উনিও সেখানেই উঠেছেন। ওঁর নাম টমসন।'

'ওঁর সম্পর্কে আমি বোধহয় প্রায় সব কিছুই শুনে ফেলেছি,' গভর্নর মৃদু হাসলেন। 'আমি ওকে আসছে মঙ্গলবার এখান থেকে চলে যাবার হুকুম দিয়েছি। এ ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই, ডক্টর ম্যাকফেইল।'

'আমি বলতে এসেছিলাম, ওই সময়-সীমাটাকে একটু বাড়িয়ে স্যান ফ্র্যানসিস-কোর জাহাজটা এসে পৌঁছনো অব্দি আপনি যদি ওঁকে এখানে থাকার অনুমতি দেন, তাহলে উনি সেই জাহাজে চেপে সিডনিতে চলে যেতে পারেন। ওই কটা দিন উনি যাতে এখানে ভদ্রভাবে থাকেন, তার দায়িত্ব আমার।'

গভর্নর তখনও হাসছেন, কিন্তু তাঁর চোখ দুটি কুঁচকে গম্ভীর হয়ে উঠেছে, 'আপনাকে বাধিত করতে পারলে আমি অত্যন্ত খুশি হতাম, ডক্টর ম্যাকফেইল। কিন্তু আদেশটা আমি দিয়ে ফেলেছি এবং সেটা বজায় থাকবেই।'

ডাক্তার যথাসম্ভব যুক্তিগ্রাহ্যভাবে ব্যাপারটা বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু ততোক্ষণে গভর্নরের হাসিটি মুছে গেছে, গম্ভীর মুখে অন্য দিকে তাকিয়ে তিনি ডাক্তারের কথা শুনতে লাগলেন। ডাক্তার বুঝতে পারলেন, গভর্নরের মনে তিনি কোনো ছাপই ফেলতে পারছেন না।

'কোনো মহিলার অসুবিধে ঘটবার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু মঙ্গলবার ওঁকে জাহাজে চাপতেই হবে এবং এ বিষয়ে আর কিচ্ছু করার নেই।'

'উনি না গেলে কি এমন প্রভেদ হতো ?'

'মাফ করবেন ডাক্তারবাবু, যথাযথ কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্য কারুর কাছে আমি আমার কাজের কৈফিয়ত দিতে চাই না।'

ম্যাকফেইল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গভর্নরের দিকে তাকালেন। তাঁর মনে পড়লো, ডেভিড-সন ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, কাজ হাসিল করার জন্যে তিনি ভীতি প্রদর্শনেরও আশ্রয় নিয়েছেন। এবং গভর্নরের ভাবভঙ্গিতে স্পষ্টতই একটা অস্বস্তির আভাস।

'ডেভিডসন তো মহা ব্যস্তবাগীশ,' ম্যাকফেইল ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন।

'নিজেদের মধ্যে বলে বলছি, ডক্টর ম্যাকফেইল—মিঃ ডেভিডসন সম্পর্কে

আমার ধারণা যে সাংঘাতিক ভালো, তা কিন্তু নয়। তবে স্বীকার করতেই হবে যে এই দ্বীপে, যেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে তালিকাভুক্ত বেশ কয়েকজন সৈনিকও রয়েছে, সেখানে মিস টমসনের মতো একটি চরিত্রের উপস্থিতি সত্যিই বিপজ্জনক— এবং এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও মিঃ ডেভিডসন কিন্তু তাঁর অধিকারের সীমানার মধ্যেই রয়েছেন।'

গভর্নর উঠে পড়লেন। বাধ্য হয়ে ডক্টর ম্যাকফেইলকেও উঠতে হলো।

'মাফ করবেন, আমাকে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। মিসেস ম্যাক-ফেইলকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবেন।'

হতাশ হয়ে বেরিয়ে এলেন ডক্টর ম্যাকফেইল। তিনি জানতেন, মিস টমসন তাঁর প্রতীক্ষায় থাকবে। কিন্তু নিজের ব্যর্থতার কথা নিজের মুখে বলতে ইচ্ছে করছিলো না বলে তিনি পেছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে চোরের মতো চুপিচুপি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। খাওয়াদাওয়ার সময় তিনি চুপ করেই রইলেন, ভাবভঙ্গিতে চাপা অস্বস্তি। অথচ ডেভিডসন দারুণ হাসিখুশি আর খোশমেজাজে ভরা। মাঝেমাঝেই ভদ্রলোকের জয়দীপ্ত চোখ দুটো তাঁর চোখের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরছে বলে মনে হলো ডক্টর ম্যাকফেইলের। আচমকা তাঁর মনে হলো, গভর্নরের কাছে যাওয়া এবং তার ফলশ্রুতিতে ব্যর্থতার কথা সবই ডেভিডসন জানেন। কিন্তু কথাটা উনি জানলেন কি করে? ওঁর ক্ষমতার মধ্যে যেন কি একটা অশুভ-অমঙ্গলে ব্যাপার রয়ে গেছে।

হর্ণকে বারান্দায় দেখে, যেন তার সঙ্গে সাধারণ দু-একটা কথা বলার উদ্দেশ্যেই ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে এলেন।

'ও জানতে চাইছে, আপনি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেছেন কিনা,' হর্ণ ফিস-ফিসিয়ে বললো।

'হ্যাঁ। কিন্তু উনি কিছু করবেন না। আমি ভীষণ দুঃখিত হর্ণ, আমারও আর কিছু করার নেই।'

'আমি জানতাম, উনি কিছু করবেন না। মিশনারিদের সঙ্গে লাগার মতো সাহস ওঁদের নেই।'

'কি নিয়ে কথা হচ্ছে?' ডেভিডসন এগিয়ে এসে অমায়িক ভঙ্গিতে জিগেস করলেন।

'আমি বলছিলাম কি যে আরও অন্তত একটা হপ্তা আপনাদের অ্যাপিয়ায় যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই,' হর্ণ সহজসুরে জবাব দিয়ে চলে গেলো। ওঁরা দুজনে ফিরে গেলেন বৈঠকখানা-ঘরে। ডেভিডসন প্রতিবার খাওয়া-দাওয়ার পরে এক ঘণ্টা

করে সময় চিত্তবিনোদনে ব্যয় করেন। কিন্তু খানিকক্ষণ বাদেই দরজায় তাঁর করাঘাত শোনা গেলো।

'ভেতরে এসো,' মিসেস ডেভিডসন তীক্ষ্ণ গলায় বললেন।

দরজা কিন্তু খুললো না। মিসেস ডেভিডসন উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। ওঁরা দেখলেন, মিস টমসন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু ওর চেহারার পরিবর্তনটা একেবারে অস্বাভাবিক। এ সেই জমকালো পোশাকের বেহায়া মেয়েটা নয়, যে ওঁদের রাস্তায় দেখে বিদ্রূপ করেছিলো—এ এক ভয়-পাওয়া ভেঙে-পড়া নারী। মাথার সদা সুবিন্যস্ত চুলগুলো এলোমেলো হয়ে লুটিয়ে রয়েছে ঘাড়ের ওপরে। পায়ে স্নানঘরে ব্যবহারের চটি, পরনে স্কার্ট আর ব্লাউজ—পাটভাঙা নয়, কোঁচকানো। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো ও। গাল বেয়ে নেমে এসেছে অশ্রুধারা। ঘরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না।

'কি চাই তোমার?' কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করলেন মিসেস ডেভিডসন।

'আমি মিঃ ডেভিডসনের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?' রুদ্ধকণ্ঠে জিগেস করলো ও।

ডেভিডসন উঠে ওর দিকে এগিয়ে গেলেন।

'ভেতরে এসো, মিস টমসন। বলো, আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি?' ডেভিডসনের কণ্ঠস্বরে হৃদ্যতার সুর।

ও ঘরে এসে ঢুকলো।

'সেদিন আমি আপনাকে যা কিছু বলেছি তার জন্যে···আর তা ছাড়া—তা ছাড়া আর সমস্ত কিছুর জন্যেই আমি দুঃখিত। সম্ভবত আমি একটু বেশি উত্তেজিত ছিলাম। আমাকে ক্ষমা করে দিন!'

'আরে ও কিছু নয়। দু-চারটে কড়া কথা সইবার পক্ষে আমার পিঠটা সম্ভবত যথেষ্টই চওড়া!'

চরম দীন ভঙ্গিতে ডেভিডসনের দিকে এগিয়ে গেলো মিস টমসন, 'আপনি আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন। আমি সম্পূর্ণভাবে হেরে গেছি। কিন্তু আমাকে আপনি স্যান ফ্র্যানসিসকোতে ফেরত পাঠাবেন না!'

ডেভিডসনের সদয় ভঙ্গিমাটুকু উধাও হয়ে গেলো। আচমকা কঠিন আর কঠোর হয়ে উঠলো তাঁর কণ্ঠস্বর।

'কেন তুমি সেখানে ফিরে যেতে চাও না?'

মেয়েটা ডেভিডসনের সামনে মাথা নিচু করে রাখলো, 'সেখানে আমার আত্মীয়-স্বজনরা থাকে। তারা আমাকে এই অবস্থায় দেখবে, আমি তা চাই না। আপনি

অন্য যেখানে যেতে বলবেন, আমি চলে যাবো।'

'কিন্তু তুমি স্যান ফ্র্যানসিসকোতে ফিরতে চাও না কেন?'

'আমি তো বললাম!'

ডেভিডসন সামনের দিকে ঝুঁকে ওর দিকে তাকালেন। তাঁর উজ্জ্বল আয়ত চোখ দুটো যেন মেয়েটার মর্মমূল বিদ্ধ করতে চাইলো। আচমকা সশব্দে একটা নিঃশ্বাস নিলেন তিনি।

'কয়েদখানার ভয়—'

মেয়েটা চিৎকার করে উঠলো, তারপর মাটিতে আছড়ে পড়ে ডেভিডসনের পা-দুটো জড়িয়ে ধরলো।

'আমাকে ওখানে ফেরত পাঠাবেন না! আমি আপনার কাছে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি ভালো মেয়ে হয়ে থাকবো—এ সমস্ত কিছু ছেড়ে দেবো।'

মেয়েটা অনর্গল এলোমেলো কাকুতি মিনতিতে মুখর হয়ে ওঠে, অশ্রুধারা বইতে থাকে ওর রঙকরা গাল দুটি বেয়ে। ডেভিডসন নত হয়ে ওর মুখখানা তুলে ধরেন, জোর করে ওকে তাকাতে বাধ্য করেন নিজের দিকে।

'তাহলে কি সেটাই সত্যি? কয়েদখানা?'

'ওরা আমাকে ধরবার আগেই আমি পালিয়েছিলাম।' মেয়েটা হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'ষাঁড়গুলো আমাকে ধরলেই আমার তিন বছরের সাজা হয়ে যাবে!'

ডেভিডসন ওকে ছেড়ে দিতেই ও একটা স্তূপের মতো হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে থাকে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে করুণস্বরে।

'এবারে তো পুরো ব্যাপারটাই বদলে গেলো,' ডক্টর ম্যাকফেইল উঠে দাঁড়ালেন। 'এ কথা জানার পর, আপনি ওকে আর সেখানে ফেরত পাঠাতে পারেন না। ওকে আর একটা সুযোগ দিন। ও নতুন করে জীবনটা শুরু করতে চায়।'

'আমি ওকে যে সুযোগটা দিতে যাচ্ছি, তেমন ভালো সুযোগ ও এ যাবৎ আর কোনোদিনও পায়নি। ও যদি অনুতপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে শাস্তিটাও মেনে নিক।'

মেয়েটি কথাগুলোর ভুল অর্থ বুঝে মুখ তুলে তাকালো। ওর ফুলে ওঠা চোখ দুটিতে আশার আলো।

'তাহলে আপনি আমাকে ছেড়ে দেবেন?'

'না, তুমি মঙ্গলবারের জাহাজে চেপে স্যান ফ্র্যানসিসকোতে যাবে।'

মেয়েটা আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলো। তারপর চাপা গলায় অমানুষিক কর্কশ চিৎকার করতে করতে বারবার মেঝেতে মাথা ঠুকতে লাগলো। ডক্টর ম্যাকফেইল লাফিয়ে উঠে ওকে মাটি থেকে টেনে তুললেন।

'থামো, অমন করে না। তুমি বরং তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমি তোমার জন্যে একটা ওষুধ নিয়ে যাচ্ছি।'

মেয়েটিকে তুলে দাঁড় করালেন ডক্টর ম্যাকফেইল। তারপর খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে, খানিকটা বয়ে ওকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নিয়ে গেলেন। মিসেস ডেভিডসন এবং নিজের স্ত্রীর ওপরে তাঁর প্রচণ্ড রাগ হলো, কারণ ওঁরা তাঁকে সাহায্য করার কোনো চেষ্টাই করেনি। দো-আঁশলা বাড়িওলাটা সিঁড়ির চত্বরে দাঁড়িয়েছিলো, তার সাহায্যেই ডাক্তার কোনোমতে মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মেয়েটা তখনও গোঙাচ্ছে, কাঁদছে—প্রায় অচৈতন্য অবস্থা। ওকে একটা ইনজেকশন দিয়ে ফের যখন তিনি দোতলায় উঠে গেলেন, তখন তিনি উত্তেজিত এবং অবসন্ন।

'ওকে শুইয়ে দিয়ে এলাম।'

মহিলা দুজন এবং ডেভিডসন সেই একইভাবে বসে রয়েছেন। ডাক্তার নিচে যাবার পর থেকে ওঁরা সম্ভবত নড়াচড়াও করেননি বা কোনো কথাবার্তাও বলেননি।

'আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম,' এক আশ্চর্য দূরাগত কণ্ঠস্বরে ডেভিডসন বললেন। 'আমার ইচ্ছে, আমাদের ওই বিপথগামী ভগ্নীটির আত্মার জন্যে আপনারা সবাই মিলে আমার সঙ্গে প্রার্থনা করুন।'

তাক থেকে বাইবেলখানা পেড়ে নিয়ে যে টেবিলটাতে ওঁরা খাওয়া-দাওয়া সেরেছেন, সেই টেবিলটারই কাছে গিয়ে বসলেন ডেভিডসন। টেবিলটা তখনও সাফসুফো করা হয়নি। সামনে থেকে চায়ের পাত্রটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন উনি। তারপর এক বলিষ্ঠ অনুনাদী গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সেই অধ্যায়টা পড়ে শোনালেন, যেখানে যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে ব্যভিচারে গা ভাসানো এক মহিলার সাক্ষাৎকারের ঘটনাটা বর্ণনা করা হয়েছে।

'এবারে আমার সঙ্গে আপনারাও নতজানু হয়ে বসুন। তারপর আসুন, আমরা আমাদের প্রিয় ভগিনী স্যাডি টমসনের আত্মার জন্যে প্রার্থনা করি।'

এক দীর্ঘ আবেগময় প্রার্থনায় মুখর হয়ে মিঃ ডেভিডসন ওই পাপীয়সী নারীর প্রতি করুণা বর্ষণের জন্যে ঈশ্বরের কাছে আকুল মিনতি জানাতে লাগলেন। মিসেস ডেভিডসন এবং মিসেস ম্যাকফেইল চোখ বুজে বসে পড়েছেন নতজানু হয়ে। প্রস্তাবটার আকস্মিকতায় ডাক্তারও হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছেন বিহ্বল আনাড়ির মতো। মিশনারিটির প্রার্থনায় এক দুর্বার বন্য বাকপটুত্ব। আবেগে একেবারে জরো-জরো হয়ে উঠেছেন উনি, কথা বলতে বলতে চোখের জল বয়ে চলেছে দু গাল বেয়ে। বাইরে ঝরে চলেছে অবিরল অকরুণ বৃষ্টিধারা—ঠিক মানুষের মতোই প্রবল হিংস্রতা নিয়ে।

অবশেষে ডেভিডসন থামলেন। ক্ষণিকের বিরতি নিয়ে উনি বললেন, 'এবারে আমরা প্রার্থনাটা পুনরাবৃত্তি করবো।'

প্রার্থনা শেষ হলো। ডেভিডসনকে অনুসরণ করে ওঁরা প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ালেন। মিসেস ডেভিডসনের মুখখানা পাংশুল এবং প্রশান্ত। উনি শান্তি ও স্বস্তি পেয়েছেন। কিন্তু ম্যাকফেইল দম্পতি যেন আচমকা লজ্জিত হয়ে উঠলেন—বুঝে উঠতে পারলেন না, তাঁরা কোন দিকে তাকাবেন।

'আমি একটু নিচে গিয়ে দেখে আসছি, ও কেমন আছে,' ডক্টর ম্যাকফেইল বললেন।

উনি টোকা দিতেই হর্ণ ঘরের দরজাটা খুলে দিলো। মিস টমসন একটা দোল-কুর্সিতে বসে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো।

'তুমি ওখানে কি করছো?' ডাক্তার বিস্মিত স্বরে শুধোলেন। 'আমি তো তোমাকে শুয়ে থাকতে বলেছিলাম!'

'শুতে পারছি না! আমি মিঃ ডেভিডসনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'বেচারী! তাতে কি কোনো লাভ হবে বলে তুমি মনে করো? তুমি তাঁকে কিছুতেই টলাতে পারবে না।'

'উনি বলেছিলেন, আমি ডেকে পাঠালেই উনি আসবেন।'

ম্যাকফেইল হর্ণকে ইঙ্গিত করলেন, 'যাও, ওঁকে নিয়ে এসো।'

হর্ণ ওপরে চলে গেলো। ম্যাকফেইল মিস টমসনের সঙ্গে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ডেভিডসন ঘরে এসে ঢুকলেন। মিস টমসন বিষণ্ণ মলিন মুখে তাঁর দিকে তাকালো, 'আপনাকে এখানে আসতে বলেছি বলে মাফ করবেন।'

'আমি আশা করছিলাম তুমি আমাকে ডেকে পাঠাবে। জানতাম, ঈশ্বর আমার প্রার্থনায় সাড়া দেবেন।'

এক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন দুজনে, তারপর মিস টমসন অন্য দিকে চোখ সরিয়ে নিলো। অন্য দিকে তাকিয়েই ও বললো, 'আমি খারাপ মেয়ে-ছেলে। আমি অনুতাপ করতে চাই।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন!' ঘরের অন্য পুরুষ দুজনের দিকে ঘুরে তাকালেন ডেভিডসন, 'আমাকে একটু ওর সঙ্গে একা থাকতে দিন। আর মিসেস ডেভিডসনকে একটু বলে দেবেন, আমাদের প্রার্থনায় সাড়া মিলেছে।'

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

'কি কাণ্ড!' বললো হর্ণ।

সেদিন অনেক রাত অব্দি ডক্টর ম্যাকফেইল ঘুমোতে পারছিলেন না। ডেভিডসনের ওপরে আসার শব্দ শুনে তিনি যখন নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, তখন রাত দুটো। কিন্তু অতো রাত হওয়া সত্ত্বেও ডেভিডসন তক্ষুণি শুয়ে পড়েননি। কারণ কাঠের বিভাজকটার ওধার থেকে ডেভিডসনের সরব প্রার্থনা শুনতে শুনতে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ডক্টর ম্যাকফেইল।

পরদিন ভদ্রলোকের চেহারা দেখে ম্যাকফেইল অবাক হয়ে গেলেন। উনি আগের চাইতেও পাংশুল আর ক্লান্ত। কিন্তু এক অমানুষিক দীপ্তিতে ওঁর চোখ দুটো জ্বলছে—দেখে মনে হয় যেন এক উচ্ছলিত আনন্দে উনি পরিপূর্ণ।

'এক্ষুণি নিচে গিয়ে একবার স্যাডিকে দেখে আসুন,' উনি বললেন। 'ওর শরীর আগের চাইতে ভালো হয়েছে বলে আশা করতে পারি না, কিন্তু ওর আত্মা…ওর আত্মার রূপান্তর হয়ে গেছে!'

নিজেকে নিস্তেজ এবং বিচলিত বলে মনে হচ্ছিলো ডাক্তারের। বললেন, 'আপনি তো গতকাল অনেক রাত অব্দি ওর কাছে ছিলেন।'

'হ্যাঁ, ও আমাকে ছাড়তে পারছিলো না।'

'দেখে মনে হচ্ছে আপনি প্রচণ্ড খুশি!' ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়লো।

'এক মহান করুণাধারা আমাকে ধন্য করেছে,' এক নিবিড় আনন্দে ডেভিডসনের চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো। 'গতকাল রাত্রে একটি পথহারা আত্মাকে যীশুর প্রেমালিঙ্গনে ফিরিয়ে আনার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।'

মিস টমসন আবার সেই দোল-কুর্সিতেই বসে আছে। বিছানা গোছানো হয়নি। ঘর এলোমেলো। নিজের বেশবাস সেরে নেবার ঝঞ্ঝাটটুকুও ও নেয়নি। পরনে একটা নোংরা অঙ্গাবরণী, চুলগুলো কোনোমতে একটা ঝুঁটি বেঁধে রাখা। মুখে একটু ভিজে তোয়ালে বুলিয়েছে বটে, কিন্তু কেঁদে কেঁদে সারা মুখ ফুলে রয়েছে। দেখতে বিশ্রী লাগছে।

ডাক্তার ঘরে ঢুকতে ও বিষণ্ণ দুটি চোখ তুলে তাকালো। ভয়ে কুণ্ঠিত, ভেঙে পড়া চেহারা।

'মিঃ ডেভিডসন কোথায়?' জিগেস করলো ও।

'তুমি চাইলেই উনি এসে পড়বেন,' ডাক্তার তিক্তস্বরে বললেন। 'আমি দেখতে এলাম তুমি কেমন আছো।'

'বোধহয় ভালোই আছি। ও ব্যাপারে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।'

'কিছু খেয়েছো?'

'হর্ণ একটু কফি এনে দিয়েছিলো।' উদ্বিগ্ন মুখে দরজার দিকে তাকালো মিস টমসন, 'আপনার কি মনে হয়, উনি শীগগিরি নিচে আসবেন? উনি যখন কাছে ছিলেন, তখন আমার বোধহয় এতোটা খারাপ লাগছিলো না।'

'তোমার কি মঙ্গলবারই যাওয়া ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ। উনি বলেছেন, আমাকে যেতেই হবে। দয়া করে ওঁকে এক্ষুণি এখানে আসতে বলুন! আপনি আমার কোনো উপকার করতে পারবেন না। এখন একমাত্র উনিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

'খুব ভালো কথা,' বললেন ডক্টর ম্যাকফেইল।

পরবর্তী তিনদিন ডেভিডসন অধিকাংশ সময়টা স্যাডি টমসনের সঙ্গেই কাটালেন। শুধুমাত্র খাওয়াদাওয়ার সময়টুকুতেই তিনি অন্যদের সঙ্গে এসে যোগ দিতেন। ডক্টর ম্যাকফেইল লক্ষ্য করলেন, উনি খাচ্ছেনও খুবই কম।

মিসেস ডেভিডসন করুণভাবে বললেন, 'উনি নিজেকে ক্ষয় করে ফেলছেন। সাবধান না হলে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। কিন্তু নিজেকেও উনি রেহাই দেবেন না।'

মিসেস ডেভিডসন নিজেও পাণ্ডুর আর পাংশুল। মিসেস ম্যাকফেইলকে উনি বলেছেন, রাতে ওঁর ঘুম হয় না। ওদিকে মিস টমসনের কাছ থেকে ওপরে এসে ডেভিডসনও রাত্রিবেলা নিজে অবসন্ন না হওয়া অব্দি একটানা প্রার্থনা করে যান, কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশিক্ষণ ঘুমোন না। দু-এক ঘণ্টা পরেই বিছানা থেকে উঠে পোশাক-আশাক পরে উপসাগরের ধারে ঘুরতে চলে যান। রাতে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন।

'আজ সকালে আমাকে বললেন, উনি নেব্রাস্কার পাহাড়ের স্বপ্ন দেখেছেন,' মিসেস ডেভিডসন জানালেন।

'ভারি অদ্ভুত তো!' বললেন ডক্টর ম্যাকফেইল। তাঁর মনে পড়লো, অ্যামেরিকার ভেতর দিয়ে যাবার সময় ট্রেনের জানলা দিয়ে তিনি ওই পাহাড়-গুলোকে দেখেছিলেন। যেন গন্ধমূষিকের খুঁড়ে রাখা বিশাল বিশাল মাটির ঢিপি—সুগোল, মসৃণ, যেন সমভূমি থেকে আচমকা জেগে উঠেছে। ডক্টর ম্যাকফেইলের মনে পড়লো, তখন তাঁর মনে হয়েছিলো ওই পাহাড়গুলোর সঙ্গে নারীবক্ষের আশ্চর্য মিল রয়েছে।

ডেভিডসনের অস্থিরতা তাঁর নিজের কাছেও অসহনীয় হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু তিনি এক আশ্চর্য পরমানন্দে ভেসে রয়েছেন। হতভাগিনী মেয়েটার হৃদয়ের গোপন কোণে লুকিয়ে থাকা পাপের শেষ চিহ্নটুকুও তিনি সমূলে উৎপাটিত করে চলেছেন।

ওর সঙ্গেই তিনি পাঠ করছেন, প্রার্থনাও করছেন ওরই সঙ্গে।

'এ এক বিস্ময়, এক সত্যিকারের পুনর্জন্ম!' একদিন রাত্রিবেলা খেতে বসে ডেভিডসন বললেন, 'ওর আত্মা, যা রাত্রির মতো কালো ছিলো—তা এখন সদ্য ঝরে পড়া তুষারের মতোই শুভ্র আর বিশুদ্ধ। সমস্ত পাপের জন্যে ওর অনুশোচনা বড়ো সুন্দর। আমার অহংকার ঘুচে গেছে, আমার ভয় করছে। মনে হচ্ছে, আমি ওর পোশাকের প্রান্তভাগও স্পর্শ করার যোগ্য নই।'

'এখন কি আপনি ওকে প্রাণে ধরে স্যান ফ্র্যানসিসকোতে ফেরত পাঠাতে পারবেন?' ডাক্তার বললেন, 'অ্যামেরিকার এক কয়েদখানায় তিনটে বছর! আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি হয়তো সেটা থেকে ওকে বাঁচাবেন।'

'আঃ, আপনি কেন বুঝছেন না? ওটা দরকার! আপনি কি মনে করেন ওর জন্যে আমার হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে না? আমি ওকে ভালোবাসি—যেমন ভালোবাসি আমার স্ত্রীকে, আমার বোনকে। ও যতোদিন কয়েদখানায় থাকবে, ততোদিন কারাবাসের সমস্ত যন্ত্রণা ওর মতো আমিও ভোগ করবো।'

'অর্থহীন বাগাড়ম্বর!' ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে উঠলেন ডাক্তার।

'আপনি বুঝতে পারছেন না, কারণ আপনি অন্ধ। ও পাপ করেছে, যন্ত্রণা ওকে ভোগ করতেই হবে। আমি জানি ওকে কি সহ্য করতে হবে। সেখানে ও উপবাসী থাকবে, ওকে অত্যাচার করা হবে, অপমান করা হবে। কিন্তু আমি চাই, ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গিতা হিসেবে ও মানুষের দেওয়া সে সমস্ত শাস্তি গ্রহণ করুক। সানন্দে গ্রহণ করুক। ও যে সুযোগ পেয়েছে, তা খুব কম লোকের কাছেই আসে। ঈশ্বর বড়ো মঙ্গলময়, বড়ো করুণাময়!' ডেভিডসনের কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে ওঠে। প্রবল আবেগে ওঁর ঠোঁট থেকে সবেগে বেরিয়ে আসা শব্দগুলোকে উনি সচেষ্ট প্রয়াসেও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারেন না।

'সমস্ত দিন আমি ওর সঙ্গে প্রার্থনা করি। ওর কাছ থেকে চলে এসে আবারও করি। প্রার্থনা করি আমার সমস্ত শক্তি আর প্রাণ দিয়ে, যাতে যীশু ওকে এই পরম করুণায় ধন্য করেন। শাস্তি পাবার জন্যে আমি ওর প্রাণে এমন একটা সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে চাই যাতে শেষ পর্যন্ত আমি ওকে ছেড়ে দেবার প্রস্তাব জানালেও ও তা প্রত্যাখ্যান করবে। আমি চাই ও অনুভব করুক, কারাবাসের ওই নিদারুণ যন্ত্রণা আসলে সেই পরম প্রভুর পায়ের কাছে নিবেদন করা ওর কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য বিশেষ, যিনি ওর জন্যেই নিজের জীবন দিয়েছেন।'

মন্থর গতিতে কেটে যায় দিনগুলো। বাড়ির সকলকার একান্ত মনোযোগ এক-তলার ওই যন্ত্রণাপীড়িত হতভাগিনী মেয়েটার দিকে। এক অস্বাভাবিক উত্তেজনার

মধ্যে বাস করছে সকলে। যেন এক নিষ্ঠুর মূর্তি পূজার বর্বর আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্যে প্রস্তুত করানো হচ্ছে মেয়েটাকে। আতঙ্ক ওকে অসাড় করে তুলেছে। ডেভিড-সনকে ও চোখের আড়াল করতে চায় না। একমাত্র তিনি কাছে থাকলেই ও মনে সাহস পায়, ক্রীতদাসীর মতো নির্ভরতা নিয়ে লেগে থাকে তাঁর সঙ্গে। ভীষণ কান্না-কাটি করে মেয়েটা। বাইবেল পড়ে, প্রার্থনা করে। আবার মাঝে মাঝে একেবারে ক্লান্ত আর উদাস হয়ে ওঠে। তখন ও সত্যিই ওর শেষ অগ্নিপরীক্ষার জন্যে উন্মুখ হয়ে পড়ে—কারণ ওর মনে হয়, এই প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাবার পক্ষে সেটাই একমাত্র প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব পথ। যে অস্পষ্ট আতঙ্ক এখন ওকে জর্জরিত করে তুলেছে, আর বেশি দিন ও তা সহ্য করতে পারবে না। পাপের ভারে ও সমস্ত ব্যক্তিগত অহমিকা বিসর্জন দিয়েছে। চটকদার অঙ্গাবরণীটা গায়ে জড়িয়ে অপরিচ্ছন্ন অবিন্যস্ত অবস্থায় ও ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় অনবরত। চারদিন ধরে ও গা থেকে রাত্রিবাসটা ছাড়েনি, মোজা পরেনি। ঘরটা নোংরা অগোছালো হয়ে আছে। ওদিকে নির্মম একগুঁয়েমি নিয়ে বৃষ্টি হয়েই চলেছে একটানা। এক-একবার মনে হয়, শেষ অব্দি আকাশটা নিশ্চয়ই জলশূন্য হয়ে যাবে। কিন্তু তবু পাগল করা পুনরাবৃত্তিকর ভঙ্গিমায় টিনের চালে ঋজু আর ঘন ধারায় বৃষ্টি ঝরতেই থাকে অবিরাম। সমস্ত কিছু ভিজে, স্যাঁতসেঁতে। ঘরের দেয়াল আর মেঝেতে দাঁড় করিয়ে রাখা জুতোগুলোতে ছাতা ধরে গেছে। নিদ্রাহীন রাত জুড়ে ক্রুদ্ধ স্বরে গুঞ্জন করে অজস্র মশকবাহিনী।

'অন্তত একটা দিন যদি বৃষ্টিটা থামতো, তাহলে এতোটা খারাপ লাগতো না,' ডক্টর ম্যাকফেইল বললেন।

ওঁরা সকলেই মঙ্গলবারের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। স্যান ফ্র্যানসিসকো-গামী জাহাজ-টার ওইদিনই সিডনি থেকে এখানে এসে পৌঁছুবার কথা। মানসিক চাপ এখন একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে। ডক্টর ম্যাকফেইলের কথা বলতে গেলে, ওই হত-ভাগিনী মেয়েটার সম্পর্কে ভারমুক্ত হবার বাসনা তাঁর মন থেকে করুণা আর ক্রোধ —দুটোকেই সমানভাবে একাকার করে মুছে দিয়েছে। যা অনিবার্য তাকে মেনে নিতেই হবে। তাঁর মনে হচ্ছিলো, জাহাজটা ছেড়ে গেলে তিনি আরও নিশ্চিন্ত মনে নিঃশ্বাস নিতে পারবেন। গভর্নরের দফতরের একজন কেরানী এসে স্যাডি টমসনকে জাহাজে নিয়ে যাবে। লোকটা সোমবার সন্ধ্যাবেলায় এসে স্যাডিকে পরদিন বেলা এগারোটার সময় তৈরি হয়ে থাকার কথা বলে গেলো। ডেভিডসন তখন স্যাডির কাছেই ছিলেন। বললেন, 'সব কিছু যাতে তৈরি থাকে, আমি তা দেখবো। আমি নিজেও ওকে জাহাজে তুলে দিতে যাবো।'

মিস টমসন কিছু বললো না।

মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে সাবধানে গুঁড়ি মেরে মশারির মধ্যে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডক্টর ম্যাকফেইল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এবারে সব শেষ! আসছে কাল এমন সময় মেয়েটা এখান থেকে চলে গেছে।'

'মিসেস ডেভিডসনও এবারে খুশি হবেন। উনি তো বলেন, ভদ্রলোক নিজেকে ক্ষইয়ে ক্ষইয়ে একেবারে একটা ছায়া করে তুলছেন।' মিসেস ম্যাকফেইল বললেন, 'এখন ও কিন্তু একেবারে অন্য মেয়ে।'

'কে?'

'স্যাডি। এমনটি কখনও সম্ভব হবে বলে আমি ভাবতেই পারিনি। এতে সত্যিই মাথা নিচু হয়ে আসে।'

ডক্টর ম্যাকফেইল কোনো জবাব দিলেন না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ভীষণ ক্লান্ত ছিলেন বলে ঘুমটাও স্বাভাবিকের চাইতে বেশি গাঢ় হলো। সকাল বেলায় কে একজন গায়ে একখানা হাত রাখতে তাঁর ঘুম ভাঙলো। চমকে উঠেই বিছানার পাশে হর্ণকে দেখতে পেলেন তিনি। ঠোঁটে আঙুল রেখে হর্ণ তাঁকে কিছু বলতে বারণ করলো, তারপর ইঙ্গিতে বেরিয়ে আসতে বললো। সাধারণত লোকটা বিবর্ণ মলিন পাতলুন পরে থাকে, কিন্তু এখন ওর পা দুটো নগ্ন—পরনে শুধু স্থানীয় অধিবাসীদের পোশাক লাভা-লাভা। আচমকা লোকটাকে যেন বর্বরের মতো দেখালো। বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে ডক্টর ম্যাকফেইল লক্ষ্য করলেন, ওর সর্বাঙ্গে অসংখ্য উল্কি আঁকা। ডাক্তারকে সে বারান্দায় আসতে ইঙ্গিত করলো, বিছানা থেকে নেমে ডাক্তারও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

'আওয়াজ করবেন না,' হর্ণ ফিসফিসিয়ে বললো। 'আপনাকে দরকার। কোট আর জুতোটুতো পরে নিন। শীগগির।'

ডক্টর ম্যাকফেইলের প্রথমেই মনে হলো, মিস টমসনের কিছু হয়েছে।

'কি ব্যাপার? আমার যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে আসবো নাকি?'

'তাড়াতাড়ি করুন, দয়া করে তাড়াতাড়ি করুন।'

চুপিসাড়ে শোবার ঘরে ফিরে এসে ডক্টর ম্যাকফেইল পাজামার ওপরে একটা বর্ষাতি আর রবারের তলি লাগানো একজোড়া জুতো পরে নিলেন। তারপর হর্ণের সঙ্গে পা টিপে টিপে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে দেখলেন, রাস্তার দিকের দরজাটা খোলা এবং সেখানে জনা-ছয়েক স্থানীয় অধিবাসী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'ব্যাপারটা কি?' ফের জিগেস করলেন ডাক্তার।

'আমার সঙ্গে আসুন।' হর্ণ দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো, ডাক্তার তাকে অনুসরণ

করলেন। স্থানীয় লোকগুলোও ছোট্ট একটা দল বেঁধে ওঁদের পেছন পেছন চললো। রাস্তাটা পেরিয়ে ওঁরা সমুদ্রের ধারে গিয়ে পৌঁছলেন। ডাক্তার দেখলেন, একদল স্থানীয় লোক জলের ধারে যেন কি একটা বস্তুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েক-গজের দূরত্বটা ওঁরা দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন, স্থানীয় লোকগুলো সরে গিয়ে ডাক্তারের পথ করে দিলো। হর্ণ ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলো সামনের দিকে। তখনই ডাক্তার দেখতে পেলেন, অর্ধেক জলে আর অর্ধেক জলের বাইরে একটা ভয়ঙ্কর জিনিস পড়ে রয়েছে সেখানে—সেটা ডেভিডসনের মৃতদেহ। আকস্মিক বিপদে বুদ্ধি হারাবার মত মানুষ নন ডক্টর ম্যাকফেইল। নিচু হয়ে তিনি লাশটাকে উলটে দিলেন। লাশের গলাটা এক কান থেকে অন্য কান অব্দি কাটা—ডান হাতে তখনও সেই ক্ষুরটা ধরা, যেটা দিয়ে কাজটা সারা হয়েছে।

'এতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!' ডাক্তার বললেন, 'নিশ্চয়ই বেশ কিছুক্ষণ আগে মৃত্যু হয়েছে।'

'একটা ছেলে এক্ষুণি কাজে যাবার পথে ওঁকে এখানে পড়ে থাকতে দেখে, আমাকে গিয়ে খবর দেয়। আপনার কি মনে হয় কাজটা উনি নিজেই করেছেন?'

'হ্যাঁ। কারুর গিয়ে পুলিসে খবর দেওয়া দরকার।'

হর্ণ স্থানীয় ভাষায় কিছু বলতেই দুজন যুবক রওনা হয়ে গেলো।

'পুলিস না আসা অব্দি ওঁকে এখানেই ফেলে রাখতে হবে,' ডাক্তার বললেন।

'তারা যেন ওঁকে আমার বাড়িতে নিয়ে না যায়। ওই লাশ আমি আমার বাড়িতে তুলতে দেবো না।'

'কর্তৃপক্ষ যা বলবে আপনি তা-ই করবেন,' ডাক্তার তীক্ষ্ণস্বরে বললেন। 'তবে ঘটনা অনুযায়ী ওরা ওঁকে মর্গেই নিয়ে যাবে বলে মনে হয়!'

ওঁরা ওখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। হর্ণ লাভা-লাভার ট্যাঁক থেকে একটা সিগারেট বের করে নিলো, ডাক্তারকেও দিলো একটা। লাশটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খানিকক্ষণ ধূমপান করলেন দুজনে। ডাক্তার কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

হর্ণ জিগেস করলো, 'আচ্ছা, উনি কেন এমন করলেন বলে আপনার মনে হয়?'

ডাক্তার দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললেন। সামান্য কিছুক্ষণ বাদেই একজন নৌ-সেনানীর অধীনে স্থানীয় পুলিস একটা স্ট্রেচার নিয়ে পৌঁছে গেলো এবং তার ঠিক পরেই এসে হাজির হলো নৌ-বাহিনীর কয়েকটি অফিসার আর একজন ডাক্তার। পেশাদারী ভঙ্গিমায় সমস্ত কিছু সেরে ফেললো ওরা।

'ওঁর স্ত্রীকে খবরটা দেবার কি হবে?' একজন অফিসার প্রশ্ন করলো।

'আপনারা এসে গেছেন, এবারে আমি বাড়ি ফিরে জামাটামা পরে ওঁকে খবরটা জানাবার ব্যবস্থা করবো। লাশটা একটু মেরামত না করা অব্দি উনি সেটা না দেখলেই বরং ভালো হয়।'

'তা আপনি বোধহয় ঠিকই বলেছেন,' ডাক্তার বললেন।

বাড়ি ফিরে ডক্টর ম্যাকফেইল দেখলেন, তাঁর স্ত্রীর পোশাক-আশাক পরা প্রায় শেষ। ডাক্তার ঘরে ঢুকতেই উনি বললেন, 'মিসেস ডেভিডসন স্বামীকে নিয়ে ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। ভদ্রলোক কাল সারারাত শুতে আসেননি। মিসেস ডেভিডসন রাত দুটোর সময় মিস টমসনের ঘর থেকে ওঁর বেরিয়ে আসার আওয়াজ পেয়েছেন। কিন্তু তারপর ভদ্রলোক বাইরে চলে গেছেন। উনি যদি সেই থেকে শুধু হাঁটাহাঁটিই করে থাকেন, তাহলে নির্ঘাত মারা পড়বেন।'

কি ঘটেছে তা জানিয়ে ডক্টর ম্যাকফেইল স্ত্রীকে খবরটা মিসেস ডেভিডসনের কাছে ভাঙতে বললেন।

'কিন্তু কেন উনি এ কাজ করলেন?' আতঙ্কিত হয়ে জিগেস করলেন মিসেস ম্যাকফেইল।

'তা আমি জানি না।'

'কিন্তু আমি এ কাজ পারবো না।'

'পারতেই হবে।'

ভয়ার্ত চোখে স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মিসেস ম্যাকফেইল। মিসেস ডেভিডসনের ঘরে ওঁর ঢোকার আওয়াজ পেলেন ডাক্তার। তারপর নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্যে এক মিনিট অপেক্ষা করে, দাড়ি কামানো এবং হাত-মুখ ধোয়া শুরু করলেন। সবশেষে পোশাক-আশাক পরে উনি স্ত্রীর প্রতীক্ষায় বিছানায় গিয়ে বসে রইলেন। অবশেষে মিসেস ম্যাকফেইল এলেন।

'মিসেস ডেভিডসন ওঁকে দেখতে চান।'

'ওঁকে মর্গে নিয়ে গেছে। আমরাও বরঞ্চ মিসেস ডেভিডসনের সঙ্গে যাই, চলো। উনি কিভাবে নিলেন খবরটা?'

'মনে হলো উনি পাথর হয়ে গেছেন। কাঁদেননি। কিন্তু একটা পাতার মতো কাঁপছেন।'

'আমরা বরং এখুনি যাই তাহলে।'

মিসেস ডেভিডসনের ঘরের দরজায় টোকা দিতেই উনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। ওঁর মুখ ভীষণ ফ্যাকাশে, কিন্তু চোখ দুটি শুকনো। ডাক্তারের মনে হলো, উনি যেন অস্বাভাবিক রকমের শান্ত। কোনো কথা বিনিময় হলো না, নিঃশব্দেই ওঁরা পথ

ধরে এগুলেন। মর্গে পৌঁছে মিসেস ডেভিডসন বললেন, 'আমাকে একা গিয়ে ওঁকে দেখে আসতে দিন।'

ম্যাকফেইল দম্পতি এক পাশে সরে দাঁড়ালেন। একটা স্থানীয় লোক মিসেস ডেভিডসনের জন্যে দরজাটা খুলে, ফের বন্ধ করে দিলো। ম্যাকফেইলরা বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দু-একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ এসে নিচু গলায় ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বললো। ডক্টর ম্যাকফেইল এই বিয়োগান্ত ঘটনাটা সম্পর্কে যা জানেন, ফের তাদের বললেন। অবশেষে নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেলো, মিসেস ডেভিডসন বাইরে বেরিয়ে এলেন। নীরবতা নেমে এলো ওদের ওপরে।

'আমি এবারে ফিরে যাবার জন্যে তৈরি,' বললেন মিসেস ডেভিডসন।

ওঁর কণ্ঠস্বর কঠিন এবং স্থির। ডক্টর ম্যাকফেইল ওঁর চাহনির অর্থ বুঝতে পারলেন না। পাণ্ডুর মুখখানি যেন বড্ড বেশি কঠোর। কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে ফিরে চললেন ওঁরা এবং অবশেষে সেই মোড়টায় পৌঁছে গেলেন যার উলটো দিকেই ওঁদের বাসস্থান। মিসেস ডেভিডসন সজোরে একটা নিঃশ্বাস নিলেন এবং মুহূর্তের জন্যে ওঁরা একেবারে নিশ্চল হয়ে গেলেন। একটা অবিশ্বাস্য আওয়াজ ওদের শ্রুতিতে আঘাত হানছিলো। যে গ্রামোফোনটা এতোদিন না বেজে নীরব হয়ে ছিলো, এখন সেটাতে আবার উচ্চকিত কর্কশ চিৎকারে নিগ্রো সংগীতের সুর বাজছে।

'ওটা কি ?' আতঙ্কিত হয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন মিসেস ম্যাকফেইল।

'চলুন, আমরা এগোই,' মিসেস ডেভিডসন বললেন।

সিঁড়ি পেরিয়ে ওরা হলঘরে গিয়ে ঢুকলেন। মিস টমসন ওর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একটা নাবিকের সঙ্গে কথা বলছিলো। একটা আকস্মিক পরিবর্তন এসেছে মেয়েটার মধ্যে। এখন ও আর গত কয়েকদিনের সেই ভেঙে-পড়া হতশ্রী মেয়েটি নেই। এখন ওর পরনে সাদা পোশাক, পায়ে চকচকে উঁচু জুতো, মোটাসোটা পাগুলো ফুলে উঠেছে সুতির মোজার ভেতর থেকে। চুলগুলো সুবিন্যস্ত। মাথায় ঝলমলে ফুল লাগানো সেই বিশাল টুপি। ওর মুখে রঙ, ভ্রূযুগল কালোর স্পর্শে প্রকট, ঠোঁট দুটো টকটকে লাল। ঋজু ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। এ ওঁদের প্রথম দিকের চেনা সেই অহঙ্কারী রাণী। ওঁরা ভেতরে ঢুকতেই মেয়েটা বিদ্রূপের অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো এবং তারপর মিসেস ডেভিডসন নিজের অজান্তে থমকে দাঁড়াতেই ও মুখের মধ্যে খানিকটা থুতু সংগ্রহ করে সেটা থুক করে ছুঁড়ে ফেললো। মিসেস ডেভিডসন কুঁকড়ে পেছিয়ে গেলেন, আচমকা দুটি রক্তিম বিন্দু ফুটে উঠলো ওঁর গাল দুটিতে। তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে দ্রুত পায়ে উনি একছুটে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

ডক্টর ম্যাকফেইল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। মেয়েটাকে ঠেলে সরিয়ে তিনি ওর ঘরে ঢুকে চিৎকার করে উঠলেন, 'এসব কোন্ ধরনের বদমাইশি হচ্ছে? বন্ধ করো ওই হতচ্ছাড়া যন্ত্রটাকে।'

এগিয়ে গিয়ে রেকর্ডটা তুলে ফেললেন ডাক্তার।

মেয়েটা ঘুরে দাঁড়ালো তাঁর দিকে, 'হ্যাঁ, এসব অর্থহীন কথা নিশ্চয়ই আপনি আমার সঙ্গে বলতে পারেন বইকি! কিন্তু আপনি আমার ঘরে এসে ঢুকেছেন কেন, শুনি?' 'তার মানে?' ডাক্তার চিৎকার করে উঠলেন, 'কি বলতে চাও তুমি?'

নিজেকে একটু গুছিয়ে নিলো মেয়েটা। ওর অভিব্যক্তিতে ফুটে ওঠা সেই বিদ্রূপ আর জবাবের মধ্যে মিশে থাকা সেই নিদারুণ ঘৃণা কারুর পক্ষেই বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

'পুরুষমানুষের জাত! তোমরা নোংরা, নোংরা শুয়োর! তোমরা সবাই সমান, প্রত্যেকে এক! শুয়োর! শুয়োর!'

ডক্টর ম্যাকফেইল একটু নিঃশ্বাসের জন্যে হাঁফিয়ে উঠলেন। তিনি সব বুঝে গিয়েছিলেন।

সবজান্তাবাবু

পরিচয় হবার আগেই ম্যাক্স কেলাডাকে আমি অপছন্দ করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলাম। যুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে, সমুদ্রগামী জাহাজগুলোতে যাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড়। জায়গা পাওয়াই কঠিন ব্যাপার। কাজেই দালালরা নিজেদের খুশিমতো যেমন বন্দোবস্ত করে দিতে চাইবে, তাই-ই মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। নিজের জন্যে একটা গোটা কেবিন আশাই করা যায় না। তাই মাত্র দু বার্থের একটা কেবিনে জায়গা পেয়ে নিজেকে ধন্য বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গীর নাম শুনে মনটা দমে গেলো। কারণ নামেই ইঙ্গিত রয়েছে, কেবিনের জানলা উনি বন্ধ করে রাখবেন, রাতের বাতাস থেকে সম্পূর্ণ বিবর্জিত হয়ে থাকবে কেবিনটা। চোদ্দটা দিন অন্য কারুর সঙ্গে এক কেবিনে থাকাটাই যথেষ্ট বিশ্রী ব্যাপার (আমি যাচ্ছি স্যান ফ্রানসিসকো থেকে ইয়োকোহামা), তবু সহযাত্রীটির নাম স্মিথ কিংবা ব্রাউন হলে পরিস্থিতিটা আমার কাছে খানিকটা কম আতঙ্কজনক বলে মনে হতো।

জাহাজে উঠে দেখি, মিঃ কেলাডার মালপত্র ইতিমধ্যেই মেঝেতে নামানো হয়ে গেছে। ওগুলোর চেহারা আমার কাছে আদপেই পছন্দসই বলে মনে হলো না। স্যুটকেসগুলোতে বড্ড বেশি লেবেল সাঁটা, পোশাক রাখার তোরঙ্গটা বড্ড বড়ো। ভদ্রলোক ততোক্ষণে প্রসাধনের জিনিসগুলো নামিয়ে ফেলেছিলেন। বেসিনের তাকে রাখা সুগন্ধি, চুলের প্রসাধনী এবং ওঁর ব্রিলিয়ান্টাইনগুলো দেখে বুঝলাম উনি সব-চাইতে-সেরা মঁ্যসিয় কোতির একজন পৃষ্ঠপোষক। আবলুশ কাঠের হাতলে সোনালি মনোগ্রাম করা চুলের বুরুশগুলোকে ঘষেমেজে সাফ করা প্রয়োজন। মোট কথা, মিঃ কেলাডাকে আমার একেবারেই ভালো লাগলো না। তাই ধূমপানের ঘরে গিয়ে এক প্যাকেট তাস চেয়ে নিয়ে পেশেন্স খেলতে শুরু করলাম। কিন্তু খেলা শুরু করতে না করতেই এক ভদ্রলোক কাছে এগিয়ে এসে জিগেস করলেন, তাঁর ধারণা আমার নামই অমুক—ঠিক কি না।

'আমি মিঃ কেলাডা,' হাসির সঙ্গে এক সারি ঝকঝকে দাঁতের ঝিলিক ছড়িয়ে উনি আসন গ্রহণ করলেন।

'ও, হ্যাঁ। সম্ভবত আমরা একই কেবিনের অংশীদার।'

'এটাকে আমি খানিকটা সৌভাগ্যই বলবো। কারণ কাকে যে কার সঙ্গে এক ঘরে গুঁজে দেওয়া হবে, তা কেউই বলতে পারে না। তাই আপনি ইংরেজ শুনে আমার ভীষণ আনন্দ হয়েছিলো। বিদেশে আমি আমাদের, মানে ইংরেজদের, একত্র হয়ে থাকার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। আশা করি আপনি আমার কথাটার অর্থ ধরতে পেরেছেন।'

'আপনি ইংরেজ?' অবাক বিস্ময়ে হয়তো খানিকটা বোকার মতোই আমি প্রশ্ন করে বসলাম।

'অবশ্যই! আমাকে দেখে আপনি নিশ্চয়ই অ্যামেরিকান বলে মনে করেননি, তাই না? আমি একজন খাঁটি ব্রিটিশ।' কথাটার প্রমাণস্বরূপ মিঃ কেলাডা পকেট থেকে একটা প্যাসপোর্ট বের করে আমার নাকের ডগায় নাচিয়ে দিলেন।

রাজা জর্জের বহু বিচিত্র প্রজা। মিঃ কেলাডা বেঁটেখাটো, শক্তসমর্থ চেহারার মানুষ। মুখখানা পরিষ্কার করে কামানো, গায়ের রঙ ঘন, নাকটা মাংসল এবং বাঁকানো, চোখ দুটো খুব বড়ো আর উজ্জ্বল। ওঁর মাথায় লম্বা লম্বা কালো, কোঁকড়ানো, মসৃণ চুল। যে স্বচ্ছন্দগতিতে উনি কথা বলেন, তাতে ইংরেজত্ব বলতে কিছু নেই এবং ওঁর অঙ্গভঙ্গিতেও উচ্ছ্বাসের বড্ড আধিক্য। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, ওঁর ওই ব্রিটিশ পাসপোর্টখানা একটু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেই ধরা পড়ে যাবে যে, ইংলণ্ডে সাধারণত যেমনটি দেখা যায়, তার চাইতে আরও নীল আকাশের

নিচে জন্ম হয়েছে মিঃ কেলাডার।

'কি পান করবেন?' প্রশ্ন করলেন উনি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমি ওঁর দিকে তাকালাম। এখানে মদ্যপান নিষিদ্ধ এবং সব দিক দেখেশুনে জাহাজটাকে হাড়ের মতো শুকনো বলেই মনে হয়। তা ছাড়া তেষ্টা না পেলে আমি নিজেই বুঝতে পারি না, জিঞ্জার এল বা লেমন স্কোয়াশ—কোনটা আমার বেশি অপছন্দ।

'শুধু মুখ ফুটে বলুন, হুইস্কি-সোডা না ড্রাই মার্টিনি,' মিঃ কেলাডা আমার দিকে এক ঝলক প্রাচ্য হাসি ছড়ালেন। তারপর পেছনের দুই পকেট থেকে দুটো ফ্লাস্ক বের করে আমার সামনে টেবিলটার ওপরে রাখলেন। আমি মার্টিনিটা বেছে নিলাম আর উনি স্টুয়ার্ডকে ডেকে এক পাত্র বরফ আর দুটো গ্লাস আনার হুকুম দিলেন।

'ভারি ভালো ককটেল,' আমি বললাম।

'আরে মশাই, এটা যেখান থেকে এসেছে সেখানে এ জিনিস আরও প্রচুর আছে। জাহাজে আপনার কোনো বন্ধুবান্ধব থাকলে জানিয়ে দেবেন, আপনার এক দোস্তের কাছে দুনিয়ার তাবৎ মাল মজুত।'

মিঃ কেলাডা বকেই চললেন। উনি নিউইয়র্ক এবং স্যান ফ্রানসিসকোর কথা বললেন। নাটক, ছায়াছবি এবং রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করলেন। উনি একজন দেশপ্রেমিক। ইউনিয়ন জ্যাক এমন একটুকরো কাপড় যা মনের ওপরে নিজের প্রভাব মেলে ধরে—কিন্তু অ্যালেকজান্দ্রিয়া বা বেইরুটের কোনো ব্যক্তি যদি সেটাকে সজোরে নাড়তে থাকে, তাহলে সেটা খানিকটা মর্যাদা হারিয়ে ফেলে বলে আমি মনে না করে পারি না। মিঃ কেলাডা লৌকিকতাবর্জিত মানুষ। আমি শ্রেষ্ঠত্বের ভান করতে চাই না, কিন্তু কোনো সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ সম্বোধন করার সময় আমার নামের আগে মিঃ যোগ করবে—এটা আমি আশা না করে পারি না। নিঃসন্দেহে আমাকে স্বস্তি দেবার জন্যেই মিঃ কেলাডা এ ধরনের কোনো লৌকিক রীতিনীতি বজায় রাখেননি। কিন্তু মিঃ কেলাডাকে আমার ভালো লাগেনি। উনি এখানে এসে বসতেই আমি তাসগুলো এক পাশে সরিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন, প্রথম আলাপের পক্ষে আমাদের কথোপকথন যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ধরে চলেছে মনে করে, ফের আমি খেলা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

'তিরিটা চারের ওপরে বসবে,' মিঃ কেলাডা বললেন।

পেশেন্স খেলার সময় তাস তুলে সেটাকে নিজে একটি বার দেখার সুযোগ পাবার আগেই কেউ যদি বলে দেয় সেটা কোথায় বসবে, তাহলে তার চাইতে বিরক্তিকর আর কিছু হয় না।

'এই তো বেরুচ্ছে, বেরুচ্ছে,' মিঃ কেলাডা চিৎকার করে উঠলেন। 'দশটা থাকে গোলামের ওপরে।'

রাগ আর ঘেন্নায় ভরে ওঠা মন নিয়ে আমি খেলা শেষ করতেই উনি তাসের প্যাকেটটা খপ করে তুলে নিলেন।

'তাসের ম্যাজিক আপনার ভালো লাগে?'

'না, বিচ্ছিরি লাগে,' জবাব দিলাম।

'বেশ, আমি আপনাকে স্রেফ এই একটা খেলা দেখাবো।'

উনি আমাকে তিনটে খেলা দেখালেন। তারপর আমি বললাম, আমি খাওয়ার ঘরে যাচ্ছি—টেবিলের কাছে একটা জায়গা নিতে হবে।

'আরে মশাই, সে সব ঠিক করা আছে। আমি আপনার জন্যে একটা জায়গা নিয়ে রেখেছি। ভাবলাম আমরা এক ঘরেই যখন রয়েছি, তখন এক টেবিলে বসেও তো দিব্যি খাওয়া যেতে পারে!'

মিঃ কেলাডাকে আমার আদপেই পছন্দ হয়নি।

অথচ শুধু এক কেবিনে থাকা আর দিনে তিনবার ওর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাওয়াই নয়, ডেকে একটু হেঁটে চলে বেড়াবার সময়ও ওঁর হাত থেকে আমার রেহাই মেলে না। লোকটাকে ঝেড়ে ফেলা একেবারে অসম্ভব। উনি যে অবাঞ্ছিত হতে পারেন, তা কখনও ওঁর মনেও আসে না। ওঁর বদ্ধমূল বিশ্বাস, ওঁর মতো আমিও ওঁকে দেখে খুশি হই। কেউ নিজের বাড়িতে ওঁকে এক ধাক্কায় সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে মুখের ওপরে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেও ওঁর মনে এমন সন্দেহ জাগবে না যে উনি সে বাড়ির অবাঞ্ছিত অতিথি। লোকটা দিব্যি মিশুকে, তিন দিনের মধ্যেই জাহাজের সকলের সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয়ে গেলো। সব কিছুতেই উনি কর্তাব্যক্তি। জুয়ার তদারকি, নিলামের পরিচালনা, খেলাধুলোর পুরস্কার দেবার জন্যে টাকা তোলা, কয়ট ও গলফ ম্যাচের বন্দোবস্ত, কনসার্টের আয়োজন, ফ্যান্সি-ড্রেস বল নাচের ব্যবস্থা—সব কিছুতেই মিঃ কেলাডি। সর্বদা এবং সর্বত্রই তাঁর উপস্থিতি। নিঃসন্দেহে জাহাজের মধ্যে তিনিই সবচাইতে ঘৃণিত ব্যক্তি। আমরা তাঁকে বলতাম সবজান্তাবাবু, এমন কি সামনাসামনিও। এটাকে উনি প্রশংসা বলেই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু খাওয়ার সময়টাতেই লোকটাকে সবচাইতে অসহ্য লাগতো। তখন প্রায় এক ঘণ্টার কাছাকাছি সময় সকলকে তাঁর দয়ার ওপরেই থাকতে হতো। তখন উনি খোশমেজাজি, খুশিয়াল, বহুভাষী এবং তর্কপ্রবণ। সমস্ত বিষয়েই উনি সকলের চাইতে বেশি ভালো জানেন। কেউ ওঁর মতে সায় না দিলেই সেটা ওঁর আত্মমর্যাদার পক্ষে অপমানজনক হয়ে ওঠে। বিষয়টা যতো তুচ্ছই হোক না কেন, সকলকে

স্বমতে না আনা পর্যন্ত উনি কিছুতেই তা ছাড়বেন না। উনি নিজেও যে ভুল করতে পারেন, এমন সম্ভাবনার কথা ওঁর মনেও আসে না। উনি সব কিছুই জানেন।

সেদিন আমরা ডাক্তারের সঙ্গে এক টেবিলে বসেছি। ডাক্তারটির স্বভাব একটু ঢিলেঢালা আর আমি তো একেবারেই নির্বিকার। তাই আমাদের টেবিলে র‍্যামজে নামক ব্যক্তিটি না থাকলে, মিঃ কেলাডা নিশ্চয়ই নিজের ইচ্ছেমতো আমাদের ওপরে ছড়ি ঘুরিয়ে যেতেন। কিন্তু মিঃ কেলাডার মতো র‍্যামজেও নিজের মতে সর্বদা অবিচল থাকেন এবং পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষ মিঃ কেলাডার প্রবল আত্মবিশ্বাসী মনোভাবে তিনি ঘোরতর বিরক্ত।

র‍্যামজে মার্কিন দূতাবাসের কর্মী, ইদানীং কোবেতে চাকুরীরত। মধ্য-পাশ্চাত্যের এই মানুষটির বিশাল শক্তপোক্ত ভারি চেহারা, আঁটসাঁট চামড়ার নিচে থলথলে চর্বি—রেডিমেড পোশাকের তলা থেকে শরীরটা ঠেলেঠুলে বেরিয়ে পড়তে চায়। ভদ্রলোকের স্ত্রী বছরখানেক ধরে স্বদেশে ছিলেন। র‍্যামজে স্ত্রীকে নিয়ে আসতে অল্প কয়েকদিনের জন্যে নিউ ইয়র্কে গিয়েছিলেন, এখন কর্মস্থলে ফিরছেন। মিসেস র‍্যামজে ভারি মিষ্টি চেহারার মহিলা। যেমন মনোরম ব্যবহার, তেমনি রসবোধ। দূতাবাসের চাকরিতে মাইনেপত্র ভালো নয়। তাই মিসেস র‍্যামজের পোশাক-পরিচ্ছদ সর্বদাই খুব সাদাসিধে। কিন্তু কি ভাবে পোশাক পরতে হয়, তা উনি জানেন। তাই উনি এক শান্ত বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। মেয়েদের মধ্যে সাধারণ ভাবে যে গুণটি একান্ত প্রত্যাশিত, অথচ আজকাল তাঁদের আচার-ব্যবহারে যা চোখে পড়ে না—মিসেস র‍্যামজের মধ্যে সেই গুণটি আছে বলেই তাঁকে আমার নজরে পড়েছিলো। ওঁর দিকে একবার তাকালে ওঁর নম্রতা ও শালীনতাবোধ নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। কোটে লাগানো ফুলের মতো এই গুণটি ওঁর অস্তিত্বে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকে।

একদিন সন্ধ্যায় নৈশভোজের সময় আলোচনাটা দৈবাৎ মুক্তোর প্রসঙ্গে গড়িয়ে গেলো। কৌশলী জাপানীদের তৈরি কৃত্রিম মুক্তোর কথা কয়েক দিন ধরেই পত্রিকা-গুলোতে খুব বেরুচ্ছিলো। ডাক্তার মন্তব্য করলেন, ওগুলো অনিবার্যভাবে খাঁটি মুক্তোর দাম কমিয়ে দেবে। এখনই ওগুলো দিব্যি ভালো হয়েছে, শীগগিরি একে-বারে নিখুঁত হয়ে উঠবে। মিঃ কেলাডা তৎক্ষণাৎ নিজের স্বভাবমতো নতুন প্রসঙ্গের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুক্তোর সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সমস্ত কথাই তিনি আমাদের জানিয়ে দিলেন। র‍্যামজে এ ব্যাপারে আদৌ কিছু জানেন বলে আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু কেলাডাকে উপহাস করার এমন একটা সুযোগ তিনি ছেড়ে দিতে পারলেন না। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই উত্তপ্ত বাক-বিনিময় শুরু হয়ে গেলো।

মিঃ কেলাডাকে আমি এর আগেও জোর গলায় প্রচুর বকতে দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর কখনও দেখিনি। শেষ পর্যন্ত র‍্যামজের কি একটা কথায় খেপে গিয়ে উনি টেবিল চাপড়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'দেখুন, আমি যা বলছি তা জানি বলেই বলছি। জাপানী মুক্তোর ব্যবসা দেখেশুনে আসার জন্যেই আমি জাপান যাচ্ছি। আমি মুক্তোর ব্যবসায়ী আর এ ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত এমন কেউ নেই যে বলবে, মুক্তো সম্পর্কে আমার কথাটা শেষ কথা নয়। দুনিয়ার সমস্ত সেরা মুক্তোগুলোই আমার চেনা এবং মুক্তো সম্পর্কে আমি যা জানি না, তা জানার কোনো প্রয়োজনই নেই।'

এটা আমাদের কাছে একটা খবরই বটে। কারণ মিঃ কেলাডা যতোই বকুন, তিনি কি করেন তা কোনোদিনও কাউকে বলেননি। আমরা অস্পষ্টভাবে শুধু জানতাম, উনি ব্যবসার কাজে জাপান যাচ্ছেন।

'আমার মতো একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এক নজরে ধরতে পারবে না, এমন কৃত্রিম মুক্তো ওরা জন্মেও তৈরি করতে পারবে না।' বিজয়ীর ভঙ্গিতে টেবিলের চারদিকে তাকালেন মিঃ কেলাডা। তারপর মিসেস র‍্যামজের গলায় পরে থাকা হারটার দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'আমি বলে দিচ্ছি মিসেস র‍্যামজে, আপনি যে মালাটা পরে রয়েছেন তার এখন যা দাম—কোনোদিন সে দাম এক সেণ্টও কমবে না।'

মিসেস র‍্যামজে নিজস্ব শিষ্ট ভঙ্গিতে সামান্য রক্তিম হয়ে উঠে, হারটা পোশাকের নিচে গুঁজে দিলেন। র‍্যামজে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আমাদের সকলের দিকে একবার তাকালেন। এক টুকরো হাসি ঝিকমিকিয়ে উঠলো তাঁর চোখ দুটিতে।

'মিসেস র‍্যামজের হারটা ভারি সুন্দর, তাই না?'

'ওটা আমার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়েছে,' মিঃ কেলাডা জবাব দিলেন। 'দেখে নিজের মনেই বলেছি, ওগুলো সব আসল মুক্তো।'

'আমি নিজে অবিশ্যি ওটা কিনিনি, তবু ওটার দাম কতো হতে পারে বলে আপনার ধারণা—তা আমি জানতে আগ্রহী।'

'তা মুক্তো ব্যবসায়ীদের কাছে ওটার দাম পনেরো হাজার ডলারের মতো হবে। তবে ফিফথ অ্যাভিনিউ থেকে কেনা হলে, ওটার জন্যে তিরিশ হাজার অব্দি যে কোনো দাম দিতে হয়েছে শুনলেও আমি অবাক হবো না।'

র‍্যামজে বিষণ্ণ হাসলেন, 'আপনি শুনলে অবাক হবেন, নিউ ইয়র্ক থেকে আসার আগের দিন একটা বিভাগীয় বিপণি থেকে মিসেস র‍্যামজে ওই হারটা আঠারো ডলার দিয়ে কিনেছিলেন।'

'বাজে কথা,' মিঃ কেলাডা লাল হয়ে উঠলেন। 'শুধু সাচ্চা জিনিসই নয়, ওই

আকারের মুক্তোর এতো সুন্দর মালা আমি এর আগে আর কখনও দেখিনি।'

'বাজি ফেলবেন ? ওটা যে নকল জিনিস, তা নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে একশো ডলার বাজি রাখছি।'

'রাজি।'

'ওহ্ এলমার,' মিসেস র‍্যামজে বললেন, 'একটা নিশ্চিত ব্যাপার নিয়ে তুমি বাজি ফেলতে পারো না!'

মিসেস র‍্যামজের ঠোঁটে সামান্য হাসির ছোঁয়া, কণ্ঠস্বরে মৃদু ভৎসনার আভাস।

'কেন পারবো না ? সহজে টাকা রোজগারের একটা সুযোগ পাওয়া সত্বেও সে সুযোগ না নিলে, বলতে হবে আমি একটা অপদার্থ হাঁদারাম।'

'কিন্তু জিনিসটা প্রমাণ হবে কি করে ?' মিসেস র‍্যামজে ফের বললেন, 'মিঃ কেলাডার কথার পিঠে আমার কথা ছাড়া এর আর তো কোনো প্রমাণ নেই!'

'হারটা আমাকে একটু দেখতে দিন।' মিঃ কেলাডা বললেন, 'নকল হলে আমি দেখেই বলে দেবো। একশো ডলার বাজি হারার মতো ক্ষমতা আমার আছে।'

'ওটা খুলে ভদ্রলোককে দাও তো, সোনা! উনি যতোক্ষণ খুশি, ওটা দেখুন।'

মুহূর্তের জন্যে একটু ইতস্তত করলেন মিসেস র‍্যামজে। তারপর নিজের হাত দুটো উনি হারের খিলের দিকে তুলে ধরলেন।

'খুলতে পারছি না। মিঃ কেলাডাকে আমার কথাতেই বিশ্বাস করতে হবে।'

হঠাৎ আমার কেমন সন্দেহ হলো, কোনো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হয়তো ঘটতে চলেছে। কিন্তু বলার মতো কোনো কথাই আমি ভেবে পেলাম না।

র‍্যামজে এবারে লাফিয়ে উঠলেন, 'আমি খুলে দিচ্ছি।'

হারটা উনি মিঃ কেলাডার হাতে তুলে দিলেন। পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষটি পকেট থেকে একটা আতস কাচ বের করে হারটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ওঁর মসৃণ, শ্যামল মুখে এক টুকরো জয়ের হাসি ছড়িয়ে পড়লো। কিছু বলতে গিয়ে, হঠাৎ মিসেস র‍্যামজের দিকে দৃষ্টি পড়লো ওঁর। মিসেস র‍্যামজের মুখখানা এমন ফ্যাকাশে যে দেখে মনে হয় উনি এক্ষুণি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। বিস্ফারিত এবং আতঙ্কিত চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন মহিলা। চোখ দুটিতে এক নিদারুণ সনির্বন্ধ মিনতি। জিনিসটা এতো স্পষ্ট যে আমি ভেবে পেলাম না, মহিলার স্বামী কেন এটা লক্ষ্য করলেন না।

হাঁ করা মুখ নিয়েই থেমে গেলেন মিঃ কেলাডা। প্রচণ্ড লাল হয়ে উঠলেন উনি। ওঁর নিজেকে সামলে নেবার প্রচেষ্টা যেন সাদা চোখেই ধরা পড়ে যায়।

'আমি ভুল করেছিলাম,' উনি বললেন। 'এটা নকল হিসেবে খুবই সুন্দর।

কিন্তু কাচ দিয়ে পরীক্ষা করেই বুঝতে পারলাম, সাচ্চা জিনিস নয়। আমার ধারণা এটার দাম আঠারো ডলারের মতোই হবে।'

পকেট-বইখানা বের করে, মিঃ কেলাডা বিনাবাক্যে একটা একশো ডলারের নোট র‍্যামজের হাতে তুলে দিলেন।

নোটটা নিতে নিতে র‍্যামজে বললেন, 'হয়তো এ থেকে আপনার শিক্ষা হবে, সব সময় অমন সুনিশ্চিত হতে হয় না।'

লক্ষ্য করলাম মিঃ কেলাডার হাত দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

গল্পটা যথারীতি সমস্ত জাহাজে ছড়িয়ে পড়লো এবং সেদিন সন্ধ্যায় মিঃ কেলাডাকে এ জন্যে যথেষ্ট ঠাট্টা-বিদ্রূপও সহ্য করতে হলো। সবজান্তাবাবু ফাঁদে পড়েছেন, এটাই একটা চমৎকার মজার ঘটনা। তবে মিসেস র‍্যামজে মাথা ধরা নিয়ে নিজের ঘরে শুতে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে উঠে আমি দাড়ি কামাতে শুরু করেছি, মিঃ কেলাডা নিজের বিছানায় শুয়ে সিগারেট টানছেন—এমন সময় হঠাৎ একটা মৃদু আঁচড়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি, বন্ধ দরজার তলা দিয়ে একটা চিঠি ভেতরে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। দরজা খুলে বাইরের দিকে তাকালাম। কেউ কোথাও নেই। চিঠিটা তুলে নিয়ে দেখি, তাতে বড়ো হাতের অক্ষরে ম্যাক্স কেলাডা নাম লেখা। ওটা আমি ওঁর দিকে এগিয়ে দিলাম।

'কোত্থেকে এলো?' চিঠিটা খুলে মিঃ কেলাডা বললেন, 'ও!'

খামটা থেকে উনি চিঠি নয়, একটা একশো ডলারের নোট বের করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে ফের লাল হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। তারপর খামটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে সেগুলো আমাকে দিয়ে বললেন, 'এগুলো দয়া করে জানলা দিয়ে ফেলে দেবেন?'

আমি ওঁর কথামতো কাজ করলাম। তারপর স্মিতমুখে ফিরে তাকালাম। ওঁর দিকে।

'কেউ যেচে নিজেকে বুদ্ধু সাজাতে চায় না,' উনি বললেন।

'মুক্তোগুলো কি আসল ছিলো?'

'আমার যদি একটি সুন্দরী স্ত্রী থাকতো, তাহলে আমি তাকে একটা বছর নিউ ইয়র্কে ফেলে রেখে নিজে কোবেতে পড়ে থাকতাম না।'

সেই মুহূর্তে মিঃ কেলাডাকে আমার আর পুরোপুরি খারাপ লাগলো না। হাত বাড়িয়ে পকেট-বইটা তুলে নিয়ে, একশো ডলারের নোটটা উনি সযত্নে তার মধ্যে রেখে দিলেন।

ভেতরের উঠোনে ঝগড়াঝাঁটির আওয়াজ শুনে দু-তিনজন নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কান পাতলো।

'নতুন ভাড়াটে গো,' এক মহিলা বললো। 'যে কুলিটা ওর মালপত্তর বয়ে এনেছে, মাগী তার সঙ্গেই ঝগড়া করছে।'

লা মাকারেনার পেছন দিকে একটা রাস্তায় একটা উঠোনের চারপাশ ঘিরে গড়ে উঠেছে এই দোতলা ভাড়াটে বাড়িটা। এটা সেভিলের সবচাইতে অমার্জিত অঞ্চল। শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ আর ছোটোখাটো চাকুরে—যেমন ডাকহরকরা, পুলিস বা ট্রামের কনডাকটার—যাদের সংখ্যাধিক্য স্পেনে মাত্রা ছাপিয়ে গেছে—এ বাড়ির ঘরগুলো তাদেরই ভাড়া দেওয়া হয়। তাদের বাচ্চাকাচ্চায় জায়গাটা থিকথিক করে। বিশটি পরিবার বাস করে এ বাড়িতে। ওরা উঁচু গলায় বিবাদ-বিসম্বাদ করে, আবার তা মিটিয়ে নেয়। বকবক করে একে অন্যের মাথা খায়, আবার দরকার হলে একে অন্যকে সাহায্যও করে—কারণ আন্দালুজিয়ার লোকেরা ভালো মানুষ এবং মোটের ওপরে তারা পরস্পরের সঙ্গে দিব্যি মিলেমিশেই থাকে। কিছুদিন ধরে এ বাড়ির একখানা ঘর খালি পড়ে ছিলো। আজ সকালেই এক মহিলা ঘরটা ভাড়া নিয়েছে এবং এক ঘণ্টা বাদে সে নিজে যথাসাধ্য মালপত্র নিয়ে, বাকিটা কুলির ওপরে চাপিয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছে।

ঝগড়াটা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছিলো। পাছে একটি শব্দও বাদ চলে যায়, সেই আশঙ্কায় দোতলার দুই মহিলা বারান্দার আলসেতে ঝুঁকে দাঁড়ালো। নবাগতার কর্কশ কণ্ঠে চড়া সুরে বলা অনর্গল গালমন্দ আর তার মাঝে মাঝে পুরুষটির ক্ষীণ প্রতিবাদ শুনতে শুনতে ওরা একজন অন্যজনকে কনুইয়ের গুঁতো মারছিলো ক্রমাগত।

'আপনি পয়সা না মেটানো অব্দি আমি এখান থেকে নড়বো না,' কুলিটা বার-বার বলছিলো।

'কিন্তু আমি তো তোকে পয়সা মিটিয়ে দিয়েছি! তুই তিন রিয়্যালে কাজটা করে দিবি বলেছিলি।'

'কক্ষণো না! আপনি চার রিয়্যাল দেবেন বলেছিলেন।'

সামান্য দু-এক আধলা নিয়ে ওরা কচলাকচলি চালিয়ে যেতে থাকে।

'এই সামান্য কটা জিনিস বয়ে আনার জন্যে চার রিয়্যাল? তোর কি মাথা খারাপ নাকি?' মহিলা লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

'আপনি পয়সা না মেটানো অব্দি আমি যাবো না,' ফের বলে লোকটা।

'ঠিক আছে, আমি আর এক পেনি বেশি দেবো।'

'ও আমি নেবো না।'

বিবাদের মাত্রা এবং আওয়াজ ক্রমশ আরও বেড়ে ওঠে। মহিলা চিৎকার-চেঁচামেচি করে তর্জন-গর্জন তুলে কুলিটাকে শাপ-শাপান্ত করে, তার মুখের কাছে হাতের মুঠি তুলে আস্ফালন করে। শেষ পর্যন্ত লোকটা ধৈর্য হারিয়ে বলে, 'ঠিক আছে, আপনি আমাকে বাড়তি পেনিটা দিন—আমি চলে যাচ্ছি। আপনার মতো একটা নোংরা মেয়েছেলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে আমি সময় নষ্ট করতে রাজি নই।'

মহিলা পয়সা মিটিয়ে দিতেই কুলি ওর তোশকটা ধপাস করে মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে সরে পড়ে। মহিলা একটা নোংরা খিস্তি ছুঁড়ে দেয় লোকটার দিকে, তারপর নিজের মালপত্র ভেতরে টেনে নেবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ওপরের বারান্দায় দাঁড়ানো মহিলা দুজন ওর মুখটা দেখতে পায়।

'মাগো, কি কুচ্ছিত শয়তানের মতো মুখ! দেখে মনে হয় একটা খুনে!'

একটি মেয়ে সেই মুহূর্তে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে আসতেই মা তাকে ডেকে জিগেস করে, 'রোজালিয়া, তুই ওকে দেখলি?'

'কুলিটার কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম, ও কোত্থেকে আসছে। বললো, মালপত্তরগুলো সে ত্রিয়ানা থেকে বয়ে এনেছে। মহিলা এজন্যে ওকে চার রিয়্যাল দেবে বলে দেয়নি।'

'কুলিটা মাগীর নাম বলেছে তোকে?'

'নামটা সে জানে না। তবে ত্রিয়ানাতে সবাই ওকে লা কাশিড়া বলে ডাকছিলো।'

ভুল করে ফেলে রাখা একটা গাঁটরি ভেতরে নিয়ে যাবার জন্যে বদমেজাজী মেয়েমানুষটা ফের একবার বাইরে এসে, ওপরের বারান্দা থেকে কৌতূহলহীন নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় ওকে লক্ষ্য করতে থাকা মহিলা দুটির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নেয়—কিন্তু মুখে কিছু বলে না। ওকে দেখে শিউরে ওঠে রোজালিয়া।

'মাগো, ওকে দেখে আমার ভয় লাগছে!'

লা কাশিড়ার বয়স চল্লিশ, ভীষণ রোগা শুঁটকো চেহারা, হাড়সর্বস্ব হাত আর আঙুলগুলো দেখতে ঠিক শকুনের নখরের মতো। ওর গাল দুটো গর্তে ঢোকানো,

গায়ের চামড়া হলদে আর কোঁচকানো। মোটা মোটা ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে মুখ খুললে দেখা যায়, ওর দাঁতগুলো শিকারী জন্তুর মতো ছুঁচালো। মাথার চুল কালো আর কর্কশ। সেগুলোকে ও যেমন-তেমন করে এমনভাবে একটা গিঁট বেঁধে রাখে যে দেখে মনে হয় এই বুঝি কাঁধের ওপরে খসে পড়লো—দুগাছি সোজা সোজা চুল ঝুলে থাকে দুই কানের পাশে। গর্তে ঢোকানো বড়ো বড়ো কালো চোখ দুটো হিংস্রের মতো জ্বলজ্বল করে। মুখের অভিব্যক্তিতে এমন একটা হিংস্রতার ছায়া যে কেউ ওর সঙ্গে কথা বলার জন্যে কাছেপিঠেই আসতে ভরসা পায় না। শুধু নিজেকে নিয়ে নিজের মনেই থাকে ও। তবু প্রতিবেশীদের কৌতুহল জাগে। সবাই জানে ও ভীষণ গরিব, কারণ ওর পোশাক-আশাকের বড়োই জীর্ণ দশা। প্রতিদিন ও ভোর ছটায় বেরিয়ে যায়, ফিরতে ফিরতে সেই রাত। কিন্তু কি ওর জীবিকা, তা কেউই জানে না। এ বাড়ির যে লোকটা পুলিসে কাজ করে, সবাই তাকে এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে উস্কে দেয়। কিন্তু লোকটা বলে, 'যতোক্ষণ ও শান্তি ভঙ্গ না করছে, ততোক্ষণ ওর ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই।'

কিন্তু সেভিলে কেচ্ছা কাহিনী খুব দ্রুত ছড়ায়। ওপরতলার একখানা ঘরে যে রাজমিস্ত্রিটি থাকে, কয়েক দিনের মধ্যেই সে খবর আনে, তার ত্রিয়ানার এক বন্ধু ওই মহিলার কথা সব জানে। মাত্র এক মাস আগে ও কয়েদখানা থেকে বেরিয়েছে—খুনের অপরাধে সেখানে ও সাত বচ্ছর ছিলো। ত্রিয়ানায় একটা ভাড়া বাড়িতে ও থাকতো। কিন্তু ঘটনাটা জানতে পেরে সেখানকার ছেলেপিলেরা ওকে ঢিল ছুঁড়তো, কুকথা বলতো। আর ও তাদের খিস্তিখাস্তা দিয়ে মারধোর করে সমস্ত অঞ্চলটাতে এমন একটা ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার সৃষ্টি করতো যে বাড়িওলা শেষ অব্দি ওকে ঘর ছেড়ে দিতে বলে। বাড়িওলা এবং যারা ওকে তাড়ালো তাদের সকলকে শাপান্ত করতে করতে লা কাশিড়া একদিন সকাল বেলায় হঠাৎ সেখান থেকে উধাও হয়ে যায়।

'ও কাকে খুন করেছিলো?' জিগেস করে রোজালিয়া।

'সবাই বলে সে ওর নাগর ছিলো,' রাজমিস্ত্রি জবাব দেয়।

'তেমন কেউ ওর থাকতেই পারে না!' রোজালিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসে।

'হায় সান্তা মারিয়া!' রোজালিয়ার মা পাইলার, ককিয়ে ওঠে। 'আশা করি ও আমাদের কাউকে মেরেটেরে ফেলবে না! আমি আগেই বলেছিলুম, ওকে দেখতে খুনের মতো!'

রোজালিয়া শিউরে উঠে নিজের শরীরে ক্রুশ চিহ্ন আঁকে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে লা কাশিড়া দিনের কাজ সেরে বাড়িতে ফিরে আসায় আলোচনাকারীদের ওপরে

একটা আকস্মিক চাপ নেমে আসে। যেন একত্রে গাদাগাদি হয়ে থাকার জন্যেই ওরা পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করতে শুরু করে, বিচলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লা কাশিড়ার বিস্ফারিত চোখের দিকে। ওদের নিস্তব্ধতায় যেন কোনো অশুভ ইঙ্গিতের আঁচ পেয়ে মহিলা দ্রুত সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে এক ঝলক তাকিয়ে নেয় সকলের দিকে। পুলিসের লোকটা একটু কথাবার্তা চালানোর প্রচেষ্টায় ওকে শুভসন্ধ্যা জানায়।

'বুয়েনা সেরা,' ভুরু কুঁচকে একটা সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে মহিলা দ্রুত নিজের ঘরে ঢুকে সশব্দে বন্ধ করে দেয় দরজাটা।

সকলে ওর দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ শুনতে পায়। মহিলার শয়তানি চোখ দুটো ওদের ওপরে একরাশ বিষাদ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। ওরা ফিসফিসিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকে—যেন একটা অমঙ্গলের বাতাবরণের নিচে রয়েছে সকলে।

'ওর মধ্যে শয়তান আছে,' রোজালিয়া বলে।

রোজালিয়ার মা পুলিসের লোকটাকে বলে, 'ম্যানুয়েল, ভাগ্যিস আমাদের রক্ষা করার জন্যে তুমি এখানে রয়েছো!'

কিন্তু অশান্তি করার মতো অবস্থা যেন লা কাশিড়ার নেই। একটুও না বেঁকে, কারুর সঙ্গে একটিও কথা না বলে ও নিজের পথে যাতায়াত করে—অন্তরঙ্গতা গড়ে তোলার প্রতিটি প্রয়াসই ও ছিন্ন করে দেয় অতি দ্রুত এবং অসামাজিক রূঢ়তায়। ও বুঝতে পারে, প্রতিবেশীরা ওর গোপন রহস্যের কথা আবিষ্কার করে ফেলেছে, জেনে ফেলেছে ওর মানুষ খুন এবং দীর্ঘ কয়েক বছর কারাবাসের ইতিহাস। ফলে ওর মুখের রেখাগুলো আরও কঠোর হয়ে উঠেছে, কোটরগত চোখের অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছে আরও অমানুষিক। কিন্তু প্রতিবেশীদের মধ্যে ও যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিলো এখন আস্তে আস্তে তা দূর হয়ে গেছে। এমন কি বাক্যবাগীশ পাইলারও উঠোন জুড়ে বসে থাকা দলটা ভেতর দিয়ে মাঝে-মধ্যে যাতায়াত করা ওর নিশ্চুপ শুকনো চেহারাটার দিকে আর তেমন করে তাকিয়ে দেখে না।

'কয়েদখানায় থেকে ওর মাথাটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। সবাই বলে অমন নাকি হামেশাই হয়।'

কিন্তু একদিন একটা ঘটনা ওদের খোশ গল্পটাকে ফের নতুন করে জাগিয়ে তোলে। সেদিন লোহার সদর দরজাটার কাছে এসে একটি যুবক আন্তনিয়া সানচেজের খোঁজখবর করছিলো। পাইলার তখন বারান্দায় বসে একটা স্কার্ট রিফু করছে। মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে ও দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো, 'ও নামে এখানে কেউ থাকে না।'

'হ্যাঁ, থাকে।' একটু থেমে যুবক বললো, 'সবাই ওঁকে লা কাশিড়া বলে।'

'ও!' দরজা খুলে রোজালিয়া ওর ঘরের দরজাটার দিকে আঙুল তুলে দেখালো, 'ওখানে আছে।'

'ধন্যবাদ।'

রোজালিয়াকে একটুকরো স্মিত হাসি উপহার দিলো যুবক। রোজালিয়া মিষ্টি মেয়ে। ওর গায়ের রঙ খুব ফর্সা, আয়ত চোখ দুটি ভারি সুন্দর। একটা লাল কার্নেশন ফুল আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে ওর কুচকুচে কালো চুলগুলোকে। স্তন দুটি পরিপূর্ণ পুরুষ্টু, ব্লাউজের তলা থেকেও প্রকট হয়ে উঠেছে ওর স্তনবৃন্ত দুটি।

'ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হয়েছেন তোমার মা, যিনি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন,' একটা চাষাড়ে তোষামুদি ভাষা ব্যবহার করলো যুবক।

'তুমি যাও তোমার ঈশ্বরের কাছে,' বললো পাইলার।

যুবক এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিলো। মহিলা দুজন কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

'কে হতে পারে?' পাইলার বললো, 'লা কাশিড়ার কাছে এর আগে তো কোনোদিনও কেউ আসেনি!'

কোনো জবাব না পেয়ে ফের দরজায় টোকা দিলো যুবক। রোজালিয়ারা লা কাশিড়ার থরথরে গলা শুনতে পেলো—জানতে চাইছে, কে ওখানে।

'মা, আমি!' যুবক চিৎকার করে বললো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা চিৎকার। সপাটে খুলে গেলো দরজাটা।

'কুরিতো!'

মহিলা দু হাতে যুবকের গলা জড়িয়ে ধরলো, চুমু খেলো নিবিড় আবেগে, দু হাতে ওর মুখে সোহাগের চাটি মারতে মারতে আদর করতে লাগলো প্রাণ ভরে। ওর মধ্যে যে এতোখানি কোমলতা আছে তা রোজালিয়ারা—মা ও মেয়ে—ভাবতেও পারেনি কোনোদিন। শেষ অব্দি আনন্দে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ও ছেলেকে টেনে ঘরে নিয়ে গেলো।

'ওর ছেলে!' রোজালিয়া অবাক। 'কে এমন ভেবেছে, বলো! তা আবার এতো সুন্দর দেখতে!'

কুরিতোর মুখখানা কৃশ, দাঁতগুলো সাদা আর সমান মাপের, মাথার চুল একেবারে ছোটো করে ছাঁটা, রগের কাছ থেকে কামানো। একেবারে নিখুঁত আন্দালুজিয়দের ছাঁচ। মুখের বাদামি চামড়ায় ওর অকালে-গজানো দাড়ির নীল ছায়া। বেশভূষায় অবশ্যই পরিপাটি ফুলবাবু। পরনের পাতলুনটা গায়ের চামড়ার সঙ্গে আঁট-সাঁট, গায়ের ছোটো ঝুলের কোট আর ফ্রিল লাগানো জামাটা আনকোরা নতুন।

মাথায় চওড়া কানার টুপি।

অবশেষে ঘরের দরজা খুললো, ছেলের হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতে বেরিয়ে এলো লা কাশিড়া।

'তা হলে আসছে রোববার ফের আসবি তো?' জিগেস করলো ও।

'যদি কোনো কিছুতে আটকে না যাই।'

রোজালিয়ার দিকে এক ঝলক তাকালো কুরিতো। তারপর মাকে বিদায় জানিয়ে, ওর দিকেও ঘাড় নাড়লো একবার। রোজালিয়া তাকে এক চিলতে হাসি আর কালো চোখ দুটির একটি ঝিলিক উপহার দিলো। কিন্তু দৃষ্টিটা ব্যাহত করলো লা কাশিড়া এবং এক প্রবল আনন্দ ওর যে বিষাদকে দূর করে দিয়েছিলো, তা ফের বজ্রগর্ভ মেঘের মতো আচমকা অন্ধকার করে তুললো ওর শুকনো মুখখানাকে। হিংস্র বিদ্বেষে মিষ্টি মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালো লা কাশিড়া।

'ওটা তোমার ছেলে?' যুবক চলে যাবার পর জিগেস করলো পাইলার।

'হ্যাঁ, আমার ছেলে,' নিজের ঘরে যেতে যেতে সংক্ষেপে জবাব দিলো লা কাশিড়া।

কিছুই ওকে নরম করতে পারে না—এমন কি সুখে যখন ওর হৃদয় উপছে উঠছে তখনও বন্ধুত্বের আহ্বানকে ও অবহেলায় ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়।

'লোকটা বেশ সুন্দর দেখতে,' রোজালিয়া বলে এবং পরবর্তী কয়েকটা দিন একাধিক বারই যুবকটির কথা চিন্তা করে ও।

কিন্তু ছেলের প্রতি লা কাশিড়ার মনে এক ভয়ঙ্কর ভালোবাসা। পৃথিবীতে ছেলে ছাড়া ওর আর কেউ নেই কিছু নেই। যে তীব্র-হিংস্র-ঈর্ষাকাতর আবেগ নিয়ে ও ছেলেকে ভালোবাসে, তা প্রতিদানে দাবী করে এক অন্ধ-একান্ত-অসম্ভব-অনুরক্তির। ছেলের কাছে ও শুধুমাত্র এক এবং অদ্বিতীয় হয়েই থাকতে চায়। ছেলের চাকরির জন্যে ওরা একসঙ্গে থাকতে পারে না। কিন্তু দূরে থাকার সময় ছেলে কি করছে, সেই চিন্তা ওকে কুরে কুরে খায়। কুরিতো কোনো মেয়ের দিকে তাকাবে, তা ও সহ্য করতে পারে না—সে কাউকে বিয়ে করতে চাইতে পারে, এমনি সামান্য চিন্তাতেই ও একেবারে সিঁটিয়ে ওঠে। মাঝরাত অব্দি প্রেমিকা জানলার গরাদের ওধারে বসে থাকবে কিংবা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে আর তার প্রেমিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে দয়িতার ইচ্ছুক কর্ণকুহরে সুদীর্ঘ প্রেমময় তোষামোদ বাণী বর্ষণ করবে—এটা সেভিলের সবচাইতে সাধারণ এবং বাঞ্ছিত বিনোদন। কুরিতোর মতো সুদর্শন যুবক যে মেয়েদের মুচকি হাসি উপভোগ করবেই, এ বিষয়ে লা কাশিড়া সম্পূর্ণ সচেতন। তাই ও যখন জিগেস করে, তার কোনো প্রেমিকা আছে কিনা

এবং কুরিতো যখন শপথ করে বলে যে সন্ধে বেলাটা সে কর্মস্থলেই কাটায়, তখন ও বুঝতে পারে ছেলে মিথ্যে কথা বলছে। তবু কুরিতো কথাটা অস্বীকার করায় ও মনে মনে এক অদ্ভুত হিংস্র আনন্দ অনুভব করে।

রোজালিয়ার প্ররোচক চাহনি আর কুরিতোর জবাবী হাসিটুকু লক্ষ্য করে লা কাশিড়ার গলা অব্দি রাগ উঠে এসেছিলো। প্রতিবেশীদের ও আগেও ঘৃণা করতো—কারণ তারা ওর ভয়ঙ্কর গোপন কথাটা জানে, কারণ তারা সুখী আর ও চরম দুর্দশা-গ্রস্ত। কিন্তু এখন ও তাদের আরও বেশি করে ঘৃণা করে—কারণ আধ-পাগলার মতো ইতিমধ্যেই ও কল্পনা করতে শুরু করেছিলো, প্রতিবেশীরা ওর কাছ থেকে ওর ছেলেকে লুটে নেবার ষড়যন্ত্র করছে। পরের রোববার বিকেল বেলায় লা কাশিড়া তাই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে, বারান্দা পেরিয়ে, সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। পুরো ব্যাপারটা এতোই অস্বাভাবিক যে প্রতিবেশীরাও এই নিয়ে মন্তব্য চালাচালি করতে শুরু করলো।

'ও কেন ওখানে গেছে জানো না?' রোজালিয়া একটু আড়ষ্ট হাসলো, 'ওর অতো দামী খোকনমণিটি আসছে যে! ও চায় না, আমরা তাকে দেখি।'

কুরিতো এসে পৌঁছুতেই তার মা তাকে তাড়াতাড়ি ঘরে নিয়ে গেলো।

'ছেলেকে নিয়ে মাগীর এতো সন্দেহ, যেন ছেলেটাই ওর নাগর।' পাইলার বললো।

বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে ফের হাসলো রোজালিয়া, দুষ্টুমিতে ভরে উঠলো ওর উজ্জ্বল চোখ দুটি। ওর মনে হলো, কুরিতোর সঙ্গে দু-একটা কথা বললে খুব মজা হবে। তাতে লা কাশিড়া কেমন রেগে উঠবে তা ভাবতেই ঝিকমিকিয়ে উঠলো ওর সাদা দাঁতগুলো। সদরের কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো ও, যাতে মা আর ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে ওকে এড়িয়ে যেতে না পারে। কিন্তু মেয়েটাকে ওখানে দেখে লা কাশিড়া ছেলের অন্য ধারে চলে এলো, যাতে ওদের মধ্যে একবার দৃষ্টি-বিনিময়ও না হয়। বিরক্তিতে দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো রোজালিয়া। মনে মনে ভাবলো, 'তুমি এতো সহজে আমাকে হারাতে পারবে না।'

পরের রোববার লা কাশিড়া সদরে গিয়ে দাঁড়াতেই রোজালিয়া সোজা রাস্তায় বেরিয়ে আসে। তারপর যেদিক থেকে কুরিতো আসবে বলে ওর মনে হয়, সেদিক ধরেই এগুতে থাকে পায়ে পায়ে। এক মিনিটের মধ্যেই কুরিতোকে দেখতে পায় ও, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হেঁটেই চলে সামনের দিকে।

'এই!' কুরিতো থমকে দাঁড়ায়।

'একি তুমি? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাও।'

'আমি কিছুকেই ভয় পাই না,' গর্বিত ভঙ্গিতে জবাব দেয় কুরিতো।

'শুধু মামণিকে ছাড়া!'

রোজালিয়া এগিয়েই চলে—যেন ও চায়, কুরিতো ওর সঙ্গ ছেড়ে চলে যাক। কিন্তু ও ভালোমতোই জানে, কুরিতো তেমন কিছু করবে না।

'যাচ্ছো কোথায়?' জিগেস করে কুরিতো।

'তা জেনে তোমার কি হবে, কুরিতো? তুমি তোমার মামণির কাছে যাও, বাছা—নয়তো মামণি তোমাকে মারবে! মা সঙ্গে থাকলে তুমি তো আমার দিকে তাকাতেও ভয় পাও!'

'কি বাজে বকছো!'

'ঠিক আছে, তুমি যাও। আমার কাজ আছে।'

কুরিতো অপ্রতিভ হয়ে চলে যায়, রোজালিয়া নিজের মনে হাসে। লা কাশিড়ার সঙ্গে কুরিতো যখন বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে, তখন ফের রোজালিয়ার সঙ্গে উঠোনে দেখা। এবারে লজ্জা সরিয়ে সাহস এনে কুরিতো থমকে দাঁড়ায়, শুভরাত্রি জানায় ওকে। রাগে লাল হয়ে ওঠে লা কাশিড়া। খরখরে গলায় চড়া সুরে বলে, 'চলে আয়, কুরিতো। ওখানে দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?'

কুরিতো চলে যায়। মহিলা মুহূর্তের জন্যে রোজালিয়ার মুখোমুখি থমকে দাঁড়ায়, যেন কিছু বলবে। কিন্তু তারপর সুস্পষ্ট প্রয়াসে নিজেকে সামলে নিয়ে ফিরে যায় নিজের অন্ধকার নিস্তব্ধ ঘরখানাতে।

এর কয়েক দিন পরেই সেভিলের নগর দেবতা সান ইসিডোরোর পরব। ছুটির উৎসবটা পালনের জন্যে রাজমিস্ত্রিটি এবং আরও দু-একজন মিলে উঠোনে দড়ি টাঙিয়ে চীনা লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিয়েছে। নির্মেঘ গ্রীষ্মের রাতে সবাই আনন্দে মশগুল। ঝলমলে নক্ষত্রের পটভূমিকায় আকাশটা ভারি শান্ত আর কোমল। বাড়ির সকলে উঠোনের মাঝখানে জড়ো হয়ে কুর্সিতে বসেছে। মেয়েরা—ওদের কারুর কারুর বুকে কচি বাচ্চা—ছোটো ছোটো কাগজের পাখা দুলিয়ে হাওয়া করছে নিজেদের আর মাঝেমাঝে অন্তহীন কলকলানি বন্ধ রেখে দু-একটা বকুনি ছুঁড়ে দিচ্ছে শয়তানি করতে থাকা একটু বড়োসড়ো বাচ্চাগুলোর দিকে। যারা ষাঁড়ের লড়াই দেখতে গিয়েছিলো তারা তাদের চাইতে কম ভাগ্যবানদের বিশদ গল্প শোনাচ্ছে। বিখ্যাত ম্যাটাডোর বেলমন্তির আশ্চর্য খেলাটা নিখুঁতভাবে বর্ণনা করছে তারা। তাদের প্রাণবন্ত কল্পনায়, প্রতি মুহূর্তে বেড়ে ওঠা রঙে ও ঢঙে মনে হচ্ছিলো সেভিলের ইতিহাসে এর চাইতে অপূর্ব খেলা আর কোনোদিনও হয়নি। সবাই ওখানে উপস্থিত, শুধু লা কাশিড়া বাদে। ওর ঘরে একটা নিঃসঙ্গ মোমবাতির আলো

দেখতে পাচ্ছিলো সকলে।

'ওর ছেলেটা কোথায় ?'

'সেও ওখানেই আছে,' পাইলার জবাব দেয়। 'এক ঘণ্টা আগে আমি তাকে এখান দিয়ে যেতে দেখেছি।'

'সে নিশ্চয়ই নিজেকে নিয়ে মজা পাচ্ছে,' রোজালিয়া হাসে।

'থাক, লা কাশিড়াকে নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না।' আর একজন বলে, 'তুমি আমাদের একখানা নাচ দেখাও, রোজালিয়া।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। 'নাচো তো দেখি বালা, নাচো তো দেখি!'

স্পেনের লোকেরা সকলেই নাচতে আর নাচ দেখতে ভালোবাসে। এখানে বহু বছর আগে থেকেই একটা প্রবচন আছে, স্পেনে এমন কোনো নারী জন্মায়নি যে কখনও নাচবে না।

কুর্সিগুলো দ্রুত বৃত্তাকারে সাজিয়ে ফেলা হলো। ম্যাসন আর ট্রাম কনডাকটারটি নিয়ে এলো তাদের গিটার। আর রোজালিয়া নিজের হাতে ওর কাঠের ছোট্ট তাল-বাদ্য দুটি তুলে নিয়ে নাচতে শুরু করলো অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে।

ওদিকে গুমোট ঘরে বসে নাচের বাজনা শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো কুরিতো।

'ওরা নাচছে,' একটা শিহরণ নেমে গেলো তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে। পর্দার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে চীনা লণ্ঠনের নরম আলোয় ঘেরা ছোট্ট দলটাকে দেখতে পেলো সে; দেখলো নৃত্যপরা মেয়ে দুটিকে। রোজালিয়ার পরনে ওর রোববারের পোশাক এবং রীতি অনুযায়ী প্রচণ্ড পাউডার মেখেছে ও। অপূর্ব একটা কার্নেশন ঝলমল করছে ওর মাথার চুলে। কুরিতোর হৃৎপিণ্ডটা দ্রুতলয়ে ঘা দিতে লাগলো। স্পেনে প্রেম বড়ো দ্রুত গড়ে ওঠে। কুরিতো প্রথম যেদিন রোজালিয়ার সঙ্গে কথা বলেছিলো, সেদিন থেকে সে প্রায়ই ওই সুন্দরী মেয়েটির কথা ভাবে।

দরজার দিকে এগিয়ে গেলো কুরিতো।

'কি করছিস ?' লা কাশিড়া জিগেস করলো।

'ওদের নাচ দেখতে যাচ্ছি। আমি একটু আনন্দ করি তুমি তা কক্ষণো চাও না।'

'আসলে তুই রোজালিয়াকে দেখতে চাইছিস।'

লা কাশিড়া ছেলেকে থামাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কুরিতো ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নাচ দেখতে থাকা দর্শকদের দলটার সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলো। লা কাশিড়া দু-এক পা তাকে অনুসরণ করে অন্ধকারে আধো-ঢাকা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, উন্মাদ

ক্রোধ তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা দিতে লাগলো ওর বুকের কাছটাতে।

রোজালিয়া দেখতে পেয়েছিলো কুরিতোকে। তার পাশ দিয়ে নাচতে নাচতে যাবার সময় ও ফিসফিসিয়ে বললো, 'আমার দিকে তাকাতে ভয় করে না তোমার ?'

নাচের ছন্দ রোজালিয়ার মনটাকে হালকা করে দিয়েছিলো, লা কাশিড়াকে আর একটুও ভয় করছিলো না ওর। নাচের শেষে ওর সঙ্গিনী যখন কুর্সিতে শরীর ডুবিয়ে বসলো, ও এগিয়ে গিয়ে কুরিতোর মুখোমুখি দাঁড়ালো সটান ভঙ্গিমায়—মাথা পেছনের দিকে হেলানো, বুক দুটো দ্রুতলয়ে ওঠানামা করছে নিঃশ্বাসের তালে তালে।

'তুমি নিশ্চয়ই নাচতে জানো না,' বললো রোজালিয়া।

'হ্যাঁ, জানি।'

'বেশ তো, এসো তা হলে।'

রোজালিয়া উত্তেজক ভঙ্গিতে মৃদু হাসলো, কিন্তু কুরিতো তবু ইতস্তত করতে লাগলো। ঘাড় ফিরিয়ে মায়ের দিকে তাকালো সে। অন্ধকারের আড়ালে থাকা মাকে সে ঠিক দেখতে পেলো না, বরং কল্পনা করে নিলো। তার তাকানোটা ধরে ফেলে অর্থটুকু বুঝে ফেললো রোজালিয়া।

'ভয় পাচ্ছো ?'

'কিসের ভয় ?' দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে বৃত্তাকার জায়গাটাতে গিয়ে দাঁড়ালো কুরিতো। গিটার-বাদকরা এলোপাথারি সুরের ঝড় তুললো, দর্শকরা তালি দিতে লাগলো তার তালে তালে—তারই মাঝে মাঝে যতির সময়টুকুতে সকলের সমস্বরে 'ওলে' বলে চিৎকার। একটি মেয়ে ছোট্ট একজোড়া কাঠের তালবাদ্য কুরিতোর হাতে তুলে দিলো—নাচতে শুরু করলো ওরা দুজনে।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে সাপের হিসহিসানির মতো সামান্য একটা শব্দ শুনতে পেলো ওরা। রোজালিয়া এখন সম্পূর্ণ বেপরোয়া। হাসতে হাসতেই ও অন্ধকারে ফুটে থাকা বীভৎস ফ্যাকাশে মুখটার দিকে তাকিয়ে নিলো একবার। লা কাশিড়া একটুও নড়লো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ও লক্ষ্য করলো নাচের অঙ্গভঙ্গিমা, শরীরের দোলায়িত ছন্দ আর পদবিন্যাসের নিপুণ জটিলতা। দেখলো লীলায়িত ভঙ্গিমায় রোজালিয়ার পেছন দিকে হেলে পড়া আর ওকে জড়িয়ে রাখার সময় কুরিতোর মুখের আশ্চর্য হাসি। লা কাশিড়ার চোখ দুটো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো জ্বলছিলো তখন—ওর মনে হচ্ছিলো কোটরের ভেতরে যেন পুড়ে যাচ্ছে চোখ দুটো। কিন্তু কেউ ওকে লক্ষ্য করেনি। রাগে একটা যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ তুললো ও।

নাচ শেষ হলো। সকলের প্রশংসায় খুশিয়াল রোজালিয়া হাসিমুখে কুরিতোকে বললো, ও জানতো না কুরিতো এতো ভালো নাচতে পারে। ওদিকে লা কাশিড়া

ঝড়ের মতো নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলো। কুরিতো এসে যখন দরজা খোলার জন্যে মিনতি করতে লাগলো, তখন ও কোনো জবাবও দিলো না।

'ঠিক আছে, আমি তাহলে বাড়ি চলে যাচ্ছি,' বললো কুরিতো।

অসহ্য যন্ত্রণায় লা কাশিড়ার বুকের মধ্যে যেন রক্ত ঝরতে থাকে, তবু ও *কিছু* বলে না। কুরিতো ওর যথাসর্বস্ব, পৃথিবীর মধ্যে ওর একমাত্র ভালোবাসার ধন। তবু এখন ও তাকে ঘৃণা করে। সেদিন সারাটা রাত ও ঘুমোতে পারে না। শুয়ে শুয়ে আধ-পাগলের মতো ভাবে, ওরা ওর ছেলেকে ওর কাছ থেকে লুট করে নিচ্ছে। সকালবেলা কাজে না গিয়ে রোজালিয়ার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে লা কাশিড়া। অবশেষে ঘর থেকে বেরোয় মেয়েটা এবং আচমকা লা কাশিড়াকে মুখোমুখি দেখে একেবারে চমকে ওঠে।

'আমার ছেলেকে নিয়ে কি মতলব তোর?'

'তার মানে?' মুখে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে রোজালিয়া।

লা কাশিড়া আবেগে কেঁপে কেঁপে ওঠে, নিজের হাতে কামড় বসিয়ে শান্ত করে রাখে নিজেকে।

'আমি কি বলছি তার মানে তুই ভালো করেই জানিস। তাকে তুই আমার কাছ থেকে চুরি করে নিচ্ছিস!'

'তোমার কি ধারণা আমি তোমার ছেলেকে চাই? বেশ তো, নিজের ছেলেকে তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখো! আমি যেখানেই যাবো সে যদি আমার পেছন পেছন সেখানে ছোটে, তাহলে আমার কিছু করার নেই।'

'মিথ্যে কথা!'

'ওকেই বরং জিগেস করে দেখো!' রোজালিয়ার কণ্ঠস্বরে এখন এতোই অবজ্ঞার সুর যে লা কাশিড়ার পক্ষে নিজেকে সামলে রাখা কঠিন হয়ে ওঠে। 'আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে সে এক ঘণ্টা ধরে রাস্তায় অপেক্ষা করে থাকে। নিজের কাছে তাকে সামলে রাখলেই পারো।'

'তুই মিথ্যেবাদী, তুই মিথ্যুক! তুই ইচ্ছে করে তার পথে থাকিস।'

'নাগর জোটাবার ইচ্ছে থাকলে আমার বলে কয়ে জোটাবার দরকার হতো না। একটা খুনীর ছেলেকে আমি নাগর করতে চাই না।'

লা কাশিড়ার কাছে এবারে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যায়—মাথায় রক্ত চড়ে, অন্ধ হয়ে যায় দু চোখের দৃষ্টি। রোজালিয়ার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটার চুল ছিঁড়তে থাকে ও। মেয়েটা একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার তুলে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তক্ষুণি একজন পথচারী এসে জোর করে ছাড়িয়ে দেয় দুজনকে।

'কুরিতোকে ছেড়ে না দিলে আমি তোকে খুন করে ফেলবো!' লা কাশিড়া চিৎকার করে ওঠে।

'তুমি কি ভেবেছো আমি তোমাকে ভয় পাই? পারলে তাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখো—দেখবো। বোকা, বুঝতে পারো না সে নিজের চোখের চাইতেও আমাকে বেশি ভালোবাসে?'

'ওর কথার জবাব দিও না, রোজালিয়া।' লোকটা বলে, 'এখন তুমি যাও এখান থেকে।'

শিকার করতে গিয়ে বাধা পাওয়া বুনো জন্তুর মতো একটা ক্রুদ্ধ গর্জন তুলে লা কাশিড়া হনহন করে এগিয়ে যায় রাস্তা ধরে।

কিন্তু সেই নাচের পর থেকে কুরিতো রোজালিয়ার প্রেমে পাগল। পরের দিন সারাটা সময় সে শুধু ওর রক্তিম ঠোঁট দুখানির কথা চিন্তা করেছে। ওর চোখের রোশনি তার হৃদয়কে আলোকিত করেছে, তার সমস্ত অস্তিত্বকে এক নিবিড় পুলকে ভরিয়ে তুলেছে। সমস্ত দেহ-মন দিয়ে সে এখন কামনা করে রোজালিয়াকে।

রাত নামতেই মাকারেনার দিকে এগুতে শুরু করলো কুরিতো এবং প্রায় পর-ক্ষণেই রোজালিয়াদের বাড়ির দরজায় আবিষ্কার করলো নিজেকে। রোজালিয়াকে উঠোনে না দেখা অব্দি অন্ধকারেই গা ঢেকে রইলো সে। উঠোনের অন্য প্রান্তে তখন তার মায়ের ঘরে নিঃসঙ্গ আলোটা জ্বলছে।

'রোজালিয়া,' নিচু গলায় ডাকলো কুরিতো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের অস্ফুট চিৎকারটাকে সামলে নিলো রোজালিয়া। তারপর কুরিতোর দিকে এগুতে এগুতে ফিসফিসিয়ে জিগেস করলো, 'তুমি আজ এখানে?'

'তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারছি না বলে।'

'কেন?' মৃদু হাসলো রোজালিয়া।

'কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'তুমি জানো, তোমার মা আজ সকালে আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিলো?'

তারপর আন্দালুজিয়দের মেজাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় অলঙ্কারে সাজিয়ে গুছিয়ে কুরিতোকে ঘটনাটা শোনালো রোজালিয়া—অবশ্যই ওর শেষ বিদ্রূপটুকু বাদ দিয়ে, যা লা কাশিড়ার ক্রোধকে ধৈর্যের অতীত সীমায় নিয়ে গিয়েছিলো।

'মার মেজাজটা শয়তানের মতো,' কুরিতো বললো। তারপর বাহাদুরি দেখিয়ে বললো, 'আমি মাকে বলে দেবো যে আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'মা শুনে খুশি হবে,' রোজালিয়া বিদ্রূপের স্বরে বললো।

'আসছে কাল তুমি সদর দরজায় আসবে?'

'দেখি।'

কুরিতো চাপা গলায় হাসলো। কারণ রোজালিয়ার গলার স্বরেই সে বুঝতে পেরেছিলো, ও আসবে। সেদিন সিয়েরপেস ধরে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী চালে পা ফেলে ফেলে বাড়ি ফিরলো কুরিতো। পরের দিন সে আবার যখন এলো, তখন রোজালিয়া অপেক্ষা করছিলো তার জন্যে। লোহার দরজাটাকে মাঝখানে রেখে সেভিলের রীতি অনুযায়ী ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করলো—অথচ কুরিতোর তখন একবারও মনে হয়নি, এগুলো স্রেফ অর্থহীন প্রলাপ। রোজালিয়া তাকে ভালোবাসে কি না জিগেস করায় রোজালিয়া ছোট্ট একটা প্রেমময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার প্রশ্নের জবাব দিলো। ওরা একে অন্যের চোখের মধ্যে উষ্ণ হয়ে জ্বলতে থাকা বাসনার আগুনকে দেখতে চেষ্টা করছিলো তখন।

তারপর থেকে কুরিতো রোজ রাতেই আসতো। কিন্তু মা এ ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে ভেবে ভয়ে সে পরের রোববার আর লা কাশিড়ার সঙ্গে দেখা করতে যায়নি। প্রচণ্ড মর্মযন্ত্রণা নিয়ে ছেলের জন্যে সেদিনও অপেক্ষা করছিলো লা কাশিড়া। এমন কি ছেলের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতেও প্রস্তুত ছিলো ও। কিন্তু সে না আসায় ঘৃণায় ওর মন ভরে গেলো, পায়ের কাছে ছেলের মৃতদেহ দেখতে ইচ্ছে হলো ওর। কিন্তু ছেলেকে দেখার আশা করতে গেলেও যে ফের একটা সপ্তাহ কাটাতে হবে, তাই ভেবে ওর মন দমে গেলো।

সপ্তাহটা কেটে গেলো, তবু কুরিতো এলো না। লা কাশিড়া আর সহ্য করতে পারে না। কি জ্বালা, কি অশান্তি! ও কুরিতোকে যেমনটি ভালোবাসে, কোনো প্রেমিকা কোনোদিনও তাকে তেমন করে ভালোবাসতে পারবে না। নিজেকে ও বলে, এ সমস্ত রোজালিয়ার কাজ। রোজালিয়ার কথা মনে হতেই ওর বুকটা রাগে ভরে ওঠে।

অবশেষে একদিন কুরিতো সাহস সঞ্চয় করে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলো। কিন্তু লা কাশিড়া বহুকাল অপেক্ষা করেছে—ওর মনে হলো, ওর ভালোবাসা মরে গেছে। কুরিতো চুমু দিতে চাইতেই ও ঠেলে সরিয়ে দিলো তাকে।

'আগে আসিসনি কেন?'

'তুমি আমার মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে রেখেছিলে। ভেবেছিলাম তুমি আমাকে চাও না।'

'শুধু কি তাই? আর কোনো কারণ ছিলো না?'

'আমি ব্যস্ত ছিলাম,' কাঁধ ঝাঁকালো কুরিতো।

'ব্যস্ত? তোর মতো একটা অলস ইতর—কি করছিলি তুই? রোজালিয়ার সঙ্গে

দেখা করার জন্যে আসতে হলে আর অতো ব্যস্ত থাকতি না।'

'তুমি ওকে মেরেছিলে কেন ?'

'তুই কি করে জানলি যে আমি ওকে মেরেছি ? তুই ওর সঙ্গে দেখা করেছিলি ?' লা কাশিড়া লম্বা লম্বা পা ফেলে ছেলের দিকে এগিয়ে যায়, ঝলসে ওঠে ওর চোখ দুটো। 'ও আমাকে খুনী বলেছিলো।'

'তাতে কি হয়েছে ?'

'তাতে কি হয়েছে ?' লা কাশিড়ার চিৎকার উঠোন থেকে সবাই শুনতে পেলো। 'আমি যদি খুনী হয়ে থাকি, তো তোর জন্যেই হয়েছি। হ্যাঁ, আমি পেপে স্যান্তিকে খুন করেছিলাম—কিন্তু করেছিলাম সে তোকে মেরেছিলো বলে। তোর জন্যেই আমি সাত বছর কয়েদখানায় পড়ে থেকেছি—সাতটা বছর ! হায় রে বোকা, তুই মনে করিস ও তোকে ভালোবাসে অথচ ও প্রতিদিন রাত্রিবেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে।'

'জানি,' মৃদু হেসে জবাব দেয় কুরিতো।

প্রচণ্ডভাবে চমকে ওঠে লা কাশিড়া। বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার ছেলের দিকে তাকিয়েই সব কিছু বুঝতে পারে ও। রাগে দুঃখে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে—প্রাণপণে চেপে ধরে নিজের বুকের কাছটা, যেন এ নিদারুণ যন্ত্রণা ও আর সইতে পারছে না।

'তুই প্রতিদিন রাতে দরজার কাছে এসেছিস অথচ আমার কাছে একবারও আসিসনি ? ওঃ, কি নিষ্ঠুর ! আর আমি দুনিয়ায় সমস্ত কিছু করেছি তোর জন্যে। তুই কি মনে করিস আমি পেপে স্যান্তিকে ভালোবাসতাম ? আমি তার লাথি ঝাঁটা সহ্য করে থাকতাম, যাতে তোর মুখে রুটি তুলে দিতে পারি। তোকে মারলো বলেই আমি তাকে খুন করেছিলাম। হায় ঈশ্বর, আমি যে শুধু তোর জন্যেই বেঁচে ছিলাম রে ! তোর কথা মনে না থাকলে, আমি কয়েদখানায় এতোগুলো বছর ওই কষ্ট ভোগ না করে, কবে মরে যেতাম !'

'শোনো মেয়ে, তুমি একটু যুক্তি দিয়ে বোঝো। আমার বয়েস কুড়ি। রোজালিয়া না এলে আমার জীবনে অন্য কেউ আসবে।'

'পশু ! আমি তোকে ঘেন্না করি। বেরিয়ে যা এখান থেকে—'

প্রচণ্ড জোরে কুরিতোকে দরজার দিকে ঠেলে দেয় লা কাশিড়া। কুরিতো দু কাঁধে ঝাঁকুনি তোলে, 'ভেবো না আমি এখানে থাকতে চাই !'

খুশিয়াল ভঙ্গিতে উঠোন পেরিয়ে বাইরে চলে যায় কুরিতো, তারপর সশব্দে বন্ধ করে দেয় পেছনের লোহার দরজাটা। লা কাশিড়া ওর ছোট্ট ঘরখানাতে এধার থেকে ওধারে পায়চারি করতে থাকে বারবার। ধীরে ধীরে প্রহরগুলো কেটে যায়।

ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত কোনো বন্য জন্তুর একাগ্র দৃঢ়তা নিয়ে বহুক্ষণ জানলায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে রাখে ও—হৃৎপিণ্ডের বাঁধন-ছেঁড়া আলোড়িত অস্থিরতাকে চেপে রেখে দাঁড়িয়ে থাকে নিস্পন্দ হয়ে। হঠাৎ লোহার দরজায় কার যেন হাতের শব্দ শোনা যায়, তার মানে কেউ বাইরে যাচ্ছে। হাঁপাতে থাকা মুখটাকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বাইরে তাকায় লা কাশিড়া, ভাঁটার মতো চোখ দুটো যেন ঠিকরে আসে ওর মুখ থেকে। কিন্তু লোকটা ম্যাসন। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে লা কাশিড়া। রোজালিয়ার মা পাইলার ভেতরে ঢুকে আস্তেসুস্থে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে নিজের ঘরে চলে যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসের অসহনীয় কষ্ট থেকে স্বস্তি পেতে লা কাশিড়া নিজের গলাটা চেপে ধরে। তবু অপেক্ষা করে থাকে ও। মাঝে-মধ্যেই এক-একটা অস্বাভাবিক শিহরণ বয়ে যেতে থাকে ওর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে।

অবশেষে! দরজায় আলতো হাতের শব্দ আর ওপর থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠস্বর: 'কে?'

'আস্তে!'

রোজালিয়ার কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারে লা কাশিড়া। ওপর থেকে দরজাটা খোলা হয়েছিলো—ভেতরে ঢুকে প্রাণময় স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে উঠোনটা পেরিয়ে আসে রোজা-লিয়া। ওর প্রতিটি ভঙ্গিমায় প্রাণের আনন্দ। ও সিঁড়িতে পা রাখতে যেতেই লা কাশিড়া একলাফে সামনে এগিয়ে গিয়ে ওকে থামিয়ে দেয়, এমনভাবে ওর হাত চেপে ধরে যে মেয়েটা কিছুতেই ছাড়াতে পারে না নিজেকে।

'কি চাও তুমি?' রোজালিয়া বলে, 'যেতে দাও আমাকে।'

'আমার ছেলের সঙ্গে কি করছিলি তুই?'

'আমাকে যেতে দাও বলছি, নইলে আমি চেঁচাবো।'

'তুই রোজ রাতে দরজার কাছে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করিস—সত্যি কিনা?'

'মা, বাঁচাও! আন্তনিয়ো!' তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে ওঠে রোজালিয়া।

'জবাব দে আমার কথার।'

'বেশ, তুমি সত্যি কথা জানতে চাও তো শোনো। ও আমাকে বিয়ে করবে। ও আমাকে ভালোবাসে, আর আমি···আমিও ওকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি।' লা কাশিড়ার দিকে ফিরে ওর বিষাক্ত বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে রোজালিয়া। 'তুমি কি ভেবেছো, আমাদের বাধা দিয়ে আটকে রাখতে পারবে? তুমি কি ভেবেছো ও তোমাকে ভয় পায়? ও তোমাকে ঘেন্না করে—আমাকে ও তা-ই বলেছে। ও চেয়েছিলো, তুমি যেন কোনোদিনও কয়েদখানা থেকে

বেরুতে না পারো।'

'ও তোকে এই কথা বলেছে?' লা কাশিড়া কুঁকড়ে উঠে পেছিয়ে যায়।

'হ্যাঁ, তা-ই বলেছে। তা ছাড়া আরও অনেক কিছুই বলেছে। বলেছে যে তুমি পেপে শান্তিকে খুন করেছো, তুমি সাত বছর কয়েদখানায় ছিলে। আর বলেছে, তুমি মরে গেলেই ভালো হতো।' বিষ ঢালার মতো হিসহিসিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করে রোজালিয়া। হতভাগিনী লা কাশিড়া একেবারে কুঁকড়ে যায়, মনে হয় যেন ওকে দৈহিক আঘাত করা হয়েছে। ওর অবস্থা দেখে কর্কশ সুরে হেসে ওঠে রোজালিয়া, 'আমি যে একটা খুনীর ছেলেকে বিয়ে করতে অরাজী হইনি, এ জন্যে তোমার গর্ব হওয়া উচিত।'

লা কাশিড়াকে একটা ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ির দিকে লাফ দেয় রোজালিয়া। কিন্তু ভয়ঙ্কর বিদ্রূপে পাথর হয়ে যাওয়া মহিলা ওই চাঞ্চল্যটুকুতেই ফের সজীব হয়ে ওঠে। পাশব ক্রোধে একটা চিৎকার তুলে ও ঝাঁপিয়ে পড়ে রোজালিয়ার ওপরে এবং কাঁধ ধরে ওকে টেনে নিয়ে আসে নিচের দিকে। রোজালিয়া ঘুরে ওর মুখে আঘাত করে। লা কাশিড়া এবারে বুকের ভেতর থেকে একটা ছুরি বের করে, তারপর একটা শপথ বাক্য উচ্চারণ করে ছুরিটা রোজালিয়ার ঘাড়ে বসিয়ে দেয়। আর্তনাদ করে ওঠে রোজালিয়া।

'মা, ও আমাকে মেরে ফেললো!'

সিঁড়ির তলায় পাথরের ওপরে একটা স্তূপের মতো হয়ে পড়ে থাকে মেয়েটা। রক্তের একটা ছোটোখাটো ডোবা জমে ওঠে মাটিতে।

রোজালিয়ার মরিয়া চিৎকারে আধ ডজন দরজা ঝটপট খুলে গিয়েছিলো, সবাই ছুটে এলো লা কাশিড়াকে ধরতে। কিন্তু দেয়ালে পিঠ রেখে সকলের মুখোমুখি হলো লা কাশিড়া। ওর মুখের অভিব্যক্তিতে এমন এক হিংস্রতা যে কেউ ওর সামনে এগুতে ভরসা পেলো না। দ্বিধাটা মুহূর্তের, কিন্তু পাইলার আর্তনাদ তুলে বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসায় মুহূর্তের জন্যেই সকলের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। সুযোগ দেখে সামনের দিকে ছুটতে লাগালো লা কাশিড়া। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় তালা লাগিয়ে ছিটকিনি তুলে দিলো।

আচমকা সারা উঠোন লোকে ভরে গেলো। পাইলার উঁচু গলায় ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়ের ওপরে, কিছুতেই ওকে টেনে সরানো যায় না। একজন ডাক্তার আনতে ছুটে গেলো, আর একজন গেলো পুলিসের কাছে। রাস্তা থেকে জনতা জড়ো হয়ে ঘিরে রাখলো বাইরের দরজাটা। ডাক্তার একটা কালো ব্যাগ হাতে নিয়ে তড়িঘড়ি করে ভেতরে ঢুকে গেলেন। পুলিস এসে

পৌঁছতেই ডজনখানেক লোক তৎক্ষণাৎ উত্তেজিতভাবে তাদের ঘটনাটা বোঝাতে লাগলো। তারা লা কাশিড়ার ঘরটা দেখিয়ে দিতেই পুলিস দরজা ভেঙে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। তারপর খানিকটা ধাক্কাধাক্কির পর তারা হাতকড়ি পরানো লা কাশিড়াকে নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। জনতা সামনের দিকে ধেয়ে এলো, কিন্তু পুলিস ওকে ঘিরে রাখলো। অস্ত্রের খাপ দিয়ে তারা পিটিয়ে সরিয়ে দিলো লোকগুলোকে, কিন্তু তারা দূর থেকে মুঠিবদ্ধ হাত তুলিয়ে আস্ফালন করতে লাগলো আর অভিশম্পাত ছুঁড়তে লাগলো লা কাশিড়ার দিকে। লা কাশিড়া তবু প্রসন্ন হয়ে কোনো জবাব দিলো না। জয়ের আনন্দে ওর চোখ দুটো তখন জ্বলছে। পুলিসগুলো ওকে উঠোন দিয়ে নিয়ে এলো, রোজালিয়ার লাশটাকে পেরিয়ে গেলো ওরা।

'মরে গেছে?' জিগেস করলো লা কাশিড়া।

'হ্যাঁ,' ডাক্তার গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' বললো ও।

মেবেল

বার্মার প্যাগান থেকে স্টিমারে চেপেছিলাম মান্দালয়ে যাবো বলে। কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌঁছবার বেশ কিছুদিন আগেই একদিন স্টিমারটা রাতের মতো যে গ্রামে নোঙর ফেললো, আমি সেখানেই নেমে পড়বো বলে স্থির করলাম। ক্যাপটেন বলেছিলেন, ওখানে সুন্দর একটা ছোট্ট ক্লাব আছে—সেখানে গিয়ে হাজির হলে আমার কোনো অসুবিধে হবে না। ওরা স্টিমার থেকে এমনি হুটহাট করে নেমে পড়া আগন্তুকদের গ্রহণ করতে রীতিমতো অভ্যস্ত। ওখানকার সচিব ভারি ভালো লোক। ওখানে আমি ইচ্ছে হলে এক হাত ব্রিজও খেলতে পারি। আমার হাতে তখন কোনো কাজ নেই। তাই স্টিমার ঘাটে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা বলদে-টানা গাড়িগুলোর মধ্যে একটাতে চেপে আমি সোজা ক্লাবে গিয়ে হাজির হলাম। বারান্দায় একটা লোক বসেছিলো। আমি এগিয়ে যেতেই সে ঘাড় নেড়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো। তারপর জিগেস করলো আমি হুইস্কি আর সোডা পান করবো, না কি জিন আর বিটার। আমি যে কোনো কিছুই নিতে না পারি, তা যেন লোকটার মাথাতেই আসেনি। আমি বড়ো পানীয়টাই বেছে নিয়ে বসে পড়লাম। লোকটা লম্বা, রোগা, গায়ের রঙ তামাটে, মুখে বিশাল একজোড়া গোঁফ, পরনে খাকি রঙের হাফ প্যাণ্ট আর শার্ট। লোকটার নাম আমি জানতে পারিনি। তবে ওর সঙ্গে

সামান্য কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর, অন্য একজন ভদ্রলোক এসে ক্লাবের সচিব হিসেবে নিজের পরিচয় দিলেন এবং তিনি আমার বন্ধুটিকে জর্জ বলে সম্বোধন করে জিগেস করলেন, 'তোমার বউয়ের কাছ থেকে কোনো খবর পেলে ?'

'হ্যাঁ, এবারের ডাকে চিঠি পেলাম।' লোকটার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'ওর সময় আর কাটছে না।'

'তোমাকে অযথা অস্থির হতে বারণ করেছে তো ?'

জর্জ চাপা গলায় হাসলো। ভুল করলাম কিনা জানি না, কিন্তু আমার যেন মনে হলো তার হাসির মধ্যে একটুকরো কান্নার ছায়া লুকিয়ে আছে।

'সত্যি বলতে কি, ও তা-ই লিখেছে। কিন্তু সেটা কাজে করার চাইতে মুখে বলা সহজ। আমি জানি ও একটু ছুটি চায় এবং ও ছুটি কাটাতে গেছে বলে আমিও খুশি। কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটা বড্ডো কঠিন।' জর্জ আমার দিকে তাকালো, 'গিন্নীর সঙ্গে এই আমার প্রথম ছাড়াছাড়ি, বুঝলেন। আর ওকে ছেড়ে এখন আমার অবস্থা একেবারে একটা অনাথ কুকুরের মতো।'

'আপনাদের কতোদিন বিয়ে হয়েছে ?'

'পাঁচ মিনিট।'

'বাজে বোকো না, জর্জ,' ক্লাবের সচিবটি হাসলেন। 'আট বছর হয়ে গেলো তোমাদের বিয়ে হয়েছে।'

সামান্য কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর জর্জ তার হাতঘড়ির দিকে তাকালো এবং নৈশভোজের জন্যে এবারে তাকে পোশাক বদলাতে যেতে হবে জানিয়ে বিদায় নিলো। রাতের অন্ধকারে লোকটাকে মিলিয়ে যেতে দেখলেন সচিবটি। তাঁর মুখে মৃদু হাসি, কিন্তু তা অকরুণ বিদ্রূপের হাসি নয়। 'লোকটা এখন একা বলে আমরা সবাই ওকে যথাসম্ভব সঙ্গ দিতে চেষ্টা করি,', উনি বললেন। 'স্ত্রী দেশে যাবার পর থেকে ও প্রচণ্ড মনমরা হয়ে আছে।'

'স্বামী এতো অনুরক্ত জেনে মহিলার নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগার কথা!'

'মেবেল এক অসাধারণ মহিলা।'

পরিচারককে ডেকে ফের পানীয় আনার ফরমাশ দিলেন ভদ্রলোক। এই অতিথিসেবাপরায়ণ জায়গায় ওঁরা জিগেসই করেন না, আপনি কিছু পান করবেন কি না—পান করাটাই স্বতঃসিদ্ধ বলে ওঁরা ধরে নেন। যাই হোক, তারপর একটা লম্বা কুর্সিতে শরীর বিছিয়ে এবং একটা চুরুট ধরিয়ে উনি আমাকে জর্জ ও মেবেলের কাহিনীটা বললেন।

জর্জ ছুটিতে দেশে থাকার সময় ওদের বিয়ের বাক-বিনিময় হয়। তারপর জর্জ

যখন বার্মাতে ফিরে আসে তখন ঠিক হয়, মেবেল ছ মাসের মধ্যেই ওর কাছে চলে আসবে। কিন্তু তারপর থেকে একটার পর একটা ঝামেলা এসে হাজির হতে শুরু করে। মেবেলের বাবার মৃত্যু হয়, যুদ্ধ লাগে, জর্জকে এমন একটা জেলায় পাঠানো হয় যেটা সাদা মেয়েমানুষদের থাকার পক্ষে উপযোগী নয়—এবং এই ভাবে শেষ পর্যন্ত মেবেলের রওনা হতে হতে সাতটা বছর কেটে যায়। জর্জ বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করে রাখে, যাতে মেবেল এসে পৌঁছনোর দিনেই বিয়েটা সেরে ফেলা যায়। তারপর মেবেলের জন্যে সে রেঙ্গুন গিয়ে হাজির হয়। জাহাজ যেদিন আসার কথা সেদিন সকালবেলা সে একটা মোটর গাড়ি ধার করে জাহাজঘাটায় গিয়ে, সেখানে পায়চারি করে সময় কাটাতে থাকে। কিন্তু তারপরেই আচমকা, কোনো রকম জানান না দিয়ে, জর্জের স্নায়ুগুলো বিকল হয়ে ওঠে। মেবেলকে সে সাত বছর দেখেনি। ও দেখতে কেমন, তাও সে ভুলে গেছে। এখন তার কাছে মেবেল এক সম্পূর্ণ অপরিচিতা মহিলা। জর্জ তার পাকস্থলীর গভীরে এক ভয়ঙ্কর অসুস্থতা অনুভব করলো, তার হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো। জর্জের মনে হলো, তার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। মেবেলকে সে বলবে, সে ভীষণ দুঃখিত, কিন্তু সে পারবে না—কিছুতেই ওকে বিয়ে করতে পারবে না। কিন্তু যে মেয়েটি সাত বছর ধরে তার সঙ্গে বাকদত্তা হয়ে আছে, তাকে বিয়ে করার জন্যে যে মেয়ে ছ হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে আসছে—তাকে একটা মানুষ কি করে অমন কথা বলতে পারে? তা বলার মতো স্নায়ুর জোরও জর্জের ছিলো না। জাহাজঘাটা থেকে তক্ষুণি একটা স্টিমার সিঙ্গাপুরে রওনা হচ্ছিলো। ত্রস্তহাতে মেবেলকে একটা চিঠি লিখে, কোনোরকম মালপত্র না নিয়ে, এক পোশাকে সে ওই স্টিমারে উঠে পড়লো।

মেবেল যে চিঠিটা পেয়েছিলো তা অনেকটা এ রকম:

প্রিয়তমে মেবেল,

একেবারে আচমকা একটা কাজ নিয়ে আমাকে দূরে চলে যেতে হচ্ছে। কবে ফিরবো জানি না। তাই আমার মনে হয়, এখন তোমার পক্ষে ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়াই অনেক বেশি বুদ্ধিমতীর কাজ হবে। আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সমস্তই খুব অনিশ্চিত। ইতি—

তোমার প্রিয় জর্জ

কিন্তু সিঙ্গাপুরে পৌঁছে জর্জ দেখলো, একটা তারবার্তা তার জন্যে অপেক্ষা করছে: 'সমস্তই বুঝেছি। দুশ্চিন্তা কোরো না। ভালোবাসা। মেবেল।'

আতঙ্ক জর্জকে প্রত্যুৎপন্ন করে তুললো।

'হে ঈশ্বর, আমার বিশ্বাস ও আমার পিছু নিয়েছে,' বললো সে। রেঙ্গুনের

জাহাজি-অফিসে তার পাঠিয়ে সে সুনিশ্চিত হয়ে নিলো, তাদের যে জাহাজটা এখন সিঙ্গাপুরের দিকে ভেসে আসছে তার যাত্রী-তালিকায় মেবেলের নামটা রয়েছে। নষ্ট করার মতো আর একটি মুহূর্তও হাতে নেই। জর্জ এক লাফে ব্যাংককগামী ট্রেনে উঠে পড়লো। কিন্তু তার অস্বস্তি হচ্ছিলো। সে যে ব্যাংককে চলে গেছে তা বুঝতে মেবেলের কোনো অসুবিধে হবে না এবং তার মতো মেবেলও অতি সহজে ব্যাংককের ট্রেনে উঠে পড়বে। ভাগ্যক্রমে পরদিনই একটা ফরাসী জাহাজ সাইগনে রওনা হচ্ছিলো। জর্জ ওই জাহাজেই চাপলো। সাইগন তার পক্ষে নিরাপদ জায়গা। সে যে সাইগনে চলে গেছে, মেবেল তা ভাবতেও পারবে না। আর ভাবলেও, ইতিমধ্যে ও নিশ্চয়ই ইঙ্গিতটা বুঝতে পারবে। ব্যাংকক থেকে সাইগন পাঁচ দিনের সমুদ্রযাত্রা—জাহাজটা নোংরা, ঠাসা, অসুবিধেজনক। সাইগনে পৌঁছে খুশি হলো জর্জ এবং একটা রিক্সা নিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠলো। আগন্তুকদের খাতায় সে নিজের নামটা লিখতেই, তৎক্ষণাৎ তার হাতে একটা তারবার্তা তুলে দেওয়া হলো। তাতে শুধু দুটো শব্দ: 'ভালোবাসা। মেবেল।' জর্জের শরীরে ঠাণ্ডা ঘাম ছুটিয়ে দেবার পক্ষে ওই শব্দ দুটিই তখন যথেষ্ট।

'হংকঙে যাবার পরবর্তী জাহাজ কখন?' জিগেস করলো সে।

জর্জ হংকং গেলো, কিন্তু সেখানে থাকতে ভরসা পেলো না। ম্যানিলাতে গেলো, কিন্তু ম্যানিলা অলক্ষুনে জায়গা। সাংহাইতে গেলো, কিন্তু সাংহাইতে স্নায়ুর চাপ অসহ্য হয়ে ওঠে—যতোবার হোটেল থেকে বের হয়, ততোবার তার মনে হয় সে হয়তো সোজা মেবেলের বাহুবন্ধনে গিয়ে পড়বে। না, সাংহাইতে থাকা চলবে না। একমাত্র উপায় হচ্ছে, ইয়োকোহামাতে যাওয়া। কিন্তু ইয়োকোহামার গ্রাণ্ডহোটেলে তার জন্যে একটা তারবার্তা অপেক্ষা করছিলো: 'ম্যানিলায় তোমাকে ধরতে পারলাম না বলে ভীষণ দুঃখিত। ভালোবাসা। মেবেল।'

চরম দুশ্চিন্তা নিয়ে জাহাজ চলাচলের খবরগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছাখে জর্জ। মেবেল এখন কোথায়? দ্রুতগতিতে ফের সাংহাইতে চলে আসে সে। এবারে সে সোজা ক্লাবে গিয়ে তার নামে আসা তারবার্তাটা চায় এবং সেটা তার হাতে তুলে দেওয়া হয়: 'শীগগিরি আসছি। ভালোবাসা। মেবেল।'

না না, এতো সহজে তাকে ধরা যায় না। ইতিমধ্যে জর্জ তার পরিকল্পনা স্থির করে ফেলেছে। ইয়াংসি একটা দীর্ঘ নদী, জর্জ এখনও চেষ্টা করলে শেষ স্টিমারটা ধরে ওই নদীপথে চুংকিং অব্দি যেতে পারবে। কিন্তু এর পরে আসছে বছর বসন্তের আগে, একমাত্র চীনে নৌকো ছাড়া, কেউ আর স্টিমারে চেপে অতোদূরে যেতে পারবে না। একাকী কোনো মহিলার পক্ষে ওভাবে যাবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে

না। জর্জ প্রথমে হ্যাংকাউ, তারপর হ্যাংকাউ থেকে আইছ্যাং গেলো। আইছ্যাঙে নৌকো বদলে নদী প্রপাতের পথ ধরে সে গিয়ে হাজির হলো চুংকিঙে। কিন্তু এখন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে, কোনো রকম ঝুঁকি সে নেবে না। চারশো মাইল দূরে চেং-তু নামে একটা জায়গা আছে, সেচুয়ানের রাজধানী। একমাত্র স্থলপথে সেখানে যাওয়া যায় এবং পথঘাট ডাকাত-বদমাশে ভরা। ডুলি এবং কুলি সংগ্রহ করে জর্জ সেদিকে রওনা হলো এবং অবশেষে ওই নির্জন চীনে-শহরের খাঁজ-কাটা প্রাচীরটা দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। সূর্যাস্তের সময় ওই প্রাচীর থেকে তিব্বতের তুষারময় পর্বতগুলি দেখা যায়।

অবশেষে এবারে জর্জ বিশ্রাম নিতে পারে। মেবেল কোনোদিনও তাকে এখানে খুঁজে পাবে না। এখানকার বাণিজ্যদূত জর্জের বন্ধু, জর্জ তাঁর কাছেই গিয়ে উঠলো। বিলাসবহুল বাড়ির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে লাগলো সে, উপভোগ করতে লাগলো কষ্টকর প্রয়াসে এশিয়া পেরিয়ে আসার পর নিঃসীম আলস্যের প্রহর-গুলোকে আর নিজের স্বর্গীয় নিরাপত্তাবোধকে। পরম আলস্যে সপ্তাহগুলো কেটে যেতে লাগলো একের পর এক।

একদিন সকালবেলা জর্জ এবং বাণিজ্যদূতটি উঠোনে বসে একজন চানের নিয়ে আসা কয়েকটা দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন শিল্পবস্তু পরীক্ষা করে দেখছে, এমন সময় দূতাবাসের বিশাল দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কির শব্দ শোনা গেলো। দারোয়ান সপাটে খুলে দিলো দরজাটা। কুলিরা একটা ডুলি বয়ে এনে সামনে নামিয়ে রাখলো এবং মেবেল তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সতেজ চেহারা। দেখে মনেই হয় না, এক পক্ষকাল পথে পথে কাটিয়ে ও এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছে।

জর্জ পাথর হয়ে গেলো। মুখটা মড়ার মতো ফ্যাকাশে। মেবেল এগিয়ে গেলো তার দিকে, 'হ্যালো, জর্জ! আমার তো ভয় হচ্ছিলো, এবারেও বুঝি তোমাকে ধরতে পারলাম না।'

'হ্যালো, মেবেল!'

জর্জ বুঝতে পারছিলো না, কি বলবে। সে শুধু এদিকে আর ওদিকে তাকাচ্ছিলো। মেবেল দাঁড়িয়েছিলো তার আর সদরের মাঝখানে। নীল চোখ দুটিতে একরাশ হাসি এনে মেবেল তার দিকে তাকালো, 'তুমি কিন্তু একটুও বদলাও-নি। পুরুষমানুষ সাত বছরে মারাত্মক বদলে যেতে পারে। আমার তো ভয় হচ্ছিলো, হয়তো তুমি মোটা হয়ে গেছো, তোমার টাক পড়ে গেছে। কি যে ভয় লাগছিলো! এতো বছর বাদে যদি ওই সব কারণে তোমাকে বিয়ে করতে না পারতাম, তাহলে সে বড়ো ভয়ঙ্কর কাণ্ড হতো।' তারপর গৃহস্বামীর দিকে তাকিয়ে

ও জিগেস করলো, 'আপনিই কি বাণিজ্যদূত ?'

'হ্যাঁ, আমি।'

'ঠিক আছে। আমি স্নানটা সেরেই ওকে বিয়ে করার জন্যে তৈরি।'

এবং ঠিক তা-ই করেছিলো ও।

লোকটা

নেপলসে গাড়ি নিয়ে ঢোকার সময় যে ঘটনাটা শেলীর চোখে পড়েছিলো, কোনো বড়ো শহরে প্রথম ঢুকেই তেমন কোনো ঘটনার সাক্ষী হবার মতো ভাগ্য সচরাচর কারুর হয় না। হাতে-ছুরি-ধরা একটা লোকের তাড়া খেয়ে এক যুবক একটা দোকান থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলো। কিন্তু লোকটা যুবককে পাকড়াও করে, ঘাড়ে এক কোপ বসিয়ে, তাকে রাস্তায় মেরে ফেলে রাখে। শেলীর মনটা নরম। এটাকে সে কোনো স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেনি, আতঙ্ক এবং ঘৃণায় তার মন ভরে উঠেছিলো। কিন্তু সে তার অনুভূতিটা তার সহযাত্রী—দৈত্যের মতো চেহারা এবং শক্তিমান এক ক্যালিব্রিয় পুরোহিতের কাছে—প্রকাশ করায়, লোকটা প্রাণ খুলে হেসে উঠে শেলীর সঙ্গে হালকা রসিকতা করার চেষ্টা করেছিলো। শেলী বলে, কাউকে ধরে পেটাবার মতো অমন তীব্র ইচ্ছে তার আর কোনোদিনও হয়নি।

এ ধরনের কোনো রোমাঞ্চকর ঘটনা আমি কখনও দেখিনি। কিন্তু প্রথমবার অ্যালজেসিরায় গিয়ে আমার এমন এক অভিজ্ঞতা হয়েছিলো, যেটাকে আমি আদৌ সাধারণ ব্যাপার বলে মনে করতে পারি না। তখন অ্যালজেসিরা ছিলো একটা অপরিচ্ছন্ন উপেক্ষিত শহর। একটু বেশি রাতে সেখানে পৌঁছে আমি জাহাজ-ঘাটার কাছে এক সরাইতে গিয়ে উঠি। সরাইটা একটু মলিন-অপরিচ্ছন্ন গোছের, কিন্তু ওখান থেকে জিব্রালটারের দৃশ্য চমৎকার দেখা যায়। আকাশে সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ। দোতলায় অফিস ঘর—নোংরা মতো একটা চাকরাণীকে ঘরের কথা জিগেস করায় সে আমাকে ওপরে নিয়ে গেলো। সরাইয়ের মালিক তাস খেলছিলো। লোকটা আমাকে দেখে আদৌ খুশি হয়েছে মনে হলো না। আমাকে আপাদমস্তক দেখে সে সংক্ষেপে একটা ঘরের নম্বর বললো, তারপর আমার দিকে আর একবারও না তাকিয়ে ফের খেলা চালিয়ে যেতে লাগলো।

চাকরাণীটা আমাকে ঘর দেখিয়ে দেবার পর, খাবারদাবার কি পাওয়া যাবে

জিগেস করলাম।

'যা চাইবেন,' জবাব দিলো ও।

ওই আপাত প্রাচুর্যের ব্যাপারটা যে কতোখানি অবাস্তব, তা আমি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই ফের জিগেস করলাম, 'বাড়িতে কি কি আছে?'

'ডিম আর শুয়োরের মাংস খেতে পারেন।'

হোটেলের চেহারাটা দেখে আমার মনে হয়েছিলো, এর চাইতে কিছু বেশিই মিলবে। যাই হোক, চাকরাণীটা আমাকে দেয়ালে চুনকাম করা নিচু ছাদের একটা সংকীর্ণ ঘরে নিয়ে গেলো। ঘরের মধ্যে একটা লম্বা টেবিল। টেবিলটা ইতিমধ্যেই আগামীকাল দুপুরের জন্যে সাজিয়ে ফেলা হয়েছে। দীর্ঘকায় এক ভদ্রলোক দরজার দিকে পেছন করে বসেছিলেন। তাঁর সামনে গোলাকার একটা পিতলের থালায় কিছু উষ্ণ অঙ্গার—ভুলবশত ধরে নেওয়া হয়েছে, আন্দালুজিয়ার পরিমিত শীতে ওগুলো যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণতা যোগাবে। টেবিলের কাছে বসে আমার যৎকিঞ্চিৎ খাবারটুকুর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমি একবার অলস দৃষ্টিতে অপরিচিত ভদ্রলোকটির দিকে তাকালাম। উনি আমার দিকেই তাকিয়েছিলেন, কিন্তু চোখে চোখ পড়তেই দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি ফের বসে ডিমের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। চাকরাণীটা যখন ডিমগুলো নিয়ে এলো তখন ফের উনি মুখ তুলে তাকালেন।

'কাল প্রথম জাহাজটা ধরার জন্যে আমাকে সময়মতো ঘুম থেকে তুলে দিও,' উনি বললেন।

'আচ্ছা, সেনর।'

উচ্চারণ শুনে বুঝলাম ইংরেজী ওঁর মাতৃভাষা। শক্তপোক্ত চওড়া গড়ন দেখে মনে হলো উনি উত্তর দিকের মানুষ। স্পেনে ইংরেজদের চাইতে শক্তসমর্থ স্কটদের অনেক বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। রিও তিন্তোর বৈভবময় খনিগুলোতেই যান কিংবা জেরেজ, সেভিল বা ক্যাডিজেই যান--সর্বত্রই আপনি উত্তরাঞ্চলের ব্যস্ততাহীন কথা বলার ধরন শুনতে পাবেন। কারমোনার অলিভকুঞ্জ, অ্যালজেসিরাস আর বোবাদিলার রেলপথ, এমন কি মেরিদার সুদূর কর্ক অরণ্যেও স্কটম্যানদের সঙ্গে দেখা হবে আপনার।

খাবারটা শেষ করে আমি অঙ্গারের থালিটার দিকে এগিয়ে গেলাম। সময়টা শীতের মাঝামাঝি—উপসাগরের প্রবল বাতাস আমার শরীরের রক্ত হিমেল করে তুলেছিলো। আমি নিজের কুর্সিটা সামনের দিকে টেনে নিতেই ভদ্রলোক ওঁরটা ঠেলে সরিয়ে নিলেন।

'সরবেন না,' আমি বললাম, 'দুজনের পক্ষে প্রচুর জায়গা রয়েছে।' তারপর নিজে একটা চুরুট ধরিয়ে, ভদ্রলোকের দিকেও এগিয়ে দিলাম একটা। জানি, স্পেনে জিব্রাল্টার থেকে আনা হাভানা চুরুট কখনও অবাঞ্ছিত হয় না।

'আপত্তি নেই,' ভদ্রলোক হাত বড়িয়ে দিলেন।

কথা বলার সুরেলা ভঙ্গিটা গ্লাসগোর। কিন্তু ভদ্রলোক আদৌ বাক্যবাগীশ নন এবং কথাবার্তা চালানোয় আমার প্রয়াসটুকুও ওঁর এক শব্দের জবাবগুলোতে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিলো। নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগলাম দুজনে। আমি যতোটা মনে করেছিলাম, ভদ্রলোকের চেহারাটা তার চাইতেও বড়োসড়ো—বিশাল চওড়া কাঁধ, সৌষ্ঠবহীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মুখখানা রোদে পোড়া, মাথার চুলগুলো ধূসর আর ছোটো ছোটো। ওঁর চোখে-মুখে কেমন একটা কঠোরতা। নাক কান মুখ—সবই ভারি এবং বড়ো বড়ো। চামড়াটা ভীষণ কোঁচকানো। নীল চোখ দুটো ফ্যাকাশে। অনবরত উনি ওঁর ধূসর লোমশ গোঁফজোড়া ধরে টানছিলেন। ওঁর এই বিচলিত ভঙ্গিটা আমার কাছে কেমন যেন বিরক্তিকর বলে মনে হচ্ছিলো কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই অনুভব করলাম উনি আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এবং ক্রমশ ওঁর দৃষ্টির তীব্রতা এতোই বিরক্তিকর হয়ে উঠলো যে শেষ অব্দি আমিও চোখ তুলে ওঁর দিকে তাকালাম। আশা করেছিলাম আগের মতো এবারেও উনি চোখ নামিয়ে নেবেন। মুহূর্তের জন্যে করলেনও তাই। তারপর ফের উনি চোখ তুলে তাকালেন। লম্বা লম্বা ঘন ভুরুর তলা থেকে চোখ মেলে খানিকক্ষণ ধরে আমাকে যাচাই করে নিয়ে আচমকা উনি জিগেস করলেন, 'জিব্রাল্টার থেকে সবে এলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি আগামী কাল যাচ্ছি—বাড়ি যাবার পথে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

শেষের শব্দ দুটো উনি এমন আবেগ দিয়ে বললেন যে আমি হেসে ফেললাম, 'কেন, স্পেন আপনার ভালো লাগে না?'

'হ্যাঁ, স্পেন তো ভালোই!'

'এখানে কি আপনি অনেকদিন ছিলেন?'

'অনেকদিন, অনে-ক দিন।'

কেমন যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলছিলেন ভদ্রলোক। ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, আমার অতি সাধারণ প্রশ্নগুলো কেন ওঁর মনের আবেগকে এমন করে উত্তেজিত করে তুললো। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে উনি ঘরের এধার থেকে ওধারে পায়চারি করতে শুরু করলেন—পথের মাঝখানে পড়ে থাকা কুর্সিটাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে পা দাপিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো। আর সেই সঙ্গে মাঝে

মাঝেই গুমরে গুমরে ওই শব্দ দুটো উচ্চারণ করতে লাগলেন বারবার। 'অনেকদিন অনে-ক দিন।' আমি নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলাম। ভীষণ বিব্রত লাগছিলো। তাই নিজেকে প্রশান্তি দিতে অপেক্ষাকৃত গরম ছাইগুলোকে ওপরে তোলার জন্যে পেতলের থালিটাকে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। হঠাৎ আমার সামনে এসে ভদ্রলোক স্থির হয়ে দাঁড়ালেন—যেন আমার ওই সামান্য নড়াচড়াটুকুই আমার অস্তিত্বটাকে ওঁর দৃষ্টির পথে ফিরিয়ে আনলো। তারপর ধপাস করে কুর্সিতে বসে জিগেস করলেন, 'আপনার কি মনে হচ্ছে আমি অদ্ভুত?'

'অধিকাংশের চাইতে বেশি কিছু অদ্ভুত নন,' মৃদু হাসলাম আমি।

'আমার কিছুই কি আপনার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে না?' বলতে বলতে সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন ভদ্রলোক, যাতে আমি ওঁকে ভালোভাবে দেখতে পাই।

'না।'

'দরকার হলে কথাটা আপনি ফের বলবেন?'

'বলবো।'

এ সবের কি অর্থ তা আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম ভদ্রলোক সুরার প্রভাবে রয়েছেন কি না। দু তিন মিনিট উনি একটিও কথা বলেননি এবং ওঁর নীরবতা ভাঙার কোনো ইচ্ছেও আমার হলো না।

'আপনার নাম?' আচমকা প্রশ্ন করলেন উনি। আমি বললাম।

'আমার নাম রবার্ট মরিসন।'

'স্কচ?'

'আমি গ্লাসগোর লোক। বেশ কয়েক বছর ধরে এই অভিশপ্ত দেশটাতে রয়েছি। আপনার কাছে তামাক আছে?'

আমার তামাকের থলেটা ওঁকে দিলাম। উনি নলে তামাক ভরে এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে সেটাকে ধরিয়ে নিলেন।

'আর থাকতে পারছি না। অনেকদিন থেকেছি। অনে-ক দিন।'

ফের লাফিয়ে উঠে ঘর জুড়ে পায়চারি করার এক প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করলেন ভদ্রলোক, কিন্তু কুর্সি আঁকড়ে রেখে প্রাণপণে সেটাকে দমিয়ে রাখলেন। ওঁর এই আন্তরিক প্রয়াস আমি ওঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম। মনে হলো দীর্ঘ দিন ধরে মদ্যপানই ওঁর এই অস্থিরতার কারণ। মাতালদের আমার ভীষণ বিরক্তিকর লাগে। তাই স্থির করলাম, প্রথম সুযোগেই আমি ঘুমোবার জন্যে এখান থেকে সরে পড়বো।

'আমি কয়েকটা জলপাই বাগিচার ব্যবস্থাপনায় ছিলাম,' ভদ্রলোক বলে চললেন। 'এখানে আমি গ্লাসগো অ্যাণ্ড সাউথ অফ স্পেন অলিভ অয়েল কোম্পানি

লমিটেডে চাকরি করি।'

'ও, আচ্ছা।'

'তেল শোধনের জন্যে আমাদের একটা নতুন প্রক্রিয়া আছে, বুঝলেন। সঠিক ভাবে পরিশোধিত হিস্পানি তেল লুক্কার তেলের মতোই সর্বাংশে ভালো। আর আমরা সেটাকে ওদের চাইতে আরও সস্তা দরে বিক্রি করতে পারি।'

ভদ্রলোক একেবারে শুকনো কাঠখোট্টা ব্যবসায়ীদের মতো কথা বলছিলেন। শব্দ চয়ন করছিলেন স্বচ্ছদের নিখুঁত নৈপুণ্যে। মনে হচ্ছিলো উনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, আদৌ মাতাল নন।

'একিজা হচ্ছে জলপাই ব্যবসায়ের মোটামুটি কেন্দ্রস্থল, বুঝলেন। সেখানে এক-জন হিস্পানী আমাদের ব্যবসা দেখাশুনো করতো। কিন্তু আমি দেখলাম লোকটা আমাদের একেবারে লুটেপুটে খাচ্ছে, তাই তাকে তাড়াতেই হলো। আগে আমি সেভিলে থাকতাম—জাহাজে করে তেল পাঠাবার পক্ষে ওটা অনেক সুবিধেজনক জায়গা। কিন্তু দেখলাম একিজায় পাঠাবার মতো কোনো বিশ্বাসযোগ্য লোক পাওয়া গেলো না। তাই গত বছর আমি নিজেই সেখানে চলে গেলাম। আপনি কি এসব কথা জানেন?'

'না'।

'শহর থেকে দু মাইল দূরে, সান লোরেনজো গ্রামের ঠিক বাইরে আমাদের কোম্পানির একটা বড়োসড়ো তালুক আছে। সেখানে একটা টিলার মাথায় চমৎকার একখানা বাড়ি, পুরোটা সাদা—দেখতে দিব্যি সুন্দর, বুঝলেন। বাড়ির ছাদে আবার দলছুট কয়েক জোড়া সারস এসে থাকে। কেউ ওখানে থাকতো না। তাই ভাবলাম, আমি ওখানে গিয়ে থাকলে শহরে বাড়িভাড়া করার টাকাটা বাঁচানো যাবে।'

'জায়গাটা একটু নির্জন নিশ্চয়ই,' আমি মন্তব্য করলাম।

'তা বটে।'

রবার্ট মরিসন দু-এক মিনিট নিঃশব্দে ধূমপান করে চললেন। আমি ভাবছিলাম, উনি আমাকে যা বলছেন তা বলার কোনো অর্থ থাকতে পারে কি না। হাত-ঘড়িটার দিকে তাকালাম একবার।

'তাড়া আছে?' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন উনি।

'তেমন কিছু না। তবে রাত বাড়ছে।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'বেশি লোকজনের সঙ্গে আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হতো না বোধহয়?' আমি

আবার পেছনে ফিরে গেলাম।

'খুব বেশি নয়। আমি থাকতাম, এক বুড়ো আর তার স্ত্রী আমার দেখাশুনো করতো। মাঝে-মধ্যে গ্রামে গিয়ে ওষুধের দোকানি ফার্নাণ্ডেজ আর তার দোকানে যে দু-একজনের সঙ্গে দেখা হতো, তাদের সঙ্গে ডোমিনো খেলতাম। শিকার করতাম, একটু-আধটু ঘোড়াও চড়তাম।'

'শুনে জীবনটা তেমন কিছু খারাপ বলে মনে হচ্ছে না কিন্তু!'

'গত বসন্তে ওখানে আমার দু বছর পূর্ণ হয়। ওহ্ ভগবান, ওখানকার যে মাসের মতো অমন গরম আমি জন্মেও দেখিনি। তখন কেউ কোনো কাজ করতে পারতো না। মজুররা ছায়ায় শুয়ে স্রেফ ঘুমোতো। কিছু ভেড়া মরতো, কিছু পাগল হয়ে যেতো। বলদগুলো পর্যন্ত খাটতে পারতো না—পিঠ কুঁজো করে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাসের জন্যে হাঁপাতো। আকাশ থেকে অভিশপ্ত সূর্যটা রোদ ছড়াতো—তার আলো এতোই ঝকঝকে যে মনে হতো মুখ থেকে চোখ দুটো বুঝি ঠিকরে বেরিয়ে যাবে। মাটির বুক কেটে চৌচির, ফসল পুড়ে ছাই। জলপাইগুলোও সব একেবারে নষ্ট হয়ে যেতো। জায়গাটা তখন স্রেফ একটা নরক। কেউ এক ফোঁটা ঘুমোতে পারতো না। একটু বাতাস পাবার চেষ্টায় আমি এ ঘর থেকে ও ঘরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। জানলাগুলো অবশ্যই বন্ধ করে রাখতাম, মেঝেতেও জল ঢালতাম—কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হতো না। রাতেও দিনের মতো গরম থাকতো। মনে হতো ঠিক যেন চুল্লির মধ্যে বাস করছি।

'শেষ অব্দি ভাবলাম, বাড়ির একতলায় উত্তর দিকের একটা ঘরে আমি নিজের জন্যে একটা বিছানা পাতার ব্যবস্থা করে নেবো। সাধারণ আবহাওয়ায় স্যাঁতসেঁতে থাকতো বলে ওই ঘরটা কোনোদিনও ব্যবহার করা হয়নি। মনে হলো, আর যা-ই হোক না কেন ওখানে শুলে অন্তত কয়েকটা ঘণ্টা ঘুমোতে পারবো। প্রচেষ্টাটা ভালোই ছিলো, কিন্তু কোনো কাজে এলো না—শুয়ে শুয়ে শুধু এপাশ ওপাশ করলাম। বিছানাটা এতো গরম যে শেষ অব্দি আর সহ্য করতে পারলাম না, উঠে বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে ঝলমলে রাত। চাঁদটা এতো উজ্জ্বল যে আমি শপথ করে বলতে পারি, আপনি ওই জ্যোৎস্নায় বই পড়তে পারতেন। আপনাকে বলেছিলাম কি, বাড়িটা একটা টিলার মাথায়? পাচিলের গায়ে ঝুঁকে আমি দূরের জলপাই গাছগুলোর দিকে তাকালাম। ঠিক যেন সমুদ্র। মনে হয় সেই জন্যেই আমার দেশের কথা মনে পড়ে গেলো। আমি ফার গাছের ঠাণ্ডা বাতাস আর গ্লাসগোর কোলাহলে ভরা রাস্তাগুলোর কথা ভাবলাম। বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, আমি ওই রাস্তাগুলোর ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম—সমুদ্রের গন্ধ

পাচ্ছিলাম। ঈশ্বরের দোহাই, একটা ঘণ্টা সেই বাতাস পাবার জন্যে আমি তখন আমার যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারতাম। ওরা বলে গ্লাসগোর আবহাওয়া জঘন্য। ও কথা বিশ্বাস করবেন না। আমি সেই বৃষ্টি, ধূসর আকাশ, হলদে সমুদ্র আর সেই ঢেউ বড়ো ভালোবাসি। আমি তখন ভুলে গেলাম আমি স্পেনে রয়েছি, রয়েছি জলপাই-রাজ্যের মধ্যিখানে। মুখ খুলে আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিলাম, যেন সমুদ্র-কুয়াশায় শ্বাস নিচ্ছি।

'তারপর, একেবারে হঠাৎ, একটা শব্দ শুনতে পেলাম। কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর। উঁচু নয়, বুঝলেন—নিচু গলা। নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে আওয়াজটা চুপি-সাড়ে হামা দিয়ে এগুচ্ছিলো ঠিক যেন…ঠিক যেন—জানি না, কিসের মতো। ব্যাপারটা আমাকে অবাক করে দিলো। ভাবতেই পারলাম না নিচে ওই জলপাই কুঞ্জের মধ্যে ওই সময়ে কে থাকতে পারে। তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। একটা লোক হাসছে—কেমন যেন মজাদার হাসি। আপনারা হয়তো সেটাকে চাপা হাসি বলতেন। হাসিটা যেন বুকে ভর দিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠে আসছিলো…উঠে আস-ছিলো বিচ্ছিন্ন ভাবে।'

মরিসন বুঝতে পারছিলেন না, তাঁর ওই অনুভূতিটা কিভাবে বর্ণনা করবেন। তবু তিনি আমার দিকে তাকালেন, দেখতে চাইলেন অনুভূতিটা প্রকাশের জন্যে উনি যে অদ্ভুত ভাষা ব্যবহার করেছেন তা আমি কিভাবে নিয়েছি।

'মানে আমি বলতে চাইছি, হাসিটা যেন ছোটো ছোটো ঝাঁকুনিতে ওপরের দিকে উঠছিলো—ঠিক বালতি থেকে ঢিল ছোঁড়ার মতো। আমি সামনের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে রইলাম। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় চারদিক প্রায় দিনের আলোর মতো ফটফট করছে, অথচ আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। আওয়াজটা থেমে গেলো। তবু যদি কেউ নড়ে ওঠে, সেই ভেবে আমি যেখান থেকে আওয়াজটা এসেছিলো সেদিকেই তাকিয়ে রইলাম। এক মিনিটের মধ্যেই ফের হাসিটা শুরু হলো, কিন্তু এবারে জোরে। এবারে একে আর চাপা হাসি বলা যাবে না, এ একে-বারে পেটফাটা হাসি। রাতের বুক জুড়ে বেজে বেজে উঠছিলো হাসিটা। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, আমার চাকরগুলোর ঘুম ভাঙছে না কেন। মনে হচ্ছিলো, ওটা কোনো বদ্ধ মাতালের হাসি।

'চিৎকার করে উঠলাম, 'কে ওখানে'?

'জবাব পেলাম শুধু গর্জনের মতো এক ঝলক হাসি। আপনাকে বলতে আপত্তি নেই. এবারে আমি খানিকটা বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। মনে মনে প্রায় স্থির করে ফেলেছিলাম, নিচে নেমে গিয়ে দেখে আসবো ব্যাপারটা কি। মাঝরাতে আমার

জায়গায় এসে কোনো হতচ্ছাড়া মাতালকে আমি কিছুতেই এ ধরনের শোরগোল করতে দেবো না। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আর্ত চিৎকার। ঈশ্বরের দোহাই, আমি একেবারে চমকে উঠেছিলাম। তারপর কান্না। লোকটা হাসছিলো গম্ভীর মোটা গলায় নিচু পর্দায়, কিন্তু তার কান্না—কান্নাটা তীক্ষ্ণ, কর্কশ, ঠিক যেন একটা গলা কেটে দেওয়া শুয়োরের আওয়াজ।

"হে ভগবান'! আমি চিৎকার করে উঠলাম। তারপর এক লাফে পাঁচিল টপকে ছুটতে ছুটতে নেমে গেলাম শব্দটার দিকে। ভেবেছিলাম কেউ একজন খুন হয়ে যাচ্ছে। চারদিক নিস্তব্ধ এবং তারপরেই একটা মর্মভেদী আর্তনাদ। তারপর ফোঁপানি আর কাতরানোর আওয়াজ। আওয়াজটা কি রকম আপনাকে বলছি, শুনলে মনে হবে কেউ একেবারে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। একটা দীর্ঘ গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেলাম, তারপর আর কিছু নেই। সব চুপ। আমি এখান থেকে সেখানে ছুটোছুটি করতে লাগলাম, কিন্তু কিছুই দেখলাম না। শেষ অব্দি তাই আবার পাহাড় ভেঙে ওপরে উঠে নিজের ঘরে ফিরে গেলাম।

'বুঝতেই পারছেন ওই রাত্রে আমি কতোটা ঘুমিয়ে ছিলাম। আলো ফুটতেই যেদিক থেকে শোরগোলটা এসেছিলো, জানলা খুলে আমি সেদিকে তাকালাম। অবাক হয়ে দেখলাম, জলপাই কুঞ্জের মধ্যে একটা উপত্যকার মতো জায়গায় ছোট্ট একটা সাদা বাড়ি। ওদিককার জমিটা আমাদের নয় এবং আমি কোনোদিনও ওদিক দিয়ে যাইনি। আমাদের বাড়ির এই অংশটাতেও আমি প্রায় কোনোদিনই আসিনি, তাই ওই বাড়িটাকেও আগে কখনও দেখিনি। জোসেকে জিগেস করলাম, ওই বাড়িটাতে কে থাকে। সে বললো, ভাই আর চাকরের সঙ্গে একটা পাগল মানুষ ওখানে থাকতো।'

'তাহলে এই হচ্ছে ঘটনাটার ব্যাখ্যা?' আমি বললাম, 'প্রতিবেশী তাহলে খুব একটা সুবিধের নয় কিন্তু!'

মরিসন চট করে নিচু হয়ে আমার কব্জিটা চেপে ধরলেন। ওঁর চোখ দুটো আতঙ্কে ঠিকরে উঠলো। আমার মুখে মুখ ঠেসে উনি ফিসফিসিয়ে বললেন, 'পাগলটা বিশ বছর আগে মরে গেছে।'

আমার কব্জি ছেড়ে দিয়ে মরিসন কুর্সিতে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগলেন।

'নিচে নেমে গিয়ে আমি বাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখেছিলাম। জানলাগুলোতে গরাদ দেওয়া, শার্সি নামানো—দরজায় তালা। দরজায় টোকা দিলাম, হাতলটা ধরে ঝাঁকুনি লাগালাম, ঘণ্টি বাজালাম, ঘণ্টির টুংটাং শব্দও শুনলাম। কিন্তু কেউ এলো না। বাড়িটা দোতলা। ওপরে তাকিয়ে দেখি, শার্সিগুলো ভালোভাবেই বন্ধ

রয়েছে। কোথাও জীবনের কোনো চিহ্ন নেই।'

'বাড়িটার অবস্থা কেমন?'

'খুবই খারাপ। দেয়াল থেকে কলি ঝরে গেছে। দরজা-জানলায় বলতে গেলে কোনো রঙই নেই। ছাদের কয়েকটা টালি মাটিতে পড়ে রয়েছে—দেখে মনে হয় দমকা বাতাসে ফেলে দিয়েছে।'

'অদ্ভুত,' বললাম আমি।

'আমার বন্ধু ওষুধের দোকানি ফার্ণাণ্ডেজের কাছে গিয়েছিলাম। সে আমাকে জোসের বলা কাহিনীটাই শোনালো। পাগল মানুষটার কথা জিগেস করায় ফার্ণাণ্ডেজ বললো, কেউ কোনোদিনও তাকে দেখেনি। সাধারণভাবে সে মোটামুটি গাঢ় ঘুমেই আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন প্রচণ্ড ক্ষিপ্ততার আক্রমণ হতো, তখন অনেক দূর থেকেও তার একটানা হাসি আর কান্না শোনা যেতো। লোকে তা শুনে ভয় পেতো। একবার অমনি পাগলামির আক্রমণে লোকটা মারা যেতেই অন্যেরা সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। সেই থেকে আর কেউ কোনোদিনও ওই বাড়িতে বাস করেনি।

'আমি কি শুনেছি তা ফার্ণাণ্ডেজকে বলিনি। ভেবেছিলাম তাহলে সে আমাকে ঠাট্টা করবে। পরের দিন সারা রাত জেগে আমি নজর মেলে রাখলাম। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। কোনো আওয়াজ শোনা গেলো না। প্রায় ভোর অব্দি অপেক্ষা করে আমি শেষে শুতে গেলাম।'

'তারপর আপনি আর কোনো দিনও কিছু শোনেননি?'

'এক মাস শুনিনি। তখনও খরা চলছে। বাড়ির পেছন দিকে অকেজো জিনিস-পত্র রাখার ঘরটায় আমি রাতে শুই। একদিন রাতে অঘোরে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ কি যেন একটা হয়ে গেলো। ব্যাপারটা আপনাকে কি করে বোঝাবো, জানি না—একটা মজার অনুভূতি···যেন আমাকে সতর্ক করে দেবার জন্যে কেউ কনুই দিয়ে আমাকে ছোট্ট একটা খোঁচা মারলো। আচমকা আমি একেবারে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে গেলাম। তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঠিক সেই আগের মতো নিচু গলায় একটা দীর্ঘ খিলখিলে হাসি শুনতে পেলাম, যেন কেউ একটা পুরনো রসিকতা প্রাণ ভরে উপভোগ করছে। নিচের ওই উপত্যকা থেকে আওয়াজটা আসছিলো এবং ক্রমশ সেটা জোর হতে লাগলো। একেবারে বুক-ফাটানো অট্টহাসি। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে আমি জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার পা দুটো কাঁপতে শুরু করলো। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত্রির বুক জুড়ে বেজে বেজে ওঠা ওই মারাত্মক অট্টহাসি শোনা, সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। তারপর সেই বিরতি এবং তারপর

যন্ত্রণাকাতর সেই তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার এবং সেই বীভৎস ফোঁপানি। সবই যেন অমানুষিক। তার মানে আমি বলতে চাইছি, আপনি শুনলে হয়তো মনে করতেন ওটা কোনো যন্ত্রণাকাতর পশু। আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, আমি তখন আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে গেছি। ইচ্ছে করলেও আমি তখন ওখান থেকে নড়তে পারতাম না। খানিকক্ষণ বাদে আওয়াজটা থেমে গেলো—আচমকা নয়, মরে গেলো আস্তে আস্তে একটু একটু করে। আমি প্রাণপণে কান পেতে রাখলাম, কিন্তু আর টু শব্দটিও শুনতে পেলাম না। হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় ফিরে এসে আমি মুখ লুকিয়ে ফেললাম।

'তখন মনে পড়লো ফার্ণাণ্ডেজ বলেছিলো, লোকটার ওপরে পাগলামির আক্রমণ কিছুদিন বাদে বাদে হতো। বাকি সময়টা সে খুব শান্তশিষ্ট হয়ে থাকতো। ফার্ণাণ্ডেজের ভাষায়, উদাসীন। ভেবে বের করলাম, কতো দিন বাদে বাদে আক্রমণ হতো বলে আমি শুনেছিলাম। আটাশ দিন। এবারে দুই আর দুই জুড়তে আমার আর বেশি সময় লাগলো না। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, পূর্ণিমাই লোকটাকে বে-সামাল করে তুলতো। আমি সত্যি সত্যি ভীতু নই। স্থির করে ফেললাম, এর শেষ দেখবো। ক্যালেণ্ডার খুঁজে বের করলাম পরের পূর্ণিমা কবে পড়বে এবং সেদিন রাতে আর শুতে গেলাম না। রিভলভারটা সাফ করে গুলি ভরে নিলাম। তারপর একটা লণ্ঠন তৈরি রেখে অপেক্ষা করতে লাগলাম বাড়ির পাঁচিলে বসে। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক লাগছিলো নিজেকে। সত্যি বলতে কি, ভয় পাচ্ছিলাম না বলে নিজের ওপরে আমি দিব্যি খুশি হয়ে উঠেছিলাম। বাইরে সামান্য বাতাস ছিলো, ছাদের ভেতর দিয়ে তা শিস তুলে বয়ে যাচ্ছিলো—সৈকতের নুড়ি-পাথরের ওপরে আছড়ে পড়ে সমুদ্রের ঢেউ যেমন আওয়াজ তোলে, তেমনি ঝিরঝির শব্দ তুলছিলো জলপাই গাছের পাতায় পাতায়। নিচের বাড়িটার সাদা দেয়ালগুলো ফটফট করছিলো চাঁদের আলোয়। নিজেকে বেশ খুশিয়াল লাগছিলো আমার।

'অবশেষে সামান্য একটু আওয়াজ পেলাম। চেনা আওয়াজ। আমি প্রায় হেসেই ফেলেছিলাম। তার মানে আমি ঠিকই ধরেছি। আজ পূর্ণিমা—লোকটার ওপরে রোগের আক্রমণ তাহলে ঘড়ির মতো নিয়ম মেনেই আসতো। এই পর্যন্ত সবই ভালো। তারপর আমি পাঁচিল টপকে জলপাইকুঞ্জের ভেতর দিয়ে সোজা ওই বাড়ি-টার দিকে দৌড়ে গেলাম। যতোই সামনে যাচ্ছি, চাপা হাসিটা ততোই জোর হয়ে উঠছে। বাড়িটার কাছে গিয়ে ওপরের দিকে তাকালাম। কোথাও একটা আলো নেই। দরজার গায়ে কান রেখে শুনলাম, পাগল মানুষটা হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। এ-বারে আমি হাতের মুঠো দিয়ে দরজায় আঘাত করলাম, ঘণ্টি বাজালাম। ঘণ্টির

আওয়াজে লোকটা যেন খুব মজা পেলো, হেসে উঠলো গর্জনের মতো। আমি ফের ঘা মারলাম দরজায়—জোরে, আরো জোরে। যতো মারি, লোকটা ততো হাসে। শেষ অব্দি আমি সবচাইতে উঁচু পর্দায় চিৎকার করে বললাম, 'দরজা খোলো, নয়তো আমি এটাকে ভেঙে ফেলবো'।

'কয়েক পা পেছিয়ে গিয়ে আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে গা-তালাটায় লাথি মারলাম। শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিলাম দরজাটার গায়ে। দরজাটা ককিয়ে উঠলো। এবারে প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করতেই সেটা খুলে গেলো সপাটে।

'পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে অন্য হাতে লণ্ঠনটা তুলে নিলাম। দরজা খুলে যাওয়ায় হাসির আওয়াজটা এবারে আরও জোর শোনাচ্ছে। ভেতরে পা ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধে আমার প্রায় অচৈতন্য হবার মতো অবস্থা হলো। ভেবে দেখুন, বিশ বছর ধরে জানলাগুলো খোলা হয়নি। আওয়াজ যা হচ্ছিলো তা মরা মানুষকে জাগিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু মুহূর্তের জন্যে আমি বুঝে পেলাম না আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে। দেয়ালগুলো যেন সামনে-পিছনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে আওয়াজটাকে। পাশের দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরটা ফাঁকা, কোনো আসবাবপত্রের অ। পর্যন্ত ঘরের মধ্যে নেই। আওয়াজটা ততো-ক্ষণে আরও জোর হয়ে উঠেছে, আমিও সেটাকে অনুসরণ করে অন্য একটা ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু সেখানেও কিছু নেই। ফের একটা দরজা খুলে দেখি, আমি একটা সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে গেছি আর পাগলটা ঠিক যেন আমার মাথার ওপরে হাসছে। আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছিলাম না, বুঝলেন—তাই সাবধানে ওপরে উঠতে লাগলাম। সিঁড়ির ওপরে একটা সরু বারান্দা। লণ্ঠনের আলোটা সামনে ফেলে আমি বারান্দা ধরে এগুতে লাগলাম এবং শেষ প্রান্তে একটা ঘরের সামনে পৌঁছে থেমে গেলাম। এর ভেতরেই রয়েছে লোকটা। আওয়াজটার কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে শুধু একটা পাতলা দরজা।

'সেই আওয়াজটা শোনাও বড়ো বীভৎস অভিজ্ঞতা। আমার শরীরের ভেতর দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেলো। নিজেকে আমি অভিশম্পাত দিলাম, কারণ আমি তখন কাঁপতে শুরু করেছি। ওটা আদৌ কোনো মানুষের আওয়াজের মতো নয়। পেছন ফিরে আমি প্রায় ছুটতে শুরু করেছিলাম আর কি। জোর করে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে আমাকে দাঁতে দাঁত চেপে রাখতে হয়েছিলো। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে দিয়ে দরজার হাতলটা ঘোরাতে পারছিলাম না। তারপরেই হাসিটা থেমে গেলো। বলতে পারেন, ছুরি মেরে থামিয়ে দেওয়া হলো হাসিটাকে। এবারে যন্ত্রণার একটা হিসহিসে শব্দ শুনলাম। এটা আমি আগে শুনিনি—কারণ এটা এতো নিচু

গলায় যে আমার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোয় না। তারপরেই একটা হেঁচকির আওয়াজ।

'ওঃ'! শুনলাম লোকটা হিস্পানি ভাষায় বলছে, 'তুমি আমাকে মেরে ফেলছো! সরিয়ে নাও ওটাকে! ওঃ ভগবান, বাঁচাও'!

'লোকটা চিৎকার করে উঠলো। পশুগুলো ওকে অত্যাচার করছে। এক ঝটকায় দরজাটা খুলে আমি ঝড়ের মতো ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। দমকা বাতাসে ভেঙে যাওয়া একটা খড়খড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্নার যে প্লাবন বয়ে গেছে, তার উজ্জ্বলতা আমার লণ্ঠনের আলোটাকেও ম্লান করে তুললো। এখন আমি এতো কাছ থেকে আপনার কথা যেমন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, তখনও আমি নিজের কানে সেই হতভাগ্যের করুণ আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলাম। ভয়ঙ্কর সেই গোঙানি আর চাপা কান্না, বীভৎস সেই হেঁচকি তোলা। লোকটার তখন মুমূর্ষু অবস্থা, এরপর কেউ আর বাঁচতে পারে না। বিশ্বাস করুন, আমি নিজের কানে তার ভাঙা ভাঙা দম আটকানো কান্না শুনেছিলাম। কিন্তু ঘরটা তখন শূন্য ছিলো।'

রবার্ট মরিসন ফের কুর্সিতে গা ডুবিয়ে বসলেন। ওই বিশাল শক্তপোক্ত মানুষটাকে হঠাৎ যেন স্টুডিয়োতে মডেল হিসেবে গড়ে রাখা কাঠের মূর্তির মতো মনে হলো আমার। মনে হলো, একটা ধাক্কা দিলেই উনি একটা স্তূপের মতো হয়ে মেঝেতে পড়ে থাকবেন।

জিগেস করলাম, 'তারপর?'

পকেট থেকে একটা নোংরামতো রুমাল বের হরে উনি কপালটা মুছে নিলেন, 'উত্তর দিকের ওই ঘরটায় ঘুমোবার মতো ইচ্ছে আমার আর তেমন ছিলো না। তাই গরম থাক বা না থাক, আমি আমার নিজের জায়গায় ফিরে গেলাম। কিন্তু ঠিক চার সপ্তাহ বাদে রাত দুটো নাগাদ সেই পাগল মানুষের চাপা হাসিতে আবার আমার ঘুম ভেঙে গেলো। মনে হলো, হাসিটা যেন আমার প্রায় কনুইয়ের কাছ থেকেই আসছে। আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, এতোদিনে আমার স্নায়ুগুলো খানিকটা ঝাঁকুনি খেয়ে গেছে। তাই লোকটার যখন ফের পাগলামি আসার কথা, মানে পরের পূর্ণিমায়, আমি কার্ণাগুেজকে আমার সঙ্গে রাত কাটাবার জন্যে নিয়ে এলাম। রাত দুটো অব্দি ওকে তাস খেলিয়ে জাগিয়ে রাখলাম আর তারপরেই আমি ফের ওটা শুনতে পেলাম। কার্ণাগুেজকে জিগেস করলাম ও কিছু শুনেছে কিনা। ও বললো, 'না'। আমি বললাম, 'কে যেন হাসছে'। ও বললো, 'তুমি মাতাল হয়েছো, দোস্ত' এবং তারপর ও-ও হাসতে শুরু করলো। এটা বড্ড বাড়াবাড়ি। আমি বললাম, 'চুপ কর, হাঁদারাম'। কিন্তু হাসিটা ক্রমশ আরও জোর হতে

লাগলো। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। দু হাতে কান চাপা দিয়ে আওয়াজটা বন্ধ করার চেষ্টা করলাম—কিন্তু কোনো লাভই হলো না। আমি আবার সেই হাসি শুনলাম, আবার সেই মর্মভেদী চিৎকারও শুনলাম। ফার্ণাণ্ডেজ ভেবেছিলো আমি পাগল হয়ে গেছি। কিন্তু আমাকে তা বলতে সাহস পায়নি—কারণ জানতো, তাহলে আমি ওকে মেরে ফেলবো। ও শুতে যাবে বলে চলে গেলো, পরদিন সকালে দেখলাম ও পালিয়ে গেছে। রাতে ওর বিছানায় কেউ শোয়নি। আমার কাছ থেকে বিদায় নিযেই ও চলে গিয়েছিলো।

'এরপর আমি আর একিজায় টিকতে পারিনি, একটা গুজব দেখিয়ে সেভিলে ফিরে এসেছিলাম। ওখানে দিব্যি নিরাপদই মনে হচ্ছিলো নিজেকে। কিন্তু সময় যতোই কাছে এগিয়ে আসছিলো, আমিও ততোই ভযে সিঁটিয়ে উঠছিলাম। অবিশ্যি নিজেকে বোঝাতাম যে এ বোকামোর কোনো অর্থ হয় না, তবু কিছুতেই নিজে তা বুঝতাম না। আসলে আমার ভয় হচ্ছিলো, ওই আওযাজগুলো আমাকে অনুসরণ করেছে এবং সেভিলেও যদি আমি ওগুলো শুনি তাহলে সারা জীবনই আমি তা শুনে যাবো। যে কোনো পুরুষ মানুষের যতোটা সাহস থাকে, আমারও তা আছে। কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে। রক্তমাংসের শরীর এতোটা সহ্য করতে পারে না। আমি জানলাম, আমি তাহলে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবো। আমার তখন এমন অবস্থা যে আমি মদ খেতে শুরু করলাম। আতঙ্কটা এতোই ভযঙ্কর হয়ে উঠেছিলো যে আমি রাত্রিবেলা জেগে জেগে শুধু দিন গুনতাম। শেষ অব্দি বুঝতে পারলাম, তারা আসবে। এবং তারা এলো। একিজা থেকে ষাট মাইল দূরে —সেভিলেও আমি সেই আওযাজগুলো শুনতে পেলাম।'

আমি কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিগেস করলাম, 'আওয়াজগুলো আপনি শেষ কবে শুনেছেন?'

'চার সপ্তাহ আগে।'

আমি চমকে উঠলাম। দ্রুত তাকালাম চোখ তুলে।

'কি বলতে চাইছেন আপনি? আজ কি তাহলে পূর্ণিমার রাত নাকি?'

ভদ্রলোক বিষণ্ণ গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তারপর কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেলেন, যেন বলতে পারছেন না। আপনি হলে হয়তো বলতেন, সেই মুহূর্তে ওঁর স্বরযন্ত্রটা পক্ষাঘাতে অসাড় হযে গিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত একটা অদ্ভুত কর্কশ গলায় উনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আজ তা-ই।'

রবার্ট মরিসন তাকিযে রইলেন আমার দিকে। মনে হলো ওঁর ফ্যাকাশে নীল চোখ দুটো যেন লালচে হয়ে উঠেছে। চট করে কুর্সি ছেড়ে উঠে, দীর্ঘ সদম্ভ পদ-

ক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে উনি সশব্দে পেছনের দরজাটা টেনে দিলেন।

স্বীকার করতেই হবে, সেদিন রাতে আমি নিজেও খুব একটা ভালো করে ঘুমোতে পারিনি।

লুইস

লুইস কেন আমাকে দেখে বিব্রত হতো তা আমি কোনোদিনই বুঝে উঠতে পারিনি। ও আমাকে অপছন্দ করতো এবং আমি জানি আমার পেছনে আমার সম্পর্কে কটূক্তি করার সুযোগ পেলে, ও নিজের স্বভাবগত ভদ্র ভঙ্গিতে তা কাজে না লাগিয়ে ছাড়তো না। অত্যন্ত বেশি মার্জিত হওয়ায় ও সরাসরি কিছু বলতে পারতো না— কিন্তু একটু ইঙ্গিত, একটা দীর্ঘশ্বাস বা সুন্দর হাত দুখানার ছোট্ট একটা ভঙ্গিমায় নিজের বক্তব্যকে একেবারে স্পষ্ট করে তুলতো। এ কথা সত্যি যে পঁচিশ বছর ধরে আমরা পরস্পরকে প্রায় অন্তরঙ্গভাবেই চিনতাম, কিন্তু পুরনো সংসর্গ ওকে প্রভাবিত করতে পারে এ কথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। লুইস আমাকে একটা অশিষ্ট, বর্বর, বিশ্বনিন্দুক এবং অমার্জিত ইতর বলেই মনে করতো। তাই স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী ও আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেনি বলে আমি একেবারে ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম। ও তেমন কিছু তো করেইনি বরং উলটে আমাকে ছাড়তেই চাইতো না। দিনে বা রাতে প্রায়ই আমাকে ওর সঙ্গে খেতে বলতো, ওর গ্রামের বাড়িতে সপ্তাহান্তিক দিনগুলো কাটাবার জন্যে বছরে দু একবার আমন্ত্রণও জানাতো। শেষ অবধি মনে হলো আমি ওর উদ্দেশ্যটা ধরতে পেরেছি। ওর মনে একটা অস্বাস্থ্যকর সন্দেহ ছিলো, আমি ওর কথা বিশ্বাস করি না। এটাই যদি আমাকে ওর অপছন্দ করার কারণ হয়ে থাকে, তাহলে ওই কারণেই ও আমার সঙ্গে পরিচিতি বজায় রাখতে চাইতো। একমাত্র আমিই ওকে একটা হাস্যকর জীব বলে মনে করি ভেবে ও মনে মনে জ্বলতো এবং যতোক্ষণ আমি নিজের ভুল স্বীকার করে হার না মানছি ততোক্ষণ ও শান্তি পাচ্ছিলো না। হয়তো ও অনুমান করেছিলো, মুখোশের পেছনে আমি মুখটাকে দেখতে পেয়েছি এবং যেহেতু আমি একাই টিকে রয়েছি, তাই আগে হোক বা পরে হোক মুখের বদলে আমিও মুখোশটাকেই আসল বলে ধরে নেবো। ও স্রেফ ভানসর্বস্ব বলে আমি কোনোদিনই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম না। আমি ভাবতাম, ও তাবৎ দুনিয়াকে যে ভাবে বোকা বানিয়েছে নিজেকেও তেমনি সম্পূর্ণভাবে প্রতারিত করেছে কি না, নাকি ওর হৃদয়ের শেষ প্রান্তে এখনও কৌতুকের দু-একটা স্ফুলিঙ্গ রয়ে গেছে। যদি থেকে থাকে তাহলে সেই

কারণেই ও হয়তো আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো, যেভাবে একজোড়া ঠগ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়—কারণ তারা দুজনেই একটা রহস্যের অংশীদার, যা অন্য কেউ জানে না।

লুইসকে আমি ওর বিয়ের আগে থেকেই চিনতাম। তখন ও ছিলো কোমল এক কৃশাঙ্গী, চোখ দুটি আয়ত আর বিষাদমাখা। বাবা-মা উদ্বেগময় ভালোবাসায় ওর প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন। কি একটা অসুখ, সম্ভবত এক ধরনের সংক্রামক জ্বর, ওর হৃৎপিণ্ডটাকে দুর্বল করে দিয়েছিলো। তাই নিজেকে ওর প্রচণ্ড যত্নে রাখতে হতো। টম মেইটল্যাণ্ড যখন ওকে বিয়ের প্রস্তাব জানালো তখন ওর বাবা-মা স্পষ্টতই খুব আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন—কারণ তাঁদের স্থির বিশ্বাস ছিলো, বিবাহিত জীবনের ধকল সহ্য করার পক্ষে লুইসের স্বাস্থ্য অনেক বেশি ক্ষীণ। কিন্তু তাঁদের অবস্থা ভালো ছিলো না, ওদিকে টম মেইটল্যাণ্ড ছিলো বড়োলোক। লুইসের জন্যে সে দুনিয়ায় সমস্ত কিছু করবে বলে কথা দিলো এবং শেষ পর্যন্ত বাবা মা একটি পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে লুইসকে তার হাতে তুলে দিলেন। টম মেইটল্যাণ্ডের বিশাল চেহারা ভারি সুদর্শন এবং সে একজন ভালো খেলোয়াড়। লুইসকে সে অন্ধের মতো ভালোবেসে ফেললো। লুইসের হৃৎপিণ্ড দুর্বল—বেশিদিন টম ওকে নিজের কাছে ধরে রাখতে পারবে বলে আশা করেনি। তাই সে স্থির করলো, পৃথিবীতে লুইসের বাদবাকি সামান্য কটা বছর সুখময় করে তুলতে সে সব কিছুই করবে। যে সমস্ত খেলায় সে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলো তা সবই সে ছেড়ে দিলো—লুইস চেয়েছে বলে নয়, বরং সে গলফ খেললে বা শিকারে গেলে লুইস খুশিই হত। কিন্তু ঘটনাচক্রে টম যখনই একটা দিনের জন্য ওকে রেখে কোথাও যাবার প্রস্তাব তুলেছে, তখনই লুইসের ওপরে হৃদরোগের একটা আক্রমণ হয়েছে। কখনও কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হলে লুইস তৎক্ষণাৎ টমের কথা মেনে নিতো, কারণ ওর মতো বাধ্য স্ত্রী আর হয় না—কিন্তু তখনই ওর হৃৎপিণ্ডটা বিকল হয়ে বসতো, একটা সপ্তাহ ওকে বিছানায় পড়ে থাকতে হতো, অথচ কোনো অভিযোগ ও জানাতো না। কাজেই টম মেইটল্যাণ্ড এমন বর্বর নয় যে ওর সঙ্গে মতবিরোধ ঘটাবে। কোনটা মেনে নেওয়া হবে তা নিয়ে ওদের মধ্যে সামান্যই কথা কাটাকাটি হতো এবং শেষ পর্যন্ত টম বহু কষ্টে লুইসকে ওর নিজের ইচ্ছেমতো চলতে রাজি করাতো। একবার একটা অভিযানে লুইসকে বিশেষ করে নিজের ইচ্ছায় আট মাইল পথ হাঁটতে দেখে আমি টম মেইটল্যাণ্ডকে বলেছিলাম, লোকে যা ভাবে তার চাইতে ও অনেক বেশি শক্তপোক্ত। টম তাতে ঘাড় নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলো, 'না না, ও ভয়ঙ্কর পলকা। দুনিয়ার সমস্ত সেরা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা ওকে দেখেছেন এবং তাঁরা সকলেই বলেছেন, ওর জীবনটা

একটা সুতোর ওপরে ঝুলছে। কিন্তু ওর উৎসাহ-উদ্দীপনা কিছুতেই হার মানে না।'

লুইসকে টম মেইটল্যাণ্ড বলেছিলো, আমি ওর সাহিষ্ণুতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছি। আর তাই নিজস্ব বিলাপের ভঙ্গিতে লুইস আমাকে বলেছিলো, 'আসছে কাল আমাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। আমি মরণের দরজায় পৌছে যাবো।'

'মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তুমি নিজে যা যা করতে চাও তা করার পক্ষে তুমি যথেষ্ট শক্তসমর্থ,' আমি অস্ফুটে বলেছিলাম।

আমি লক্ষ্য করেছিলাম, কোনো পার্টি যদি মজাদার হয় তাহলে লুইস ভোর পাঁচটা অব্দি নাচ চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কোনো পার্টি একঘেয়ে হলে ওর ভীষণ শরীর খারাপ লাগে, টমকে তখন তাড়াতাড়ি ওকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। আমার জবাবটা সম্ভবত ওর পছন্দ হয়নি, কারণ ও তখন আমার দিকে তাকিয়ে করুণ করে হেসেছিলো এবং আমি ওর আয়ত নীল চোখ দুটিতে কৌতুকের কোনো চিহ্ন দেখতে পাইনি।

লুইসের জীবনসীমা ওর স্বামীর আয়ুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। একদিন জলপথে ভ্রমণের সময় নিজেকে গরম রাখার জন্যে লুইসের সবকটা কম্বলের প্রয়োজন হয়েছিলো। তখনই টম মেইটল্যাণ্ডের ঠাণ্ডা লাগে এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়। স্বচ্ছন্দময় ভবিষ্যৎ এবং একটি কন্যা রেখে গিয়েছিলো সে। লুইসের অবস্থা তখন সান্ত্বনার অতীত। তবু আশ্চর্যভাবে ও আঘাতটা সামলে বেঁচে গেলো। ওর বন্ধুরা আশা করেছিলো, খুব শীগগিরি ও টম মেইটল্যাণ্ডকে অনুসরণ করবে। সত্যি বলতে কি, অনাথ হয়ে পড়বে বলে সবাই তখনই ওর মেয়ে আইরিসের জন্যে ভীষণ দুঃখিত হয়ে পড়েছিলো। তাই সকলেই লুইসের প্রতি মনোযোগ দ্বিগুণ করে তুললো। লুইসকে তারা একটি আঙুলও তুলতে দেবে না। ওকে অসুবিধে থেকে বাঁচাবার জন্যে তারা পৃথিবীতে সমস্ত কিছু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। না করে উপায়ও নেই, কারণ ক্লান্তিকর বা অসুবিধেজনক কিছু করার দরকার হলেই ওর হৃৎপিণ্ডটা বেঁকে বসে এবং ও মৃত্যুর দরজায় পৌছে যায়। ও বলতো, ভার নেবার মতো একজন পুরুষ মানুষের অভাবে ও একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে, বুঝতে পারছে না এই ঠুনকো স্বাস্থ্য নিয়ে কি করে ও আইরিস সোনাকে বড় করে তুলবে। বন্ধু-বান্ধবরা জিগেস করতো, কেন ও ফের বিয়ে করছে না। নাঃ, হৃৎপিণ্ডের এই অবস্থা নিয়ে সে প্রশ্নই ওঠে না—যদিও লুইস জানে, টমও তাই-ই বলতো এবং ও বিয়ে করলে সেটা আইরিসের পক্ষেই সম্ভবত সবচাইতে ভালো হতো। কিন্তু ওর মতো একটা হতভাগ্য পঙ্গুকে নিয়ে কে আর মাথা ঘামাতে চাইবে? অদ্ভুত হলেও একাধিক তরুণ এই দায়িত্ব নেবার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে এগিয়ে এলো এবং টমের মৃত্যুর এক বছর পরে

লুইস ওকে গির্জার বেদীর সামনে নিয়ে যাবার জন্যে জর্জ হবহাউসকে অনুমতি দিলো। জর্জ হবহাউস স্বাস্থ্যবান, চমৎকার মানুষ। আর্থিক অবস্থাও আদৌ খারাপ নয়। ওই পলকা মেয়েটার যত্ন নেবার বিশেষ সুবিধেটুকু পেয়ে সে যেমন কৃতজ্ঞ হয়েছিলো, আমি কোনোদিনও কাউকে তেমন কৃতজ্ঞ হতে দেখিনি।

'আমি বেশি দিন বেঁচে থেকে তোমার অসুবিধে ঘটাবো না,' লুইস তাকে বলেছিলো।

জর্জ হবহাউস একজন সৈনিক ছিলো, উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৈনিক। কিন্তু সে সামরিক বাহিনী থেকে ইস্তফা দিয়েছিলো। লুইসের স্বাস্থ্যের কারণে তাকে শীতের দিনগুলো মন্টিকার্লোতে এবং গ্রীষ্মটা ডিউভিলে কাটাতে হতো। চাকরিটা ছেড়ে দিতে সে সামান্য ইতস্তত করেছিলো এবং লুইসও প্রথম দিকে তার চাকরি ছাড়ার প্রস্তাবটা শুনতে চায়নি। কিন্তু অবশেষে লুইস তা মেনে নেয়—চিরদিনই যেমন সে মেনে এসেছে— এবং জর্জও স্ত্রীকে শেষের সামান্য কটা বছর যথাসম্ভব সুখী করে তোলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেয়।

'আর বেশি দিন নয়,' লুইস বলতো। 'আমি চেষ্টা করবো যাতে তোমাকে ঝামেলায় পড়তে না হয়।'

পরবর্তী দু তিন বছর লুইস ওর হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা সত্ত্বেও চমৎকার পোশাক-আশাক পরে অধিকাংশ প্রাণবন্ত পার্টিগুলোতে যেতো, প্রচণ্ড জুয়া খেলতো, নাচতো, এমন কি লম্বা পাতলা চেহারার যুবকদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় পর্যন্ত করতো। কিন্তু ওর প্রথম স্বামীটির মতো ধকল সহ্য করার ক্ষমতা জর্জ হবহাউসের ছিলো না এবং লুইসের দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে কাজ করার জন্যে প্রতিদিন মাঝে মাঝেই তাকে কড়া পানীয়ের সাহায্যে নিজেকে সামলে রাখতে হতো। অভ্যেসটা সম্ভবত তাকে পেয়েই বসতো এবং লুইসের তা মোটেই ভালো লাগতো না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে (লুইসের) তখনই যুদ্ধ বাঁধলো, জর্জ হবহাউস ফের সামরিক বাহিনীতে নাম লেখালো এবং তিন মাস বাদে যুদ্ধে মারা গেলো। লুইসের পক্ষে এটা একটা বিরাট আঘাত। ওর মনে হলো, এই সঙ্কটের সময় ব্যক্তিগত শোককে বড়ো করে দেখা উচিত নয়। ওই সময়ে ওর ওপরে হৃদরোগের আক্রমণ হলেও কেউ তা জানতে পারেনি। মনটাকে অন্যত্র সরিয়ে নেবার প্রয়াসে লুইস তখন ওর মন্টিকার্লোর বাড়িটাকে স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধারকামী অফিসারদের হাসপাতাল করে তোলে। বন্ধুরা লুইসকে বলেছিলো, ও কিছুতেই এতো ধকল সহ্য করতে পারবে না।

'আমি জানি, এ ধকল আমাকে শেষ করে ফেলবে,' লুইস তাদের জবাব দিয়েছিলো। 'কিন্তু তাতে কি এসে-যায়? আমার কর্তব্যটুকু আমি অবশ্যই করবো।'

লুইস শুতে মরেনি। তখনও ওর অনেক আয়ু। দৈবক্রমে প্যারীতে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়। ও তখন বিৎজে একটি দীর্ঘকায়, ভীষণ সুদর্শন ফরাসী যুবকের সঙ্গে দুপুরের খানা খাচ্ছিলো। আমাকে বললো, ও ওর হাসপাতালের কাজে এখানে এসেছে। আরও বললো অফিসাররা ওর সঙ্গে ভাবি চমৎকার ব্যবহার করে। তারা জানে ওর স্বাস্থ্য কতো পলকা এবং কেউ তাকে একটি কাজও করতে দেয় না। তারা সকলেই ওর যত্ন নেয়, যেন যেন তারা সকলেই ওর স্বামী। পরপর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলে লুইস।

'বেচারা জিভ, কে ভাবতে পেরেছিলো আমার এই হৃৎপিণ্ড নিয়ে আমি ওর চাইতে বেশিদিন বেচে থাকবো।'

'আর বেচারা টম।' আমি বলেছিলাম।

আমি জানি না, কেন আমার এ উক্তিটা ওর ভালো লাগেনি। কথাটা শুনে ও আমার দিকে তাকিয়ে করুণ করে হাসলো, ওর সুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো।

'তুমি সব সময় এমনভাবে কথা বলো যেন আমি যে সামান্য কটা বছর বাঁচবো বলে আশা করতে পারি, তাতেও তোমার খুব আপত্তি।'

'ভালো কথা, তোমার হৃদযন্ত্রটা এখন আগের চাইতে অনেক ভালো আছে, তাই না?'

'ওটা কোনোদিনও আগের চাইতে ভালো হবে না। আজ সকালেই আমি একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে সবচাইতে খারাপ পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকতে বলেছেন।'

'বেশ, কিন্তু সেজন্যে তুমি তো আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগেই তৈরি হয়ে ছিলে—তাই নয় কি?'

যুদ্ধ শেষ হবার পর লুইস লণ্ডনে গিয়ে স্থিতু হলো। এখন ওর বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে, এখনও ওর সেই রোগা পাতলা চেহারা, বড়ো বড়ো চোখ আর ফ্যাকাশে গাল—কিন্তু এখনও ওকে দেখে ওর বয়েস পঁচিশ বছরের একদিনও বেশি বলে মনে হয় না। আইরিস এখন বড়ো হয়ে গেছে। এতোদিন ও স্কুলে ছিলো, এবারে মায়ের সঙ্গে থাকবে বলে চলে এসেছে।

'ও আমার যত্ন নেবে,' লুইস বলেছিলো। 'অবিশ্যি আমার মতো এমন একটা ভয়ঙ্কর পঙ্গু মানুষের সঙ্গে বাস করা ওর পক্ষে বেশ কষ্টকরই হবে। তবে সে তো শুধু সামান্য কটা দিন। আমি জানি, এতে ও কিছু মনে করবে না।'

আইরিস ভারি ভালো মেয়ে। মার স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই সঙ্গীন—এই জ্ঞান নিয়েই ও বড়ো হয়ে উঠেছে। শিশু বয়সেও বাড়িতে হৈচৈ করার অনুমতি ও পায়-

নি। চিরদিনই ও বুকে এঁটেছে, যাকে কোনো কারণেই বিচলিত করা চলবে না। এখন যদিও লুইস ওকে বলে, একটা বিরক্তিকর বুড়ার জন্যে আইরিস নিজেকে বলি দেবে তা সে কিছুতেই শুনবে না—কিন্তু আইরিস তাতে কান দেয় না। এটা ওর নিজেকে বলিদানের প্রশ্ন নয়, বেচারী মায়ের জন্যে যতোটুকু করা যায় তাতেই ওর সুখ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওর মা তাই ওকে অনেক কিছুই করতে দেয়।

'নিজেকে কাজে লাগাতে পারছে ভেবেই ও খুশি হয়,' লুইস বলেছিলো।

'তোমার কি মনে হয় না, ওর আর একটু বেশি বাইরে-টাইরে যাওয়া উচিত?' আমি জিগেস করেছিলাম।

'আমি তো ওকে সর্বদা তা-ই বলি। কিন্তু আমি তো ওকে জোর করে আনন্দ-ফূর্তি করাতে পারি না! ঈশ্বর জানেন, আমার জন্যে কেউ আনন্দ না করে থাকুক আমি তা কক্ষণো চাই না।'

আইরিসের কাছে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাতে ও বললো, 'বেচারী মা! মা চায় আমি বেরোই, বন্ধুদের সঙ্গে থাকি, পার্টিতে যাই। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি কোথাও যাবো বলে রওনা হই, অমনি মা আবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই আমি বাড়িতে থাকাই অনেক বেশি ভালো বলে মনে করি।'

কিন্তু এর সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই আইরিস প্রেমে পড়ে। আমার এক তরুণ বন্ধু, ভারি ভালো ছেলে, ওকে বিয়ে করতে চায় এবং আইরিসও তাতে মত দেয়। মেয়েটাকে আমার ভালো লাগতো এবং শেষ অব্দি ও যে নিজস্ব একটা জীবন গড়ে নেবার সুযোগ পেয়েছে, এ জন্যে আমি খুশিই হয়েছিলাম। এমন একটা ঘটনা যে সম্ভব হতে পারে মেয়েটা তা বোধহয় কোনোদিনও ভাবেনি। কিন্তু একদিন ছেলেটি ভীষণ করুণ অবস্থায় এসে জানালো, বিয়েটা অনির্দিষ্ট কাল অব্দি স্থগিত রাখা হয়েছে। আইরিস নাকি মনে করেছে, ও কোনোদিন ওর মাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। এটা অবশ্যই আমার কোনো ব্যাপার নয়, তবু আমি সুযোগ করে গিয়ে লুইসের সঙ্গে দেখা করলাম। ও চিরদিনই চায়ের সময় বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়ন করতে ভালোবাসে। এখন আবার বয়স হওয়ায়, চিত্রকর আর লেখকদের সঙ্গেই ওর বেশি মেলামেশা।

'হ্যা, শুনলাম আইরিস নাকি বিয়ে করছে না?' সামান্য কিছুক্ষণ বাদে আমি জিগেস করলাম।

'আমি ও বিষয়ে কিছু জানি না। তবে আমার যেমনটি ইচ্ছে ছিলো, ও ঠিক অতো শীগগিরি বিয়ে করছে না। আমি হাঁটু মুড়ে বসে আমার কথাটা ওকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু ও আমাকে ছেড়ে যেতে একেবারেই নারাজ।'

'এটা ওর পক্ষে খানিকটা নির্মম বলে কি তোমার মনে হয় না ?'

'ভয়ঙ্কর! অবিশ্যি তা হয়তো সামান্য কয়েকটা মাসের জন্যে! তবে আমার জন্যে কেউ নিজেকে বলি দিচ্ছে, তা ভাবতেও আমার খুব খারাপ লাগে।'

'প্রিয় লুইস, তুমি তোমার দুটি স্বামীকে কবর দিয়েছো। আরও অন্তত দুজনকে তুমি কেন কবর দেবে না, তার সামান্যতম কোনো কারণই আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'তুমি কি সেটাকে মজা বলে মনে করো ?' কণ্ঠস্বরে ওর পক্ষে যথাসাধ্য আপত্তিকর সুর তুলে প্রশ্ন করলো লুইস।

'যে সমস্ত কাজ তুমি নিজে থেকে করতে চাও, সেগুলো করার পক্ষে তুমি চিরদিনই যথেষ্ট সক্ষম। আর যেগুলো তোমার বিরক্ত লাগে, তোমার দুর্বল হৃৎপিণ্ড শুধু সেই কাজগুলোর ব্যাপারেই তোমাকে বাধা দেয়। এটা কি তোমার কাছে কখনও অদ্ভুত বলে মনে হয়নি ?'

'আমি জানি...আমি জানি তুমি চিরদিন আমার সম্পর্কে কি ভেবে এসেছো। আমার যে কোনো অসুবিধে আছে তা তুমি কোনোদিনও বিশ্বাস করোনি, তাই না ?'

'কোনোদিনও না,' আমি পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। 'আমার ধারণা তুমি পঁচিশ বছর ধরে একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা পালন করে এসেছো। আমার ধারণা তোমার মতো এতো স্বার্থপর, এমন বিকৃত ভয়ঙ্কর মহিলা আমি আর দুটি দেখিনি। তুমি যাদের বিয়ে করেছিলে, সেই হতভাগ্য মানুষ দুটির জীবন তুমি নষ্ট করে দিয়েছো। আর এখন নষ্ট করতে যাচ্ছো তোমার মেয়ের জীবন।'

ওই সময়ে লুইসের ওপরে একবার হৃদরোগের আক্রমণ হলে আমি একটুও অবাক হতাম না। আমি ভেবেছিলাম ও আবেগে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠবে। কিন্তু ও শুধু মৃদু হাসলো আমার দিকে তাকিয়ে।

'বন্ধু, তুমি আজ আমাকে এ সমস্ত কথা বলেছো বলে একদিন ভীষণ দুঃখ করবে।'

'আইরিস এই ছেলেটিকে বিয়ে করবে না বলে তুমি কি একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছো ?'

'ছেলেটিকে বিয়ে করার জন্যে আমি আইরিসকে কাকুতি-মিনতি করে বলেছি। আমি জানি এতে আমি মারা পড়বো, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কেউ আমার জন্যে ভাবে না। সকলের কাছেই আমি স্রেফ একটা বোঝা!'

'এ বিয়ে হলে তুমি যে মারা পড়বে তা কি তুমি মেয়েকে বলেছিলে ?'

'ও আমাকে বলতে বাধ্য করেছিলো।'

'তোমার ইচ্ছে না থাকলে তোমাকে দিয়ে কেউ কোনো দিন যেন কিছু করাতে পেরেছে!'

'ওর ইচ্ছে হলে ও কালই ওই ছেলেটিকে বিয়ে করতে পারে। তাতে আমি মরলে, মরবো।'

'ঝুঁকিটা আমরা তাহলে নিয়েই ফেলি, কি বলো?'

'আমার জন্যে তোমাদের মনে কি এতোটুকুও করুণা, সমবেদনা নেই?'

'তোমাকে দেখে আমার মজা লাগে। আর যারা মজা দেয়, কেউ তাদের করুণা করতে পারে না।'

লুইসের ফ্যাকাশে গাল দুটিতে অস্পষ্ট রঙের ছোপ জেগে উঠলো। ওর মুখে হাসি, কিন্তু চোখ দুটো কঠিন আর ক্রোধে ভরা।

'আইরিস এক মাসের মধ্যেই বিয়ে করবে,' ও বললো। 'কিন্তু আমার যদি কিছু হয়ে যায়—আমি আশা করবো—তাহলে তুমি আর আইরিস নিজেদের ক্ষমা করতে পারবে।'

লুইস ওর কথা রাখলো। একটা দিন স্থির করা হলো, দারুণ জমকালো একটা বিয়ের পোশাকের ফরমাশ দেওয়া হলো, নিমন্ত্রণের চিঠিও পাঠানো হলো। আইরিস আর সেই খুব ভালো ছেলেটি আনন্দে ডগোমগো। বিয়ের দিন বেলা দশটার সময় শয়তানের মতো খারাপ সেই মহিলা—লুইসের ওপরে ফের একবার হৃদরোগের আক্রমণ হলো—এবং ও মরে গেলো। ওকে মেরে ফেলার জন্যে আইরিসকে ক্ষমা করে শান্ত হয়েই মারা গেলো লুইস।

মরীচিকা

প্রাচ্যের দেশে দেশে ঘুরে বেরিয়ে অবশেষে হাইফঙে এসে পৌছোছি। হাইফং একটা বাণিজ্যিক শহর এবং বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু জানতাম, এখান থেকে আমাকে হংকঙে নিয়ে যাবার মতো কোনো না কোনো জাহাজের খোঁজ ঠিকই পেয়ে যাবো। এখানে কয়েকটা দিন আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে এবং করার মতো কোনো কাজও আমার হাতে নেই। এ কথা সত্যি যে হাইফং থেকে ভারত-চীন সীমান্তের অ্যালং উপসাগরে বেড়াতে যাওয়া যায়, কিন্তু দৃশ্য দেখে দেখে আমি এখন ক্লান্ত। এখানে খুব একটা গরম নেই, গ্রীষ্মমণ্ডলের পোশাক থেকে মুক্ত হতে পেরে আমি এখন খুশি। কাফেতে চুপচাপ বসে থেকে, লা ইলাস্ট্রেশনের পুরনো সংখ্যাগুলো পড়ে বা স্রেফ

ব্যায়াম করার জন্যে সোজা সোজা চওড়া রাস্তাগুলো ধরে খানিকক্ষণ জোর কদমে হেঁটে আমি এখানে দিব্যি আনন্দেই আছি। হাইফঙের ভেতর দিয়ে আড়াআড়িভাবে অনেকগুলো খাল চলে গেছে, মাঝে মাঝে তার জলে দেশী নৌকোগুলোর উপস্থিতিতে আমি এমন এক দৃশ্যশোভা দেখতে পাই যা এখানকার বৈচিত্র্যহীন জীবনের মধ্যেও নানা রঙে রঙীন এবং আকর্ষণীয়। এর মধ্যে একটা খাল সুন্দর একটা বাঁক নিয়ে দূরে চলে গেছে। তার দুধারে উঁচু উঁচু চৈনিক বাড়ি। বাড়িগুলো চুনকাম করা, কিন্তু সে রঙ এখন বিবর্ণ ও মলিন। দৃশ্যটার মধ্যে জলরঙে আঁকা কোনো পুরনো ছবির মতো একটা ম্লান হয়ে আসা মার্জিত সৌন্দর্য রয়ে গেছে। কোথাও কোনো উচ্চকিত ঘোষণা নেই, বরং শান্ত এবং একটু ক্লান্তিকর—মনকে তা এক অস্পষ্ট বেদনাবোধে বিধুর করে তোলে। দৃশ্যটা, কেন ঠিক জানি না, আমাকে এক অবিবাহিতা বৃদ্ধার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলো। যুবক বয়সে আমি ওঁকে চিনতাম। উনি ছিলেন ভিক্টোরিয় যুগের একটি স্মৃতিচিহ্নের মতো। হাতে আঙুলের খাপবিহীন কালো রেশমি দস্তানা পরে থাকতেন উনি আর গরিবদের জন্যে কুরুশ কাঠি দিয়ে শাল বুনতেন—বিধবাদের জন্যে কালো আর সধবাদের জন্যে সাদা। যৌবনে উনি অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু তা অস্বাস্থ্যের জন্যে না কি প্রতিদানহীন প্রেমের কারণে তা কেউই সঠিক জানতো না।

হাইফঙে একটা দৈনিক পত্রিকা আছে। মলিন ছোট্ট একটুকরো একটা কাগজ, মোটা মোটা টাইপ, ধরলে হাতে কালি লেগে যায়। ওতে রাজনৈতিক প্রবন্ধ, বেতারের সূচী, বিজ্ঞাপন এবং স্থানীয় সংবাদ থাকে। সম্পাদক মশাই, নিঃসন্দেহে ছাপাবার মতো বিষয়বস্তুর নিদারুণ অভাবের জন্যেই, যারা হাইফঙে এসে পৌঁছোন কিংবা হাইফং থেকে চলে যান সেই সমস্ত ইউরোপীয়, এদেশীয় এবং চৈনিক ভদ্রলোকদের নাম পত্রিকায় ছাপিয়ে দেন। ফলে অন্যান্যদের সঙ্গে ওই তালিকায় আমার নামটাও ছিলো। যে পুরনো রদ্দিমার্কা জাহাজটাতে চেপে আমার হংকঙে যাবার কথা, সেটা ছাড়ার আগের দিন সকালে আমি একটা পানীয় নিয়ে হোটেলের কাফেতে বসে রয়েছি—এমন সময় পরিচারকটি এসে জানালো এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। হাইফঙে আমি কাউকেই চিনি না, তাই জিগেস করলাম ভদ্রলোকটি কে। পরিচারক জানালো উনি ইংরেজ, এখানেই থাকেন—কিন্তু তাঁর নামটা আমাকে বলতে পারলো না। ও ফরাসী ভাষা খুব সামান্যই বলতে পারে এবং ওর কথার মাথামুণ্ডু বোঝা আমার পক্ষে খুবই কঠিন। অবাক হলেও ভদ্রলোককে আমি নিয়ে আসতে বললাম। এক মুহূর্ত পরেই সে একজন শ্বেতাঙ্গকে পেছনে নিয়ে ফিরে এসে, আমাকে দেখিয়ে দিলো। আগন্তুক

একবার আমার দিকে তাকিয়ে সামনে এগিয়ে এলো। লোকটা খুবই লম্বা—উচ্চতা ছ ফুটের বেশ খানিকটা ওপরে, মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, গাল দুটো লাল এবং নিখুঁতভাবে কামানো, চোখের রং একেবারে ফিকে নীল। ওর পরনের খাকি হাফ-প্যান্টটা ভীষণ মলিন ও জীর্ণ, গায়ে গলার বোতাম খোলা একটা স্থানীয় কুর্তা, মাথায় তোবড়ানো হেলমেট। আমি সঙ্গে সঙ্গেই ধরে নিলাম লোকটা নেহাতই নিরুপায়, উঞ্ছবৃত্তি করে জীবন চালায় এবং আমার কাছে ও নির্ঘাত ধার চাইবে। ভাবতে লাগলাম কতো কমের ওপর দিয়ে আমি রেহাই পেতে পারবো।

লোকটা কাছে এসে ভাঙা-ভাঙা নোংরা নখ সহ একটা বিশাল লাল হাত আমার দিকে এগিয়ে দিলো, 'আমাকে আপনি চিনতে পারবেন বলে মনে হয় না। আপনার সঙ্গে আমিও সেণ্ট টমাস হাসপাতালে ছিলুম। কাগজে আপনার নামটা দেখেই আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। তাই ভাবলুম একবারটি দেখা করিগে।'

লোকটাকে আমার বিন্দুমাত্রও মনে পড়ছিলো না। তবু ওকে বসতে বলে একটি পানীয় খাবার প্রস্তাব দিলাম। লোকটাকে দেখে প্রথমটাতে মনে করেছিলাম, ও আমার কাছে দশ পিয়্যাস্টার চাইবে এবং আমি হয়তো ওকে পাঁচের মতো দেবো। কিন্তু এবারে মনে হতে লাগলো, ও আমার কাছে শতখানেক চাইবে এবং ওকে পঞ্চাশে খুশি করাতে পারলে আমার কপাল ভালো বলে মনে করতে হবে। যে লোক অভ্যেসের বশে ধার করে সে সর্বদা যা আশা করে তার দ্বিগুণ চায়। যা চায় সেটাই দিয়ে দিলে তাকে স্রেফ অসন্তুষ্টই করা হয়, কারণ তাহলে কেন আরও বেশি চায়নি ভেবে সে নিজের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মনে করে, তাকে আপনি প্রতারণা করেছেন।

'আপনি কি ডাক্তার?' জিগেস করলাম।

'না, আমি শুধু একটা বছর ওই জঘন্য জায়গাটাতে ছিলুম।'

লোকটা রোদ আটকাবার হেলমেটটা খুলতেই এক মাথা ধূসর চুল বেরিয়ে এলো, যেগুলো রীতিমতো ভালো করে আঁচড়ানো দরকার। ওর মুখটা অনেক রঙে চিত্রবিচিত্র, দেখে স্বাস্থ্যবান বলে মনে হয় না। দাঁতগুলো বিশ্রীভাবে ক্ষয়ে গেছে, ঠোঁটের দু কোণে খানিকটা করে ফাঁকা জায়গা। পরিচারক ফরমাশ নেবার জন্যে আসতে ও ব্র্যাণ্ডি আনতে বললে।

'বোতলটা নিয়ে এসো। লা বুতেল, কেমন?' আমার দিকে ফিরলো লোকটা, 'আমি গত পাঁচ বছর ধরে এখানে বাস করছি, কিন্তু ফরাসী ভাষাটা কেন জানি কিছুতেই ঠিকমতো রপ্ত করতে পারলুম না। আমি টোংকিনিজে কথা বলি।' কুর্সিতে হেলান দিয়ে বসে আমার দিকে তাকালো ও, 'আপনাকে আমার মনে

আছে, বুঝেছেন। আপনি ওই যমজ দুটোর সঙ্গে ঘোরাফেরা করতেন। কি যেন নাম তাদের? আমার ধারণা আপনার চাইতে আমি অনেক বেশি বদলে গেছি। আমি আমার জীবনের সেরা সময়টা কাটিয়েছি চীনদেশে। বিচ্ছিরি জল-হাওয়া, বুঝেছেন। মানুষকে একেবারে ফ্ল্যাট করে ছেড়ে দেয়।'

আমি তখনও লোকটাকে একেবারেই মনে করতে পারছি না। ভাবলাম ওকে তা বলে দেওয়াই শ্রেয়।

'আপনি কি আমার সঙ্গে একই বছরে ওখানে ছিলেন?' জিগেস করলাম।

'হ্যাঁ, '৯২তে।'

'বহুকাল আগেকার কথা।'

প্রতি বছর প্রায় ষাটজন বালক এবং অল্পবয়সী তরুণ হাসপাতালে ঢুকতো। তাদের মধ্যে অধিকাংশই হতো লাজুক এবং নতুন জীবনের দরজায় এসে তারা বিভ্রান্ত হয়েই থাকতো। অনেকে তার আগে লণ্ডনে কোনোদিন আসেইনি। অন্তত আমার কাছে তারা সাদা কাগজের ওপরে কোনো বৈশিষ্ট্য না রেখে সরে সরে যাওয়া ছায়ামাত্র। ওদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছাত্র প্রথম বছরেই কোনো না কোনো কারণে পড়া ছেড়ে দিতো। দ্বিতীয় বছরে যারা টিঁকে থাকতো তারা তদ্দিনে কিছুটা ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে শুরু করেছে। তারা শুধু নিজেদের নিয়েই মশগুল থাকতো না—তারা একসঙ্গে ক্লাসের বক্তৃতা শুনতো, দুপুরে একই টেবিলে বসে ময়দার কেক আর কফি খেতো, একই লাশকাটা ঘরে একই টেবিলে লাশ কাটতো এবং শ্যাফটসবারি থিয়েটারে বসে একসঙ্গেই দ্য বেল অফ নিউইয়র্ক দেখতো।

পরিচারক ব্রাণ্ডির বোতল নিয়ে এসেছিলো। গ্রসলি, যদি এটাই তার প্রকৃত নাম হয়ে থাকে, অকুণ্ঠ হাতে বেশ খানিকটা পানীয় ঢেলে নিয়ে বিনা জল বা সোডায় সেটাকে এক চুমুকে নামিয়ে দিলো।

'ডাক্তারি আমি সহ্য করতে পারতুম না, তাই ছেড়ে দিলুম।' লোকটা বললো, 'আত্মীয়-স্বজনরা আমার ওপরে তিতিবিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলো। আমাকে তারা একশোটা পাউণ্ড ধরিয়ে দিয়ে নিজের পথ দেখতে বললে। আমি তখন চীনে চলে গেলুম। সত্যি বলতে কি, ওখান থেকে বেরুতে পেরে আমি খুশিই হয়েছিলুম। আর আত্মীয়-স্বজনরা আমার ওপরে যতোটা বিরক্ত ছিলো, আমিও তাদের ওপরে ততোটাই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলুম। তবে সেই থেকে তাদের আমি আর তেমন করে কোনো মুশকিলে ফেলিনি।'

ঠিক তখনই স্মৃতির কোনো এক গভীর প্রান্ত থেকে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত আমার

সচেতনতার প্রান্তসীমায় গুঁড়ি মেরে উঠে এলো—যেমন করে একটা ফুলে ওঠা ঢেউ জলের সঙ্গে বালি তুলে এনে আবার ফিরে যায় পরবর্তী ঢেউটার সঙ্গে মিশে পূর্ণ-বিক্রমে সামনের দিকে এগিয়ে আসবে বলে। প্রথমে পত্রিকায় প্রকাশিত ছোট্ট একটা কেলেঙ্কারির কথা আবছা আবছা মনে পড়লো। তারপর ছেলেটির মুখ দেখতে পেলাম। তারপর আস্তে আস্তে ঘটনাগুলোও আমার মনে পড়ে গেলো। এতোক্ষণে লোকটাকে মনে পড়লো। তখন ওকে গ্রসলি নামে ডাকা হতো বলে মনে হয় না। আমার ধারণা ওর একটা এক-শব্দের নাম ছিলো—অবিশ্যি এ বিষয়ে আমি ঠিক নিশ্চিতও নই। খুব ঢ্যাঙা ছিলো ও (এবারে আমি ওকে বেশ ভালো-ভাবেই দেখতে পাচ্ছি), রোগা-পাতলা, একটু কোল-কুঁজো চেহারা। বয়েস মোটে আঠারো, কিন্তু দেহে শক্তির তুলনায় মাথায় বড্ড বেশি বেড়ে উঠেছিলো। মাথায় কোঁকড়ানো ঝকঝকে বাদামি রঙের চুল, নাক চোখ মুখ বেশ বড়ো বড়ো (এখন আর ততোটা বড়ো বলে মনে হয় না, হয়তো এখন ওর মুখটা মোটাসোটা গোলগাল হয়ে উঠেছে বলে)। গায়ের রঙ অদ্ভুত ফর্সা, দুধে-আলতায় মেশানো—ঠিক মেয়েদের মতো। ধরে নিতে পারি তখন সবাই, বিশেষ করে মেয়েরা, ওকে খুব সুদর্শন বলে মনে করতো। কিন্তু আমাদের কাছে ও ছিলো স্রেফ একটা এড়িয়ে চলার মতো অভব্য বদমাশ। মনে পড়লো, ক্লাসঘরে ও খুব একটা যেতো না। না, ঠিক তা নয়—ক্লাসে এতো বেশি ছাত্র ছিলো যে সেখানে কে গেছে আর কে যায়নি তা মনে করা শক্ত। মনে পড়লো লাশকাটা ঘরের কথা। আমি যে টেবিলটায় কাজ করছিলাম তার পাশের টেবিলেই ও। ওর টেবিলে লাশের একটা পা, কিন্তু ও সেটাকে ছুঁয়ে দেখেছে কিনা সন্দেহ। যারা লাশের অন্য অংশগুলো পেতো তারা গ্রসলির কাজে অবহেলা নিয়ে অভিযোগ তুলতো কেন, তা আজ ভুলে গেছি। সম্ভবত যেভাবেই হোক, তার নিজের কাজে অবহেলা অন্যদের কাজে বাধার সৃষ্টি করতো। সেকালে লাশের কোনো একটা 'অংশ' কাটাছেঁড়ার সময় অনেকরকম গাল-গল্প চলতো, তিরিশ বছরের দূরত্ব পেরিয়ে তার কিছু কিছু আজ আবার আমার কাছে ফিরে এলো। কে একজন বলতে শুরু করেছিলো, গ্রসলি একটা ভীষণ খুশিয়াল কুত্তা। সে মাছের মতো পান করে আর মেয়ে পটাতে দারুণ ওস্তাদ। হাসপাতালে অধিকাংশ ছেলেই ছিলো ভীষণ সরল, বাড়ি এবং স্কুলে পাওয়া ধারণা-গুলো তারা হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলো। কেউ কেউ ছিলো শালীনতার ভানে-ভরা, তারা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলো। আর যারা কঠিন পরিশ্রম করতো, তারা অবজ্ঞাভরে গ্রসলিকে জিগেস করতো সে কি করে পরীক্ষায় পাস করবে বলে আশা করে। কিন্তু তা ছাড়া অনেকেই উত্তেজিত এবং মুগ্ধ হতো—কারণ গ্রসলি যা

করতো, নিজেদের সাহস থাকলে তারাও তা-ই করতো। গ্রসলির অনেক ভাবক ছিলো, প্রায়ই দেখা যেতো তারা গোল হয়ে বসে হাঁ করে গ্রসলির মুখ থেকে তার অভিযান-কাহিনী শুনছে। স্মৃতিরা এখন আমার কাছে এসে ভিড় জমিয়েছে। মনে পড়ছে, খুব কম সময়ের মধ্যেই গ্রসলি তার সলাজ ভীরুতা হারিয়ে সংসারী মানুষের মতো হাবভাব গড়ে তোলে। পুরুষরা (ছেলেরা নিজেদের তা-ই বলতো) একে অন্যকে গ্রসলির উচ্ছৃঙ্খল চালচলনের কথা বলতো। রীতিমতো নায়ক হয়ে উঠেছিলো সে। পাঠকক্ষের পাশ দিয়ে যাবার সময় দুটি আন্তরিক ছাত্রকে অ্যানাটমি নিয়ে আলোচনা করতে দেখলে গ্রসলি তাদের উদ্দেশ্যে তিক্ত মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে যেতো। আশেপাশের মদের দোকানগুলোতে তার ছিলো স্বচ্ছন্দ যাতায়াত, দোকানের পরিসেবিকাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিলো ঘনিষ্ঠ। পেছনের দিকে তাকিয়ে এখন আমি অনুমান করে নিতে পারি, দেশ থেকে সদ্য সদ্য এসে এবং স্কুলের মাস্টারমশাই ও বাবা-মার অভিভাবকত্ব থেকে ছাড়া পেয়ে গ্রসলি তখন তার স্বাধীনতা এবং লণ্ডনের রোমাঞ্চের কাছে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলো। তার তুচ্ছ আমোদপ্রমোদগুলো আসলে যথেষ্ট নিরীহই ছিলো। ওগুলো সে করতো শুধু যৌবনের তাড়নায়। আসলে তার মাথাটাই গিয়েছিলো গুলিয়ে।

কিন্তু আমরা সবাই অত্যন্ত গরিব ছিলাম, আমরা বুঝতে পারতাম না কি করে গ্রসলি তার অমন চটকদার আমোদপ্রমোদের খরচা মেটায়। আমরা জানতাম তার বাবা একজন গেঁয়ো ডাক্তার। তিনি মাসে মাসে ছেলেকে কতো হাতখরচা দেন, সেটাও বোধহয় আমরা সঠিক জানতাম। সেটা ময়দান থেকে জুটিয়ে নেওয়া বেশ্যা বা ক্রাইটেরিয়ন পানশালায় বন্ধুদের পানীয়ের দাম মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমরা ভয়ার্ত স্বরে বলাবলি করতাম, গ্রসলি নিশ্চয়ই প্রচণ্ড দেনায় জড়িয়ে পড়ছে। অবিশ্যি ও হয়তো জিনিসপত্র বাঁধা রেখে টাকা সংগ্রহ করতে পারে—কিন্তু নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতাম, একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বদলে তিন পাউণ্ড এবং একটা কঙ্কালের বদলে তিরিশ শিলিঙের বেশি পাওয়া যায় না। আমরা বলতাম, গ্রসলি সপ্তাহে নিশ্চয়ই অন্তত দশ পাউণ্ড খরচ করে। শেষ পর্যন্ত ওরই এক বন্ধু রহস্যটা ফাঁস করে দিলো। টাকা রোজগারের একটা আশ্চর্য পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলো গ্রসলি। পদ্ধতিটা আমাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিলো। অমন উদ্ভাবনী চিন্তা আমাদের কারুরই মাথায় আসতো না বা এলেও সেটাকে চেষ্টা করে দেখার মতো সাহস কারুর হতো না। সে নিলামে যেতো এবং সস্তায় বহনযোগ্য যা কিছু বিক্রি হতো, তাই-ই কিনতো। তারপর সেটাকে মহাজনের কাছে নিয়ে গিয়ে, কেনা দরের চাইতে দশ শিলিং বা এক পাউণ্ড বেশিতে বাঁধা রাখতো। এভাবে সপ্তাহে সে চার

পাঁচ পাউণ্ড রোজগার করে ফেলতো। আমাদের বলতো, ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে সে এই ব্যবসাটাই চালাবে। আমাদের মধ্যে আর কেউ তখন অব্দি জীবনে একটি পেনিও রোজগার করিনি, তাই গ্রসলিকে আমরা প্রশংসার চোখে দেখতাম।

'চালাক ছেলে,' বলতাম আমরা।

'এ ধরনের ছেলেই শেষ অব্দি লাখোপতি হয়।'

আমরা সকলেই তখন ভীষণ জাগতিক জ্ঞানসম্পন্ন। সেই আঠারো বছর বয়সে আমরা যা জানতাম না, মনে করতাম তা জানার কোনো প্রয়োজনই নেই। দুঃখের বিষয়, পরীক্ষক কোনো প্রশ্ন জিগেস করলে আমরা এতো বিচলিত হয়ে উঠতাম যে জবাবটা প্রায়ই আমাদের মাথা থেকে সোজা উড়ে বেরিয়ে যেতো এবং কোনো নার্স চিঠি ডাকে ফেলতে বললে আমরা লজ্জায় লাল হয়ে উঠতাম। একদিন জানা গেলো, আমাদের বিভাগীয় অধ্যক্ষ গ্রসলিকে ডেকে পাঠিয়ে প্রচণ্ড ধমকেছেন এবং সে ভবিষ্যতে ফের নিয়মমাফিক নিজের কাজে অবহেলা চালিয়ে গেলে তাকে নানান ধরনের জরিমানা করা হবে বলে শাসিয়েছেন। গ্রসলি তাতে রেগে কাঁই। স্কুলে এ-সব সে যথেষ্ট সয়েছে। কিন্তু এখন একটা ঘোড়ামুখো খোজা তার সঙ্গে বাচ্চা ছেলের মতো ব্যবহার করবে, এটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। নিকুচি করেছে এ-সবের। তার বয়েস উনিশ হতে চলেছে, এখন আর তাকে শেখাবার মতো তেমন কিছু থাকতে পারে না। বিভাগীয় অধ্যক্ষ বলেছেন, তিনি শুনতে পেয়েছেন যে গ্রসলি এতো মদ্যপান করছে যেটা তার পক্ষে ভালো নয়। কি ধৃষ্টতা! তার বয়সী যে কোনো পুরুষ মানুষের মতো সমপরিমাণ মদ সে অবশ্যই গিলতে পারে। গত শনিবার সে মাতাল হয়েছিলো, আসছে শনিবারেও তাই হবে এবং সেটা কারুর পছন্দ না হলে সে তার যা ইচ্ছে তা-ই করে নিতে পারে। গ্রসলির বন্ধুরা সম্পূর্ণ এক-মত হলো, কোনো মানুষ নিজেকে এভাবে অপমানিত হতে দিতে পারে না।

কিন্তু অবশেষে আঘাতটা এলো এবং তাতে আমরা কতোখানি বিহ্বল হয়ে উঠে-ছিলাম তা এবারে আমার স্পষ্ট মনে পড়ে গেলো। গ্রসলিকে আমরা সম্ভবত দু-তিন দিন ধরে দেখছিলাম না। কিন্তু হাসপাতালে মোটামুটি অনিয়মিতভাবে আসাই তার অভ্যেস, কাজেই এ ব্যাপারে আমরা আর তেমন করে কিছু ভাবিনি। ধরেই নিয়েছিলাম, সে যথারীতি তার শিকার নিয়ে ব্যস্ত। দু-একদিন বাদে খানিকটা ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে সে ফের এসে হাজির হবে এবং একটি মেয়ের সঙ্গে সময়টা কাটাবার এক অপূর্ব কাহিনী শোনাবে আমাদের। সকাল নটায় অ্যানাটমির ক্লাস এবং সময়মতো ক্লাসে ঢোকার জন্যে তখন বড্ড তাড়াহুড়ো থাকে। ওই বিশেষ দিন-টিতে অধ্যাপকের বক্তৃতার দিকে আমাদের সামান্যই মনোযোগ ছিলো। নিজের

জন্যতরে ইংরেজী এবং প্রশংসনীয় বাগ্মিতায় স্পষ্টতই প্রসন্ন ওই ভদ্রলোক তখন মানব-কঙ্কালের কোন্ বিশেষ অঙ্গটির বর্ণনা দিচ্ছিলেন তা আমি জানি না—কারণ বেঞ্চে বেঞ্চে তখন উত্তেজিত ফিসফিসানি চলেছে, একখানা খবরের কাগজ হাত থেকে হাতে চালান হয়ে যাচ্ছে গোপনে গোপনে। হঠাৎ অধ্যাপক থেমে গেলেন। উনি পণ্ডিতিপনায় ভরা বাঁকা বাঁকা কথা শোনাতেন, নিজের ছাত্রদের নামও জানতেন না।

'আমার আশঙ্কা, পত্রিকা পড়তে থাকা ভদ্রমহোদয়টিকে আমি বোধহয় বিরক্ত করছি। অ্যানাটমি বড়ো কঠিন বিজ্ঞান। আমি দুঃখিত, পরীক্ষায় এই বিষয়টিতে উত্তীর্ণ হবার জন্যে রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনসের নিয়ম অনুযায়ী আমি আপনাদের মনোযোগ দাবী করতে বাধ্য। অবশ্য এটা অসম্ভব বলে মনে করলে যে কোনো ভদ্র-জন বাইরে গিয়ে ফের পত্রিকা পাঠে মনোনিবেশ করতে পারেন।'

যে বেচারার উদ্দেশ্যে উক্তিগুলো বর্ষণ করা হলো, লজ্জায় তার চুলের গোড়া অব্দি লাল হয়ে গেলো। বিব্রত হয়ে পত্রিকাটা সে পকেটে গুঁজে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো। অ্যানাটমির অধ্যাপক হিম দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করলেন।

'মহাশয়, আমার আশঙ্কা পত্রিকাটি আপনার পকেটে ঢোকার পক্ষে একটু বেশি বড়ো। আপনি ওটা দয়া করে হাতে হাতে আমার কাছে পাঠাবেন কি?'

কাগজটা এক সারি থেকে অন্য সারিতে হাত বদল হতে হতে ঘরের শেষ কোণে পৌঁছে গেলো। হতভাগ্য ছেলেটাকে অমন বিভ্রান্তিতে ফেলেও খুশি না হয়ে, নামজাদা শল্যবিদটি তখন পত্রিকাটা হাতে নিয়ে জিগেস করলেন, 'এই পত্রিকার কোন্ অংশে উক্ত ভদ্রলোকটি অমন নিবিড় আগ্রহের সন্ধান পেয়েছিলেন, জানতে পারি কি?'

যে ছেলেটি ওঁকে পত্রিকাটা দিয়েছিলো, সে বিনা বাক্যব্যয়ে দেখিয়ে দিলো কোন্ অনুচ্ছেদটা আমরা সবাই মিলে পড়ছিলাম। অধ্যাপক সেটা পড়লেন আর আমরা নিঃশব্দে তাঁকে লক্ষ্য করে গেলাম। তারপর পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে তিনি ফের বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। পত্রিকায় শিরোনামটা ছিলো, 'ডাক্তারি-ছাত্র গ্রেফতার': ধারে জিনিসপত্র নিয়ে সেগুলোকে বাঁধা রাখার অপরাধে গ্রসলিকে পুলিস কোর্টে হাকিমের সামনে হাজির করা হয়েছিলো এবং এটাকে বিচার সাপেক্ষ অপরাধ মনে করে হাকিম তাকে এক সপ্তাহের জন্যে হাজতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। জামিন অগ্রাহ্য হয়েছে। মনে হলো নিলামে জিনিস কিনে সেগুলোকে বাঁধা রেখে পয়সা করার পদ্ধতিটা শেষ পর্যন্ত গ্রসলির আশামতো তার নিয়মিত রোজগারের উৎস হয়ে ওঠেনি এবং সে বুঝতে পেরেছে, যে জিনিসগুলোর দাম মেটাতে হচ্ছে না সেগুলোকে

বাঁধা রাখা অনেক বেশি লাভজনক। ক্লাস শেষ হতেই আমরা ঘটনাটা নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা শুরু করে দিলাম এবং আমি বলতে বাধ্য, নিজেদের কোনো সম্পত্তি না থাকায় তার পবিত্রতা সম্পর্কে আমাদের বোধ এতোই কম ছিলো যে আমাদের মধ্যে কেউই গ্রসলির অপরাধকে তেমন কিছু সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে পারলো না। কিন্তু ভয়ঙ্করের প্রতি তরুণ সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক প্রীতির কথা ছেড়ে দিলে প্রায় সবাই ধরে নিলো, গ্রসলির দুই থেকে সাত বছরের কয়েদ হয়ে যাবে।

কেন জানি না, শেষ পর্যন্ত গ্রসলির কি হয়েছিলো তা আমার আর মনে নেই। সম্ভবত আমাদের শিক্ষাবর্ষের শেষের দিকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো এবং ছুটির সময় যখন আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, হয়তো তখন তার মামলাটা ফের তোলা হয়। জানি না পুলিস কোর্টের হাকিম মামলাটা খারিজ করে দিয়েছিলেন, না কি সেটা বিচারের জন্যে উঠেছিলো। আমার কেমন যেন ধারণা, তাকে অল্প দিনের—হয়তো ছ সপ্তাহের সাজা দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু আমার মনে পড়ে, গ্রসলি হঠাৎ আমাদের মাঝখান থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো এবং সামান্য কিছু দিনের মধ্যে উবে গিয়েছিলো তার স্মৃতিটাও। ভেবে অবাক হলাম, এতো বছর বাদে ঘটনাটার এতো বিশদ বিবরণ এতো পরিষ্কারভাবে কি করে আমি মনে করতে পারলাম। এ যেন অ্যালবামের পাতা উলটে উলটে পুরনো দিনের ছবি দেখা, ছবি দেখতেই দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে—যেটা আমি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু পাকা চুল লালমুখো ওই মোটাসোটা বয়স্ক লোকটাকে দেখে আমি কিছুতেই সেই রোগা-পাতলা গোলাপি গালওলা ছেলেটিকে চিনতে পারতাম না। দেখে মনে হয় লোকটার বয়স ষাট। কিন্তু আমি জানি ওর বয়েস নিশ্চয়ই ষাটের চাইতে অনেক কম। ভাবতে লাগলাম, মাঝখানের এই দীর্ঘ সময়টা লোকটা নিজেকে নিয়ে কি করেছে। দেখে তো মনে হয় না টাকা-পয়সার দিক দিয়ে সাংঘাতিক একটা উন্নতি করেছে।

'চীনে আপনি কি করতেন?' জিগেস করলাম।

'জল-দারোগা ছিলুম।'

'ও, তাই বুঝি?'

আমি সযত্নে নিজের কণ্ঠস্বর থেকে বিস্ময়ের সুর চেপে রাখলাম, কারণ পদটা তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। জল-দারোগারা চৈনিক শুল্ক বিভাগের কর্মী। এঁদের কর্তব্য হচ্ছে বিভিন্ন সন্ধিবন্দরে নোঙর করে থাকা জাহাজ ও চীনে নৌকোগুলোতে গিয়ে ওঠা এবং আমার ধারণা এঁদের প্রধান কাজ আফিঙের চোরাচালান বন্ধ

করা। এঁরা অধিকাংশই রয়্যাল নেভি থেকে অবসর নেওয়া এ. বি., কিংবা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ করা নন-কমিশনড্ অফিসার। ইয়াংসিতে বহু জায়গায় আমি এঁদের জাহাজে এসে উঠতে দেখেছি। পাইলট এবং এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে এঁদের খুব গলাগলি, কিন্তু ক্যাপটেন এঁদের পাত্তা দেন না। অধিকাংশ ইউরোপীয়দের চাইতে এঁরা অনেক বেশি তরবরিয়ে চীনে ভাষা বলতে শেখেন এবং প্রায়শই চীনে মহিলা বিয়ে করেন।

'ইংলণ্ড ছাড়ার সময় আমি শপথ করেছিলুম, টাকাকড়ি না জমিয়ে আর ফিরবো না। ফিরিওনি। তখনকার দিনে কাউকে, মানে কোনো সাদা মানুষকে, জল-দারোগা হিসেবে পাওয়া গেলে ওরা খুব খুশি হতো এবং কিছু জিগেসও করতো না। আপনি কে, কি—তা নিয়ে ওরা মাথা ঘামাতো না। তাই চাকরিটা পেয়ে আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলুম, এটা আপনাকে বলতে পারি। ওরা যখন আমাকে নিলো তখন আমি প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে এসেছি। যদ্দিন ভালো কিছু জোটাতে না পারি তদ্দিনের জন্যে আমি কাজটা নিয়েছিলুম, কিন্তু শেষ অব্দি থেকেই গেলুম—কারণ ওটা আমার প্রয়োজনের সঙ্গে মানানসই হয়েছিলো। আমি পয়সা করতে চেয়েছিলুম, দেখলুম একটা জল-দারোগা ঠিকমতো চলার পথটা চিনতে পারলে প্রচুর রোজগার করতে পারে। চীনা শুল্ক বিভাগের সঙ্গে আমি পঁচিশটা বছরের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছি। যখন ছেড়ে এলুম, আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, বহু কমিশনারই আমার মতো টাকা করতে পারলে খুশি হতেন।'

লোকটা আমার দিকে ধূর্ত চোখে তাকালো। ও কি বলতে চাইছে তা আমি আবছা আবছা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু তবু একটা ব্যাপারে আমি স্বেচ্ছায় আশ্বস্ত হতে চাইছিলাম—ও যদি এখন আমার কাছে একশো পিয়্যাসটার চায় (এই অঙ্কটাতেই আমি এখন আত্মসমর্পিত), তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে কোপটা নেবার জন্যে মাথা পেতে দেবো।

'আশা করি টাকাটা আপনি রেখেছিলেন,' আমি বললাম।

'রেখেছিলুম বইকি। পুরো টাকাটা আমি সাংহাইতে বিনিয়োগ করেছিলুম। তারপর যখন চীন ছেড়ে এলুম, পুরোটা রাখলুম অ্যামেরিকান রেলওয়ে বণ্ডে। আমার আদর্শ-বাণী হচ্ছে: নিরাপত্তা সর্বপ্রথম। ঠগদের সম্পর্কে আমি এতো বেশি জানি যে নিজে কোনো রকমের ঝুঁকি নিতে রাজী নই।'

মন্তব্যটা আমার ভালো লাগলো, তাই জিগেস করলাম দুপুরে ও আমার সঙ্গে খেয়ে যাবে কি না।

'না না, ওটা থাক। টিফিনে আমি তেমন কিছু খাই না, তাছাড়া আমার চাউটা

বাড়িতে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে। আমি বরঞ্চ এগুই।' লোকটা কুর্সি ছেড়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো, 'তা আপনি আজ সন্ধ্যা বেলায় এসে আমার বাসস্থানটা একটু দেখে যান না কেন? আমি হাইফঙেরই একটি মেয়েকে বিয়ে করেছি। একটা বাচ্চাও আছে। লণ্ডন নিয়ে কারুর সঙ্গে কথা বলার মতো সুযোগ খুব একটা পাই না। তবে আপনি রাতের খানার জন্যে বরং নাই বা এলেন। রাতে আমরা শুধুমাত্র এদেশীয় খাবার খাই, সেগুলো সম্ভবত আপনার ভালো লাগবে না। আপনি তাহলে বরং নটা নাগাদ আসুন, কেমন?'

'বেশ,' আমি বললাম।

ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছিলাম, পরের দিনই আমি হাইফং ছেড়ে চলে যাচ্ছি। নিজের ঠিকানাটা লিখে দেবার জন্যে গ্রসলি পরিচারককে এক টুকরো কাগজ নিয়ে আসতে বললো। তারপর বহু কষ্টে, একটা চোদ্দ বছুরে ছেলের হাতের লেখার মতো অক্ষরে ঠিকানাটা লিখে দিলো, 'হোটেলের দারোয়ানকে বলবেন, সে আপনার রিক্সাওলাকে বুঝিয়ে দেবে জায়গাটা কোথায়। আমি দোতলায় থাকি। দরজায় ঘন্টি নেই, টোকা দিলেই হবে। তাহলে চলি, পরে দেখা হবে।'

লোকটা বেরিয়ে গেলো, আমি গিয়ে খেতে ঢুকলাম।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর একটা রিক্সা ডাকলাম এবং দারোয়ানটার সাহায্যে রিক্সাওলাকে বুঝিয়ে দিলাম আমি কোথায় যেতে চাইছি। খানিকক্ষণের মধ্যেই দেখি লোকটা আমাকে সেই বাঁক নেওয়া খালটার ধার দিয়ে নিয়ে চলেছে, যেখানকার বাড়িগুলোকে দেখে আমার মনে হয়েছিল—ঠিক যেন ভিক্টোরিয়ার যুগে জলরঙে আঁকা একখানা বিবর্ণ ছবি। ওর মধ্যেই একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে লোকটা আমাকে একটা দরজার দিকে দেখালো। বাড়িটার এমনই মলিন-জীর্ণ চেহারা আর এ অঞ্চলটা এতোই দারিদ্র্যপীড়িত ও নোংরা যে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবলাম, লোকটা নিশ্চয়ই কোনো ভুল করেছে। আঞ্চলিক অধিবাসীদের এলাকায় এতো ভেতরের দিকে এবং এমন একটা জঘন্য বাড়িতে গ্রসলি থাকতে পারে বলে মনে হলো না। রিক্সাওলা ছেলেটাকে অপেক্ষা করতে বলে দরজাটা খোলার জন্যে সামান্য একটু ধাক্কা দিতেই সামনে এক সারি অন্ধকার সিঁড়ি দেখতে পেলাম। আশেপাশে কেউ নেই, রাস্তাটাও একেবারে শুনসান। একটা দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। দোতলায় উঠে ফের একটা কাঠি ধরিয়ে দেখি, সামনে বিরাট একটা বাদামী রঙের দরজা। দরজায় টোকা দিলাম, মুহূর্তের মধ্যেই এক হাতে মোমবাতি ধরা ছোটোখাটো একটি টোংকিনি মহিলা দরজাটা খুলে ধরলো। মহিলার পরনে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর মতো মেটে রঙের পোশাক,

মাথায় আঁট করে বাঁধা কালো রঙের পাগড়ি। ওর ঠোঁট এবং ঠোঁটের চারপাশ পানের রসে লাল। কথা বলার সময় লক্ষ্য করলাম, ওর মাড়ি এবং দাঁতগুলো কালো —যা এখানকার লোকগুলোকে কুৎসিত করে তোলে। মহিলা ওর দেশী ভাষায় কি যেন বললো এবং তারপরেই আমি গ্রসলির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'আরে আসুন-আসুন! আমি তো ভাবতে শুরু করেছিলুম, আপনি আর আসছেন না।'

ছোট্ট একটা অন্ধকার চিলতে ঘর পেরিয়ে আমি বড়োসড়ো একটা ঘরে গিয়ে হাজির হলাম, যেটা স্পষ্টতই খালের দিকে মুখ করা। একটা লম্বা কুর্সিতে শুয়েছিলো গ্রসলি, আমি ঘরে ঢুকতেই সটান উঠে দাঁড়ালো। পাশের টেবিলে রাখা একটা মোমের আলোয় হংকঙের পত্রিকা পড়ছিলো সে।

'বসুন, বসুন—পা দুটো তুলে বসুন,' গ্রসলি বললো।

'আপনার কুর্সিটা দখল করার মতো কোনো কারণ ঘটেনি!'

'আরে বসুন, আমি এই এটার ওপরে বসছি।' রান্নাঘরে ব্যবহার্য একটা কুর্সিতে বসে, গ্রসলি নিজের পা দুটো আমার কুর্সিটার শেষ প্রান্তে তুলে রাখলো। তারপর আমাকে ঘরে নিয়ে আসা টোংকনি মহিলাটির দিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, 'ওই হচ্ছে আমার স্ত্রী। আর বাচ্চাটা ওই কোণের দিকে রয়েছে।'

লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, দেয়ালের কাছ বরাবর পাতা বাঁশের পাটিতে কম্বল জড়ানো একটা বাচ্চা ঘুমোচ্ছে।

'ব্যাটা জেগে থাকলে একটা ছোটোখাটো দস্যি। দেখলে বুঝতেন। স্ত্রীর শীগ-গিরি আবার বাচ্চা হবে।'

মহিলার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই গ্রসলির কথাটা সত্যি বলে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। মহিলা ভীষণ ছোট্টোখাট্টো, ছোটো ছোটো হাত পা—কিন্তু মুখটা চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ ঘোলাটে। দেখে বিষণ্ন বলে মনে হয়, তবে সেটা স্রেফ লজ্জার জন্যেও হতে পারে। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পরক্ষণেই ও একটা হুইস্কির বোতল, দুটো গ্লাস আর একটা সাইফন নিয়ে ফিরে এলো। আমি চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। ঘরের পেছন দিকে রঙ-না-করা কাঠের একটা বিভাজক। সম্ভবত ওটা অন্য একটা ঘরকে আলাদা করে রেখেছে। কোনো একটা সচিত্র সাময়িকপত্র থেকে কেটে রাখা জন গলসওয়াদির একখানা ছবি বিভাজকটার মাঝখানে পেরেক দিয়ে আট-কানো। ভেবে পেলাম না, উনি ওখানে কি করছেন। অন্য দেয়ালগুলো চুনকাম করা, কিন্তু রঙটা নোংরা, দাগ ধরানো। দেয়ালগুলোতে পেরেকে লাগানো গ্রাফিক অথবা ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজের ছবি।

'ওগুলো আমি লাগিয়েছি,' গ্রসলি বললো। 'দেখলে এ জায়গাটাকে দিব্যি

দেশের মতো মনে হয়।'

'তা গলসওয়ার্দির ছবি লাগিয়েছেন কেন? আপনি ওঁর বই পড়েন?'

'না। আমি জানতুমই না উনি বই লেখেন! আসলে ওঁর মুখটা আমার ভালো লেগে গিয়েছিলো।'

ঘরের মেঝেতে দু-একটা জীর্ণ মলিন পাটি বেছানো। এক কোণে বিশাল ডাঁই করে রাখা একগাদা হংকং টাইমস। আসবাব বলতে হাত ধোবার একটা বেসিন, রান্নাঘরে ব্যবহার্য দু-তিনটে কুর্সি, দু-একটা টেবিল আর সেগুন কাঠে তৈরি বিশাল একটা পালঙ্ক। সব মিলিয়ে আনন্দবিহীন, নোংরা, হতশ্রী পরিবেশ।

'ঘরটা মন্দ নয়, তাই না?' গ্রসলি বললো, 'আমার দিব্যি চলে যায়। মাঝে মাঝে অন্য কোথাও উঠে যাবার কথা ভেবেছি। কিন্তু কোনোদিন যাবো বলে এখন আর মনে হয় না।' লোকটা খুকখুক করে হাসলো, 'সাংহাই যাবার পথে আমি আট-চল্লিশ ঘণ্টার জন্য হাইফঙে এসেছিলুম, আর সেই থেকে পাঁচ বছর হলো এখানেই রয়ে গেছি।'

গ্রসলি চুপ করে রইলো। বলার মতো কিছু না থাকায় আমিও কিছু বললাম না। তারপর টংকিনি মহিলাটি ওকে কি একটা বললো, স্বাভাবিকভাবেই আমি তা বুঝতে পারলাম না। গ্রসলি ওকে জবাব দিয়ে ফের দু-এক মিনিট নিশ্চুপ হয়ে থাকলো। কিন্তু আমার মনে হলো ও আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন কি একটা জিগেস করতে চায়। বুঝতে পারলাম না কেন ও ইতস্তত করছে।

'প্রাচ্যে ঘুরে বেড়াবার পথে কখনও আফিং দিয়ে ধূমপান করে দেখেছেন?' শেষ পর্যন্ত যেন নিতান্ত সাধারণ ভঙ্গিতেই জানতে চাইলো লোকটা।

'হ্যাঁ, সিঙ্গাপুরে একবার দেখেছিলাম। দেখতে চেয়েছিলাম কেমন লাগে।'

'তারপর কি হলো?'

'সত্যি বলতে কি, তেমন রোমাঞ্চকর কিছু ঘটেনি। ভেবেছিলাম একটা নিদারুণ গোছের আনন্দ উপভোগ করবো, দ্য কুইন্সের মতো নানান ধরনের দৃশ্যটৃশ্য দেখবো। কিন্তু শুধুমাত্র এক ধরনের শারীরিক সুস্থতাই অনুভব করলাম—গরম বাষ্পে স্নান করে ঠাণ্ডা ঘরে শুয়ে থাকলে শরীরটাকে যেমন তাজা ঝরঝরে লাগে, অনেকটা ঠিক তেমনি। আর মনটা অদ্ভুত কর্মক্ষম হয়ে উঠেছিলো—যা কিছু ভাবছিলাম সবই যেন প্রচণ্ড স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছিলো।'

'জানি।'

'আমি সত্যি সত্যিই অনুভব করছিলাম, দুয়ে দুয়ে চার হয় এবং এ বিষয়ে বিন্দু-মাত্রও সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু পরের দিন সকালে…হে ভগবান! আমার

মাথা ঘুরতে লাগলো, আমি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লাম এবং সারাটা দিন অসুস্থ হয়েই রইলাম। বমি করতে করতে প্রাণ যায় আর কি। বমি করতে করতেই নিজেকে বলেছিলাম, এমন লোকও আছে যারা একে মজা বলে।'

গ্রসলি কুর্সিতে ঠেস দিয়ে বসে নিচু গলায় আনন্দবিহীন সুরে হাসলো, 'মনে হচ্ছে মালটা রদ্দি ছিলো। নয়তো আপনি খুব জোরে টেনেছিলেন। নয়া মাল দেখে ওরা আগে ব্যবহার করা ছিবড়েগুলো আপনাকে দিয়েছিলো। ওগুলো যে কোনো লোককেই টং করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তা এখন একবার চেষ্টা করে দেখবেন নাকি? আমার কাছে কিছুটা মাল আছে, আমি জানি সেটা ভালো জিনিস।'

'না মশাই ওই একবারই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

'আমি দু-এক ছিলিম টানলে আপনি কিছু মনে করবেন কি? এই ধরনের জল-হাওয়ায় ওটা লাগে, বুঝেছেন—আমাশয় হয় না। আর তাছাড়া সাধারণত এই সময়েই আমি একটু ধূমপান করে থাকি।'

'বেশ তো, করুন।'

গ্রসলি ফের মহিলাকে কিছু বললো এবং মহিলা গলা চড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে কাকে যেন কি বলে দিলো। কাঠের বিভাজকটার ওধারের ঘর থেকে জবাব এলো এবং দু-এক মিনিট পরে ছোট্ট একটা গোল থালা হাতে নিয়ে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এলো সেখান থেকে। ঘরে ঢুকে বৃদ্ধা আমার দিকে তাকিয়ে অনুগ্রহের হাসি ছড়ালো। গ্রসলি উঠে গিয়ে বিছানায় বসলো। বৃদ্ধা থালিটা বিছানায় নামিয়ে রাখলো। থালিটাতে একটা স্পিরিটের বাতি, একটা নল, লম্বা একটা ছুঁচ আর আফিমের ছোট্ট একটা গোল কৌটো। বৃদ্ধা বিছানায় উবু হয়ে বসলো, গ্রসলির স্ত্রীও সেখানে গিয়ে বসলো পা গুটিয়ে দেয়ালের দিকে পেছন ফিরে। গ্রসলি বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করছিলো। বৃদ্ধা সামান্য একটু আফিম ছুঁচে করে তুলে, ছুঁচটা আলোর শিখাটার ওপরে ধরলো। জিনিসটা থেকে চটচট শব্দ বেরুতেই সেটাকে ও নলটার মধ্যে গুঁজে গ্রসলির হাতে তুলে দিলো। গ্রসলি বুক ভরে সেটাকে টেনে খানিকক্ষণ ধোঁয়াটা ভেতরে ধরে রাখলো, তারপর ঘন ধূসর মেঘের মতো ধোঁয়াটা ছেড়ে দিলো একটু একটু করে। নলটা সে বৃদ্ধাকে ফিরিয়ে দিলো এবং বৃদ্ধা ফের সাজতে শুরু করলো সেটাকে। কেউ কোনো কথা বলছিলো না। পরপর তিনটে ছিলিম টেনে গ্রসলি ক্ষান্ত হলো।

'ওঃ, এখন অনেকটা ভালো লাগছে। বুড়িটা দারুণ সাজে কিন্তু। আপনি সত্যিই একবারও নেবেন না?'

'সত্যিই না।'

'আপনার যেমন ইচ্ছে। তাহলে একটু চা খান।'

গ্রসলি তার স্ত্রীকে কি একটা বলতেই মহিলা তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো এবং একটু বাদেই চীনে মাটির ছোট্ট একটা পাত্রে চা ও চীনে মাটিরই কয়েকটা বাটি নিয়ে ফিরে এলো।

'অনেকেই এখানে ধূমপান করতে আসে, বুঝেছেন। বাড়াবাড়ি না করলে এতে কোনো ক্ষতি হয় না। আমি কক্ষণো দিনে বিশ-পঁচিশ বারের বেশি টানি না। এই সীমাটা না ছাড়ালে বছরের পর বছর দিব্যি চালিয়ে যাওয়া যায়। ফরাসীদের মধ্যে কেউ কেউ দিনে চল্লিশ-পঞ্চাশ বার করে টানে। ওটা বড্ড বাড়াবাড়ি। নেহাত মাঝেসাঝে একটু বেশি টানতে ইচ্ছে করলে আলাদা কথা—তা ছাড়া আমি কক্ষণো অমন করি না। আমি বলতে বাধ্য, এতে কোনোদিন আমার কোনো ক্ষতি হয়নি।'

আমরা সেই সামান্য গন্ধওলা পাতলা টলটলে চা পান করলাম। তারপর সেই বুড়ি গ্রসলিকে ফের এক ছিলিম সেজে দিলো, তারপর আর এক ছিলিম। গ্রসলির স্ত্রী ইতিমধ্যে বিছানায় উঠে বসেছিলো, একটু বাদেই সে গ্রসলির পায়ের কাছে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। গ্রসলি একসঙ্গে দু-তিন ছিলিম টেনে নিলো। ধূমপানের সময় তার অন্য কোনো দিকে খেয়াল আছে বলে মনে হচ্ছিলো না, কিন্তু বিরতির সময়গুলোতে সে রীতিমতো বাক্যবাগীশ হয়ে উঠছিলো। বেশ কয়েকবারই আমি চলে যাবার কথা তুলেছি, কিন্তু সে আমাকে ছাড়েনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছিলো। ওর ধূমপানের সময় দু-একবার আমার ঢুলুনি এসেছিলো। ও আমাকে নিজের সমস্ত কথা বলছিলো। বকেই যাচ্ছিলো অনর্গল। আমি যেটুকু বলছিলাম তা শুধু ওকে খেই ধরিয়ে দেবার জন্যে। ও আমাকে নিজের ভাষায় যা বলেছিলো তা ফের বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একই কথা ও বারবার পুনরাবৃত্তি করছিলো। শেষের খানিকটা প্রথম দিকে, শুরুর খানিকটা শেষের দিকে—এমনি করেই বলেছিল। কাজেই পুরো কাহিনীটা আমার নিজেকেই ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে নিতে হয়েছিলো। বুঝতে পারছিলাম, মাঝে মাঝেই হয়তো বেশি বলে ফেলেছে ভেবে ও ভয় পাচ্ছিলো, কিছু কিছু কথা চেপে যাচ্ছিলো, কিছু কিছু মিথ্যে বলছিলো এবং তখন ওর মৃদু হাসি আর চোখের দৃষ্টির সাহায্যে আসল সত্যটা আমাকে কল্পনা করে নিতে হচ্ছিলো। নিজের অনুভূতি প্রকাশের ভাষা ওর ছিলো না, তাই ওর অমার্জিত অসংস্কৃত স্থূল প্রকাশভঙ্গিমা থেকে সেটা আমাকে অনুমান করে নিতে হয়েছিলো। ওর আসল নামটা আমার জিভের ডগায় আসছিলো, কিন্তু মনে আসছিলো না এবং সেটা মনে করতে না পারায় আমি বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম—যদিও সেটা কেন আমার মাথা ঘামাবার কারণ হবে, তা আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। প্রথম দিকে আমার

সম্পর্কে ও খানিকটা সন্দিগ্ধ ছিলো। বুঝতে পারছিলাম লণ্ডনে ওর কারাবাস এবং সেখান থেকে ওর পালিয়ে আসা, এতোদিন ধরে ওর কাছে একটা যন্ত্রণাদায়ক গোপন স্মৃতি হয়ে রয়েছে। আজ হোক পরে হোক, পাছে কেউ ওর সেই গোপন ইতিহাস জেনে ফেলে—সেই আতঙ্ক চিরটাকাল ওকে তাড়া করে এসেছে।

'মজার ব্যাপার! আপনি এখনও হাসপাতালে আমাকে মনে করতে পারলেন না?' গ্রেসলি ধূর্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিলো, 'আপনার স্মৃতিশক্তি নিশ্চয়ই একেবারে রদ্দিমার্কা।'

'যেতে দিন—সে সব আজ প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। ভেবে দেখুন তো, সেই থেকে আজ অব্দি কতো হাজার লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে! কাজেই আমাকে আপনার যতোটা মনে আছে, আপনাকে আমার তার চাইতে বেশি করে মনে রাখার কোনো কারণ নেই।'

'তা সত্যি। সত্যিই তেমন কোনো কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না।'

মনে হয়েছিলো আমার কথায় সে আশ্বস্ত হয়েছে। অবশেষে তার নেশা করাও শেষ হলো। বুড়িটা তখন নিজেই একটা ছিলিম সেজে ধূমপান করলো এবং তারপর মেঝেতে পেতে রাখা পাটিতে বাচ্চাটার পাশে গিয়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়লো। এমন অনড় ওর ভঙ্গিমা যে আমার মনে হলো ও শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শেষ অব্দি আমি যখন বাড়ি থেকে বেরুলাম তখন দেখি রিক্সাওলা ছেলেটা গাড়ির পাদানিতে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। এতোই গভীর তার ঘুম যে তাকে ধাক্কা মেরে জাগাতে হলো। আমার একটু ফাঁকা বাতাস এবং ব্যায়ামের প্রয়োজন ছিলো। তাই ছেলেটাকে কয়েকটা পিয়্যাসটার দিয়ে বললাম, আমি হেঁটেই যাবো।

সেদিন এক আশ্চর্য কাহিনী আমি সঙ্গে নিয়ে ফিরেছিলাম। এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে গ্রেসলির মুখে শুনেছিলাম কি ভাবে বিশটা বছর সে চীনদেশে কাটিয়েছে। কতো টাকা সে রোজগার করেছে, আমি জানি না। তবে তার কথা বলার ধরনে মনে হয়েছিলো, অঙ্কটা পনেরো থেকে বিশ হাজার পাউণ্ডের মধ্যে হবে—যেটা একটা জল-দারোগার পক্ষে বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। এতো টাকা সৎ পথে থেকে তার পক্ষে উপায় করা সম্ভব হতো না। তবে তার আচমকা বাকসংযম, বাঁকা চাহনি আর ইঙ্গিতগুলো থেকে তার কাজের যেটুকু বিশদ বর্ণনা আমি পেয়েছিলাম তাতে মনে হয়েছিলো, আফিম চোরা-চালানের সূত্রেই সে সবচাইতে বেশি রোজগার করেছিলো এবং ওই চাকরিটাই তাকে নিরাপদে ওই মুনাফা লোটার সুযোগ দিয়েছিলো। কথায় কথায় বুঝতে পেরেছিলাম, ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরা প্রায়ই গ্রেসলিকে সন্দেহ করেছে—কিন্তু তার বেআইনি কার্যকলাপ সম্পর্কে কখনই এমন

কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি, যাতে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায়। গ্রসলিকে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে বদলি করেই তাদের খুশি থাকতে হয়েছে। গ্রসলির দিকে তারা নজর রেখেছিলো, কিন্তু গ্রসলি ছিলো তাদের পক্ষে অনেক বেশি চালাক। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, বেশি কথা বলে আমার কাছে নিজের অপযশ প্রকাশ করে ফেলার আতঙ্ক এবং নিজের কুশলতা সম্পর্কে গর্ব প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা লোকটাকে দু টুকরো করে ফেলছে। তার নিজের ওপরে চীনাদের আস্থার কথা বলে গর্ব প্রকাশ করেছিলো গ্রসলি।

'ওরা জানতো, আমাকে বিশ্বাস করা যায় এবং তাতেই আমার সুবিধে হয়েছিলো।' গ্রসলি বলেছিলো, 'আর আমিও কোনোদিন কোনো চীনার সঙ্গে দু-নম্বরি করিনি।'

এই শেষের চিন্তাটা গ্রসলিকে সৎ মানুষের আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলো। চীনারা আবিষ্কার করেছিলো, সে পুরনো দিনের শিল্পস্মারকে আগ্রহী। তাই তারা মাঝে মাঝে ওই ধরনের জিনিস তাকে এনে দিতো কিংবা সে কিনবে বলে নিয়ে আসতো। জিনিসগুলো সে সস্তা দরেই কিনতো এবং কোনোদিন জানতে চাইতো না, ওগুলো তারা কোত্থেকে পেলো। কথাটা শুনেই আমার মনে পড়ে গিয়েছিলো, কিভাবে নিলামে কেনা জিনিসপত্র বাঁধা রেখে গ্রসলি তার বাণিজ্যিক কর্মজীবন শুরু করেছিলো। বিশ বছর ধরে নিকৃষ্ট কৌশল আর সামান্য প্রতারণার সাহায্যে সে একটি একটি করে পাউণ্ড জমিয়েছে এবং যা কিছু পেয়েছে তার সবই সাংহাইতে বিনিয়োগ করেছে। চাকরির অর্ধেক মাইনেও সে জমাতো, দিন কাটাতো নিতান্ত কষ্টেসৃষ্টে। কোনোদিনও সে ছুটি নেয়নি, কারণ সে তার টাকা-পয়সা নষ্ট করতে চাইতো না। চীনা মেয়েদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক হয়নি, কারণ সমস্ত রকমের ঝামেলা থেকেই সে নিজেকে মুক্ত রাখতে চাইতো। মদও খেতো না। তার একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো, ইংলণ্ডে ফিরে যাবার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করা এবং সেখানে গিয়ে এমন এক ধরনের জীবন যাপন করা যে জীবন থেকে নিতান্ত বালক বয়সেই সে বিচ্যুত হয়েছিলো। এটাই ছিলো তার একমাত্র কামনা। চীনে সে বাস করতো যেন স্বপ্নের ঘোরে। চতুর্দিকের জীবনের দিকে সে কোনো ভ্রূক্ষেপই করতো না। ওই জীবনের রঙ আর বিস্ময়, সম্ভাবনা আর অভিলাষের কোনো অর্থই ছিলো না তার কাছে। সর্বদাই তার সামনে ছিলো মরীচিকা…লণ্ডন, ক্রাইটেরিয়ন বার—যার বেষ্টনীতে পা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে নিজে, এম্পায়ার আর প্যাভিলিয়নে প্রমোদ ভ্রমণ, ইচ্ছেমতো বারাঙ্গনা বেছে নেওয়া, মিউজিক হলের নাটক আর গেইটির সংগীতময় কমেডি। সেটাই ছিলো তার কাছে প্রেম ও রোমান্সের

জীবন। সেটাই ছিলো রোমান্স। সমস্ত প্রাণমন দিয়ে সে ওই জীবনই কামনা করতো। ফের ওই ধরনের একটা স্থূল জীবন যাপনের শেষতম উদ্দেশ্য নিয়ে যেভাবে সে অতোগুলো বছর একটা সন্ন্যাসীর মতো কাটিয়ে দিলো, তা অবশ্যই মনের মধ্যে একটা ছাপ রেখে যায়। এতে একটা চরিত্র প্রকট হয়ে ওঠে।

'দেখুন মশাই,' গ্রসলি আমাকে বলেছিলো, 'ছুটিছাটায় ইংলণ্ডে যেতে পারলেও আমি যেতুম না। যতোদিন না চিরদিনের মতো যেতে পারি, ততোদিন আমি সেখানে যেতে চাইনি। তাছাড়া ব্যাপারটা আমি একেবারে কেতাদুরস্তভাবে করতে চেয়েছিলাম।'

গ্রসলি যেন দেখতে পেতো, প্রতি রাত্রে সান্ধ্য পোশাক পরে কোটের বোতাম-ঘরে একটা গার্ডেনিয়া ফুল গুঁজে সে বেরুচ্ছে। দেখতে পেতো, সে ডার্বিতে যাচ্ছে— তার পরনে একটা লম্বা ঝুলের কোট, মাথায় বাদামি রঙের টুপি, কাঁধে ঝুলছে একটা দুরবীন। দেখতো, মেয়েগুলোর দিকে একবার অবহেলায় তাকিয়ে সে পছন্দমতো মেয়েটিকে তুলে নিচ্ছে। সে স্থির করেছিলো, লণ্ডনে পৌছে সেই রাতেই সে মাতাল হবে। বিশ বছর সে মদ খায়নি। সে যা চাকরি করে, তাতে তার পক্ষে মদ খাওয়া সম্ভব নয়। নিজের ব্যাপারে নিজেকেই মাথার ঠিক রাখতে হয়। তাকে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে দেশে যাবার পথে জাহাজে সে মাতাল না হয়। লণ্ডনে গিয়ে নামা অব্দি সে অপেক্ষা করে থাকবে। তারপর কি একখানা রাতই না কাটাবে সে! বিশ বছর ধরে গ্রসলি সেই রাতটার কথা চিন্তা করেছে।

আমি জানি না, গ্রসলি কেন শুল্ক বিভাগের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলো—সে কি জায়গাটা তার পক্ষে অত্যধিক বিপজ্জনক হয়ে উঠছিলো বলে, নাকি সে চাকরি-জীবনের শেষ সীমায় পৌছে গিয়েছিলো বলে, নাকি তার উদ্দিষ্ট টাকাটা জমানো হয়ে গিয়েছিলো বলে। তবে শেষ অব্দি সে জাহাজে চাপলো। দ্বিতীয় শ্রেণীতে। কারণ লণ্ডনে পৌছুবার আগেই খরচ শুরু করার বাসনা তার ছিলো না। জারমিন স্ট্রীটে সে ঘর নিলো, কারণ চিরটা কাল সে ওই অঞ্চলেই বাস করতে চেয়েছে। তারপর সোজা দর্জির দোকানে গিয়ে নিজের জন্যে একটা পোশাকের ফরমাস দিলো। তারপর শহরটাকে দেখে নিলো এক চক্কর। তার যেমনটি মনে ছিলো, শহর তার চাইতে অনেক বদলে গেছে। রাস্তায় অনেক যানবাহন। গ্রসলি একটু বিভ্রান্ত, যেন খানিকটা বিহ্বল। ক্রাইটেরিয়নে গিয়ে সে দেখলো, একদিন তারা যেখানে আলস্যে সময় কাটিয়েছে, মদ্যপান করেছে—এখন সেখানে আর কোনো পানশালা নেই। লিসেস্টার স্কোয়ারে একটা রেস্তোরাঁ ছিলো, হাতে পয়সাকড়ি এলে গ্রসলি সেখানে রাতের খানা সারতে যেতো। কিন্তু এবারে সেই দোকানটাকে সে খুঁজেই

পেলো না। ধরে নিলো, দোকানটাকে মুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। প্যাভেলিয়ানে গিয়ে দেখলো, সেখানে কোনো মেয়েমানুষ নেই। খানিকটা বিরক্ত হয়ে গ্রসলি তখন এম্পায়ারে গিয়ে ছাখে, বেড়াবার জায়গাটাও তুলে দেওয়া হয়েছে। এটা একটা আঘাতই বটে। গ্রসলি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলো না। যাই হোক, বিশ বছরের পরিবর্তনের জন্যে তাকে তৈরি থাকতেই হবে। আর কিছু করতে না পারলেও মদ সে খেতে পারে। চীনে থাকতে তার বেশ কয়েকবার জ্বর হয়েছিলো, এবারে জল-হাওয়ার পরিবর্তনে ফের জ্বরটা এলো। শরীরটা তেমন জুত লাগছিলো না। চার-পাঁচটা পানীয় গিলে সে খুশি হয়েই শুতে চলে গেলো।

কিন্তু প্রথম দিনটা ছিলো পরবর্তী দিনগুলোর একটা নমুনামাত্র। গ্রসলির সমস্ত কিছুই কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেলো। একের পর এক সমস্ত কিছুতেই সে কি-ভাবে বিফল হয়েছিলো তা আমাকে বলতে গিয়ে গ্রসলির কণ্ঠস্বর খিটখিটে ও তিক্ত হয়ে উঠেছিলো। পুরনো জায়গাগুলো নেই, লোকজন সব বদলে গেছে। গ্রসলি দেখলো কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করাও শক্ত, সে একেবারে আশ্চর্য রকমের নিঃসঙ্গ। লণ্ডনের মতো একটা বিরাট শহরে এমনটা হবে বলে সে কোনোদিনই আশা করেনি এবং গোলমালটা ছিলো সেখানেই। ইতিমধ্যে লণ্ডন অনেক বড়ো হয়ে উঠেছিলো, লণ্ডন তখন আর সেই আনন্দময় অন্তরঙ্গ শহরটি নেই যেমনটি ছিলো উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে। সে লণ্ডন এতোদিনে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সে কয়েকটি মেয়েমানুষের সংসর্গ করলো, কিন্তু এরা তার চেনা সেই আগেকার মেয়ে-মানুষদের মতো ততো ভালো নয়। এরা তেমন মজা করতে জানে না। তা ছাড়া গ্রসলির কেমন যেন মনে হলো, এরা তাকে একটা অদ্ভুত ধরনের আশ্রয়স্থল বলে মনে করছে। তার বয়স সবে চল্লিশ ছাড়িয়েছে, অথচ এরা তাকে মনে করছে একটা বুড়ো। একটা পানশালাকে ঘিরে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন অল্পবয়সী যুবকের সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করেছিলো গ্রসলি, কিন্তু ছেলেগুলো তাকে পাত্তাই দিলো না। যাকগে, ছেলেছোকরারা জানে না কি করে মাল টানতে হয় —গ্রসলি ওদের তা দেখিয়ে দেবে। প্রতি রাত্রে সে মদে ডুবে থাকতে লাগলো—ওই হতচ্ছাড়া জায়গাটায় একমাত্র এ কাজটাই করা যায়। কিন্তু তাতে পরের দিন-গুলোতে তার ভীষণ শরীর খারাপ হতে থাকে। গ্রসলি ভাবলো চীনের জল হাওয়াই এ জন্যে দায়ী। ডাক্তারী পড়ার সময় সে প্রতি রাত্রে এক বোতল করে হুইস্কি টানতে পারতো এবং তা সত্ত্বেও পরদিন সকালে সে থাকতো একটা ভোরের ডেইজির মতো তাজা। এবারে সে চীনের কথা বেশি করে ভাবতে শুরু করলো। যে সমস্ত জিনিস সে কোনোদিন লক্ষ্য করেছে বলে জানতোই না, সেগুলোই তার কাছে

ফিরে ফিরে আসতে লাগলো। চীনে তার জীবনটা তেমন মন্দ ছিলো না। হয়তো ওই চীনে মেয়েগুলোর কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে সে বোকামোই করেছে। ওই ছোটোখাটো মেয়েগুলোর মধ্যে কয়েকজন তো দিব্যি সুন্দরী ছিলো! ওরা এই ইংরেজ মেয়েছেলেগুলোর মতো এমন ভণ্ডামি করতো না। তার মতো এতো টাকা-পয়সা থাকলে চীনে রীতিমতো ভালোভাবে সময় কাটানো যায়। একটা চীনা মেয়েকে রক্ষিতা রাখা যায়, ক্লাবে যাওয়া যায়, ক্লাবে গিয়ে সুরা পান বা ব্রিজ আর বিলিয়ার্ড খেলার জন্যে অনেক ভালো সঙ্গী পাওয়া যায়। চীনের রাস্তাগুলোতে সারি বাঁধা দোকান আর মাল বয়ে নিয়ে চলা কুলি, চীনা নৌকোয় বোঝাই বন্দর আর দুই তীরে প্যাগোডার শোভাময় নদীগুলোর কথা মনে পড়তো গ্রসলির। মজার কথা হচ্ছে, চীনে থাকার সময় ওখানকার কথা সে তেমন করে ভাবেনি—আর এখন চীনের চিন্তা সে মন থেকে দূর করতে পারছে না। চিন্তাটা তার মনকে আবিষ্ট করে রেখেছে। সে ভাবতে শুরু করলো, লণ্ডন শ্বেতাঙ্গদের উপযুক্ত জায়গা নয়। অল্প কথায় বলা যায়, লণ্ডন স্রেফ গোল্লায় গেছে। একদিন হঠাৎ তার মনে হলো, হয়তো চীনে ফিরে গেলেই ভালো হয়। চিন্তাটা অবশ্যই অর্থহীন। কারণ লণ্ডনে মেজাজে দিন কাটাতে পারবে বলেই সে বিশটা বছর ক্রীতদাসের মতো হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছে, তাই এখন ফের চীনে গিয়ে বাস করার চিন্তাটাই অবাস্তব। তার যা টাকা-পয়সা, তাতে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় মনের আনন্দে থাকতে পারার কথা। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, সে চীন ছাড়া অন্য কোনো জায়গার কথা ভাবতে পারছিলো না। একদিন সে সিনেমা দেখতে গিয়ে, তাতে সাংহাইয়ের একটা দৃশ্য দেখলো: তখনই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললো সে। লণ্ডনের ওপরে তার বিরক্তি ধরে গিয়েছিলো। লণ্ডনকে এখন সে ঘেন্না করে। এখান থেকে সে চলে যাবে এবং এবারে চিরদিনের মতোই যাবে। দেড় বছর ধরে সে দেশে রয়েছে, কিন্তু তার মনে হচ্ছিলো, প্রাচ্যে কাটানো বিশটা বছরের চাইতেও এই সময়টা যেন বেশি দীর্ঘ। মার্সাই থেকে একটা ফরাসী জাহাজে টিকিট কিনলো গ্রসলি এবং যখন দেখলো ইউরোপের তটরেখা সমুদ্রে ডুবে গেছে তখন সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। জাহাজ যখন সুয়েজে ঢুকলো, যখন গ্রসলি প্রাচ্যের প্রথম স্পর্শ অনুভব করলো—তখন তার মনে হলো সে ঠিকই করেছে। ইউরোপ শেষ হয়ে গেছে। প্রাচ্যই এখন একমাত্র জায়গা।

গ্রসলি জিবুতিতে জাহাজ থেকে নেমেছিলো। কলম্বো আর সিঙ্গাপুরেও নেমেছিলো কিন্তু জাহাজ যখন দুদিনের জন্যে সাইগনে লাগলো তখন সে জাহাজ থেকে নামলো না। কদিন ধরে সে ভালো পরিমাণেই মদ গিলছিলো। তাছাড়া ওই আব-

হাওয়ায় তার শরীরটাও ঠিক সুবিধের লাগছিলো না। হাইফঙে জাহাজ আটচল্লিশ ঘণ্টা থাকবে। গ্রসলি ভাবলো, জায়গাটা একটু দেখে এলে হয়। চীনে পৌঁছুবার আগে এটাই জাহাজের শেষ বিরতি। গ্রসলির গন্তব্যস্থল সাংহাই। সে ঠিক করেছিলো, ওখানে পৌঁছে প্রথমে সে একটা হোটেলে উঠবে। তারপর কিছুদিন জায়গাটা একটু ঘুরেফিরে দেখবে, একটা মেয়েমানুষ জোটাবে এবং নিজস্ব একটা বাড়িরও ব্যবস্থা করবে। ঘোড়দৌড়ের জন্যে সে দু-একটা টাট্টু ঘোড়া কিনবে। বন্ধু-বান্ধবও জুটে যাবে শীগগিরি। লণ্ডনের মতো প্রাচ্যের মানুষ অমন আড়ষ্ট আর ছাড়া-ছাড়া হয় না। হাইফঙে জাহাজ থেকে নেমে সে একটা হোটেলে গিয়ে রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে নিলো। তারপর একটা রিক্সায় চেপে রিক্সাওলাকে বললো, সে একটি মেয়েমানুষ চায়। রিক্সাওলা তখন তাকে একটা নোংরা মলিন ভাড়াটে বাড়িতে নিয়ে এলো —ওই বাড়িতেই সেদিন আমি অতোগুলো ঘণ্টা গ্রসলির কাছে বসেছিলাম, ওখানেই ছিলো সেই বৃদ্ধা আর ওই মহিলাটি—যে এখন গ্রসলির সন্তানের মা। সেদিন কিছুক্ষণ বাদে বৃদ্ধা গ্রসলিকে জিগেস করেছিলো, সে ধূমপান করতে চায় কি না। গ্রসলি আগে কখনও আফিমের নেশা করেনি, আফিম সম্পর্কে তার চিরদিনই ভয়। কিন্তু তখন সে নেশাটা শুরু না করার কোনো কারণ দেখতে পায়নি। সেদিন রাতে ব্যাপারটা তার ভালোই লেগেছিলো। মেয়েটাও ছিলো জাপটাজাপটি করে রাখার মতো জিনিস—অনেকটা চীনা মেয়েদের মতো দেখতে, ছোটোখাটো, সুন্দর, পুতুল-পুতুল গড়ন। সারারাত গ্রসলি সেখানেই রইলো। ঘুমোয়নি—শুধু শুয়ে-ছিলো চুপচাপ, অনুভব করছিলো বিশ্রামের আয়েস আর ভাবছিলো নানান কথা।

'আমার জাহাজটা হংকং রওনা হওয়া অব্দি আমি ওখানেই ছিলুম,' গ্রসলি বলেছিলো। 'আর জাহাজটা যখন ছেড়ে গেলো, তখনও রয়েই গেলুম।'

'আপনার মালপত্র?'

মানুষ বাস্তবের পুঙ্খানুপুঙ্খতার সঙ্গে জীবনের আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গিমাকে যেভাবে মিশিয়ে ফেলে, আমি হয়তো তাতে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারি না। কোনো উপন্যাসে কপর্দকহীন প্রেমিকযুগল যখন দ্রুতগামী দৌড়বাজ মোটরগাড়িতে চেপে দূরের পাহাড়গুলোকে পেরিয়ে অনেক দূরের পথে বেরিয়ে পড়ে তখন সর্বদাই আমার জানতে ইচ্ছে হয়, কি করে ওরা এর খরচ মেটালো। প্রায়ই আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি, হেনরি জেমসের চরিত্রগুলো সূক্ষ্মভাবে নিজেদের পরিস্থিতি বিচার করে নেবার অবকাশে কিভাবে শরীরের জৈবিক প্রয়োজনগুলোর সঙ্গে সফল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলে।

'আমার শুধুমাত্র পোশাক-আশাকে ভরা একটা তোরঙ্গ ছিলো। পরনেরটা বাদে

খুব বেশি পোশাকের চাহিদা আমার কোনোদিনই নেই। মেয়েটিকে নিয়ে একটা রিক্সায় চেপে আমি তোরঙ্গটা আনতে গেলুম। ভেবেছিলুম, পরের জাহাজটা আসা অব্দিই আমি হাইফঙে থাকবো। চীনের এতো কাছাকাছি এসে, বুঝলেন কিনা—আমি ভেবেছিলুম, ফের রওনা হওয়ার আগে আমি সব ব্যাপারে একটু অভ্যস্ত হয়ে নেবো। আশা করি আমি কি বলতে চাইছি, আপনি বুঝেছেন।'

আমি বুঝেছিলাম। ওর শেষ কথাকটা ওকে আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিলো। আমি বুঝতে পেরেছিলাম চীনের দোরগোড়ায় এসেও সাহস খুইয়ে ফেলেছিলো। ইংলণ্ড ওকে এমন হতাশ করেছিলো যে চীনকেও সেই পরীক্ষায় আনতেও ভয় পাচ্ছিলো। সেটা বিফল হলে ওর আর কিছুই থাকবে না। বহু বছর ধরে ইংলণ্ড ওর কাছে ছিলো মরুভূমির বুকে মরীচিকার মতো। কিন্তু সেই আকর্ষণের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে সে বুঝতে পেরেছিলো ওই ঝিলমিলে জলাশয়, তালগাছ আর সবুজ ঘাসগুলো আসলে ঢেউ-দোল বালিয়াড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। চীনকে সে পেয়েছিলো এবং যতোদিন ফের সে চীন না দেখবে, ততোদিন সেই স্মৃতিটাই তার সম্পদ হয়ে থাকবে।

'যে কোনো কারণেই হোক, আমি থেকে গেলুম। এখানে দিনগুলো যে কতো তাড়াতাড়ি কেটে যাচ্ছে, আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমি যা যা করতে চাই, তার অর্ধেক কাজ করার মতো সময়ও যেন পাই না। আর যাই হোক, এখানে আমি দিব্যি স্বচ্ছন্দে আছি। বুড়িটা ভারি চমৎকার ছিলিম সাজে আর ওই মেয়েটা—আমার বউ—বেশ হাসিখুশি। তাছাড়া বাচ্চাটা আছে। একটা চনমনে গুণ্ডা। কোনো একটা জায়গায় সুখে থাকলে, ফের অন্য জায়গায় গিয়ে কি লাভ?'

আমি আসবাবহীন অপরিচ্ছন্ন বিশাল ঘরটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। ঘরটাতে ব্যক্তিগত ছোটোখাটো এমন একটা জিনিসও নেই যা গ্রসলিকে গৃহের অনুভূতি দিতে পারে। গ্রসলি এই সন্দেহজনক বাড়িটায় রয়েছে, যেটা অবৈধ যৌন মিলন এবং ইউরোপীয়দের আফিম সেবনের জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ওই বুড়িটা এখানে দেখাশুনো করে। গ্রসলি এখানে ঠিক বাস করে না, অস্থায়ীভাবে থাকে—এখনও আছে, যেন পরের দিনই এই ফাঁদ কেটে সে চলে যাবে।

একটু বাদে গ্রসলি আমার প্রশ্নটার জবাব দিলো।

'জীবনে আমি কোনোদিনও এতো সুখী ছিলুম না। প্রায়ই ভাবি এবারে একদিন সাংহাইতে চলে যাবো, কিন্তু কোনোদিনই তা করবো বলে মনে হয় না। তবে ঈশ্বর জানেন, আর কোনোদিনও আমি ইংলণ্ডে যেতে চাই নে।'

'কথা বলার মতো লোকের অভাবে কোনোদিন কি আপনার নিজেকে ভয়ানক

নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় না ?'

'না। মাঝে-মধ্যে এক-আধটা মালবাহী চীনা জাহাজ আসে। হয়তো তার ক্যাপটেন ইংরেজ কিংবা এঞ্জিনিয়ার একজন স্কচ। তখন আমি জাহাজে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে পুরনো দিনের কথা আলোচনা করি। এখানে একজন ফরাসী বৃদ্ধ আছেন, শুল্ক বিভাগে কাজ করতেন। উনি ইংরেজী ভাষায় কথাবার্তা বলেন। কথনও-সখনও আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গেও দেখা করি। কিন্তু আসলে আমি কাউকেই তেমন করে চাইনে। আমি অনেক কিছু চিন্তা করি, ভাবি। আমি আর আমার ভাবনাগুলোর মাঝখানে কেউ এসে দাঁড়ালে আমার স্নায়ুগুলো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আপনি তো জানেন, আমি খুব একটা ছিলিম টানি না। পেটটাকে ঠিক রাখতে সকালে শুধু দু-একটা ছিলিম—ব্যাস। তবে রাত অব্দি আমি কোনোদিনই ধূমপান করি না। তখন আমি চিন্তা করি।'

'কিসের চিন্তা করেন ?'

'সব রকমের। মাঝে মাঝে লণ্ডনের কথা ভাবি—ভাবি, আমার ছোটবেলায় লণ্ডন কেমন ছিলো। তবে অধিকাংশ সময়েই চীনের কথা ভাবি। ভাবি আমার অতীতের সুসময়ের কথা। কি ভাবে আমি টাকা-পয়সা করেছি—সে সব কথা। তখন যে সমস্ত মানুষকে আমি চিনতুম, তাদের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে চীনাদের কথা। কখনও কখনও আমি খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি, তবে সব সময়েই নিরাপদে বেরিয়ে এসেছি। ভাবি, যে সমস্ত মেয়েদের আমি পেতে পারতুম, তাদের স্বাদ কেমন। ওরা এক-একটা ছোট্টোখাট্টো খুবসুরৎ চীজ। ওদের দু-একটাকে রাখিনি বলে এখন দুঃখ হয়। চীন একটা মহান দেশ। ওখানকার দোকানপাট, দোকানে গোড়ালিতে ভর রেখে বসে হুঁকো টানতে থাকা বুড়ো মানুষ আর সাইনবোর্ড-গুলোকে আমি ভালোবাসি। আর ভালোবাসি ওখানকার মন্দিরগুলোকে। সত্যি বলছি, পুরুষ মানুষের পক্ষে ওটাই হচ্ছে বাস করার মতো জায়গা। ওখানে প্রাণ আছে।'

মরীচিকাটা গ্রসলির চোখের সামনে ঝিকমিকিয়ে ওঠে। অলীক মোহটা ওকে ধরে রেখেছে। এখন ও সুখী। ভেবে পেলাম না, কি ওর পরিণতি। কিন্তু তা এখনও আসেনি। ওর জীবনে হয়তো এই প্রথম, বর্তমানকে ও নিজের হাতে ধরে রেখেছে।

'তুমি ম্যাকারনী পছন্দ করো ?' র—প্রশ্ন করলেন।

'ম্যাকারনী বলতে ?' অ্যাশেনডেন বললো, 'এ যেন জিগেস করা হলো, আমি কবিতা পছন্দ করি কি না। হ্যাঁ, আমি কিটস ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভারলেইন আর গ্যয়টে পছন্দ করি। ম্যাকারনী বলতে আপনি কি স্পাগেত্তি, তাগলিয়াতেল্লি, ভারমিচেল্লি, ফেত্তুসিন্নি, তুফালি বা ফারফাল্লি বলতে চাইছেন—না কি স্রেফ ম্যাকারনী ?'

'ম্যাকারনী,' অল্প কথার মানুষ র—জবাব দিলেন।

'আমি সমস্ত সাদাসিধে জিনিস—যেমন ডিম সেদ্ধ, ঝিনুক আর ক্যাভিয়ার, ট্রাউট মাছ, ভাজা স্যামন, ঝলসানো ভেড়া (পিঠের পেছন দিকটা হলে ভালো হয়), জংলী হাঁস, ফলের চাটনি আর পুডিং—এসব ভালোবাসি। কিন্তু সব কটা সাদাসিধে খাবারের মধ্যেও যেটা আমি বিনা বিরক্তিতে দিনের পর দিন দিব্যি আগ্রহ নিয়ে খেয়ে যেতে পারি, সেটা হচ্ছে ম্যাকারনী।'

'শুনে খুশি হলাম, কারণ আমি তোমাকে ইতালিতে পাঠাতে চাই।'

র—য়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে অ্যাশেনডেন জেনেভা থেকে লিয়ঁতে এসেছে এবং র—য়ের আগেই এখানে এসে পৌছনোয় সারা বিকেলটা সে এই বর্ধিষ্ণু শহরের একঘেয়ে, ব্যস্তসমস্ত, নীরস গন্ধময় পথেঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। এখন ওরা প্লাসের একটা রেস্তোরাঁয় বসে রয়েছে। র—এসে পৌছনোর পর অ্যাশেনডেন তাঁকে এখানেই নিয়ে এসেছে, কারণ ফ্রান্সের এই অঞ্চলে সেরা খাবার পরিবেশন করার জন্যে এদের সুনাম আছে। কিন্তু এখানে এতো ভিড় (কারণ লিয়ঁবাসীরা ভালো খাবার পছন্দ করে) যে বোঝা শক্ত, ঠোঁট থেকে খসে পড়া কোন প্রয়োজনীয় তথ্যটা কার কৌতূহলী কানে গিয়ে ঢুকবে। তাই এতোক্ষণ ওরা এলোমেলো গতানুগতিক কথাবার্তা বলেই খুশি থেকেছে, মনোমতো খাওয়াদাওয়াটাও এবারে সমাপ্তির সীমায় গিয়ে পৌছেছে।

'আর এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি নেবে ?' র—জিগেস করলেন।

'না, ধন্যবাদ,' পানাহারে মিতাচারী অ্যাশেনডেন জবাব দিলো।

'যুদ্ধের তীব্রতা প্রশমনের জন্যে প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত,' বোতলটা নিয়ে র—নিজের এবং অ্যাশেনডেনের জন্যে ফের এক গ্লাস করে মদ ঢেলে নিলেন।

প্রতিবাদ জানানোটা কৃত্রিম আচরণের সামিল হবে মনে করে অ্যাশেনডেন কিছু

বললো না। কিন্তু বড়ো সাহেব যে রকম অশোভনভাবে বোতলটা ধরেছেন, তাতে তীব্র আপত্তি জানানো উচিত বলে মনে হলো তার।

'তরুণ বয়সে আমাকে সর্বদা শেখানো হতো, মেয়েদের কোমর এবং বোতলের গলা ধরে নেওয়া উচিত,' অ্যাশেনডেন অস্ফুটে বললো।

'কথাটা তুমি বললে বলে খুশি হলাম। তবে আমি কোমর ধরেই বোতল তুলবো এবং মেয়েদের ধরবো ঘাড়।'

এ কথার কি জবাব হতে পারে তা ভেবে না পেয়ে অ্যাশেনডেন নীরবে ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিলো। র—বিল আনতে বললেন। এ কথা সত্যি যে উনি একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, বহু সংখ্যক সহকর্মীকে দাঁড় করাবার বা ধ্বংস করাবার মতো ক্ষমতা ওঁর আছে এবং এ সাম্রাজ্যে ভাগ্যের রশি যাঁদের হাতে তাঁরা ওঁর মতামতের মূল্য দিয়ে থাকেন —কিন্তু রেস্তোর্াঁর পরিচারকদের বকশিশ দিতে গেলেই উনি বিব্রত হয়ে ওঠেন এবং সেটা ওঁর হাবভাবে একেবারে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। অতিরিক্ত বেশি কিংবা অত্যন্ত কম বকশিশ দিয়ে আহাম্মক হওয়া অথবা পরিচারকের হিমেল অবজ্ঞা জাগিয়ে তোলার আতঙ্ক ওঁকে সর্বদা পীড়ন করে। তাই বিলটা আসতেই উনি একশো ফ্রাঁর কয়েকটা নোট অ্যাশেনডেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'মিটিয়ে দাও। ফরাসী অঙ্ক আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।'

রেস্তোর্াঁর নির্দিষ্ট কর্মচারীটি ওদের টুপি আর কোট নিয়ে এলো। অ্যাশেন-ডেন জিগেস করলো, 'আপনি কি এখন হোটেলে ফিরতে চান?'

'তুজনেই যাওয়া যায়।'

বছরের প্রথম দিক হলেও হঠাৎ বেশ গরম পড়ে গেছে। কোট তুটো ওরা হাতে ঝুলিয়ে হাঁটতে লাগলো। র—বৈঠকখানা ঘর পছন্দ করেন বলে অ্যাশেনডেন ওঁর জন্যে হোটেলে সেই রকম বন্দোবস্তই করে রেখেছিলো। হোটেলে পৌঁছে ওরা সেই বৈঠকখানা ঘরেই গিয়ে ঢুকলো। হোটেলটা সাবেকি আমলের, বৈঠকখানাটা মস্তো বড়ো। ঘরে মেহগনি কাঠের ভারি ভারি আসবাব, সোফাগুলো সবুজ মখমলে মোড়া। একটা বিশাল টেবিলের চারদিকে কুর্সিগুলো গোল করে সাজানো। নোংরা কাগজে মোড়া দেয়ালে ইস্পাতে খোদাই করা নেপোলিয়নের যুদ্ধ জয়ের বিশাল ছবি। ছাদ থেকে ঝুলছে প্রকাণ্ড একটা ঝাড় লণ্ঠন—এক সময় ওটাতে গ্যাসের বাতি জ্বলতো, কিন্তু এখন ওতে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো। নিরানন্দ ঘরটাতে কর্কশ আলোর শীতল বন্যা।

'ভারি সুন্দর ঘর,' ভেতরে ঢুকে র—বললেন।

'তবে ঠিক আরামদায়ক নয়।'

'না। তবে দেখে শুনে মনে হচ্ছে, এখানকার সেরা ঘর। আমার তো খুব ভালোই লাগছে।'

টেবিলের কাছ থেকে একটা সবুজ মখমলের কুর্সি টেনে এনে, তাতে বসে র— একটা চুরুট ধরালেন। তারপর কোমরবন্ধটা ঢিলে করে টিউনিকের বোতামগুলো খুলে ফেললেন।

'চিরদিনই আমার ধারণা, অন্য যে কোনো জিনিসের তুলনায় চুরুট আমার বেশি পছন্দ। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে হাভানাগুলো আমার দিব্যি ভালো লাগছে। তবে কিনা যুদ্ধ চিরস্থায়ী হতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস।' একটা মৃদু হাসির সূচনায় র—য়ের ঠোটের প্রান্ত দুটি কেঁপে কেঁপে উঠলো, 'যুদ্ধের অলক্ষুণে বাতাস কারুর কোনো ভালো করে না।'

অ্যাশেনডেন দুটো কুর্সি টেনে, একটাতে বসে অন্যটাতে পা তুলে দিলো। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে র—বললেন, 'মতলবটা মন্দ নয়।' তারপর টেবিলের কাছ থেকে অন্য একটা কুর্সি টেনে নিয়ে, তাতে নিজের জুতোসুদ্ধ পা দুটো তুলে দিলেন।

'পাশের ঘরটা কিসের?' জিগেস করলো অ্যাশেনডেন।

'ওটা তোমার শোবার ঘর।'

'আর অন্য দিকেরটা?'

'ওটা ভোজ-উৎসবের হলঘর।'

কুর্সি ছেড়ে উঠে র—ধীরেসুস্থে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করলেন। জানলার কাছ দিয়ে যাবার সময় যেন অলস কৌতুহলেই উনি ভারি পর্দাগুলোর ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে একটু উঁকি মেরে দেখলেন। তারপর ফের এসে কুর্সিতে বসে আরাম করে পা দুটো তুলে রাখলেন।

'এটা করার কারণ হচ্ছে, কারুরই প্রয়োজনের চাইতে বেশি ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়।' র—চিন্তিত দৃষ্টিতে অ্যাশেনডেনের দিকে তাকালেন। ওঁর পাতলা ঠোঁট দুটিতে মৃদু হাসির রেখা, কিন্তু কাছাকাছি বসানো ফ্যাকাশে চোখ দুটো আগের মতোই শীতল আর কঠিন। অভ্যস্ত না হলে র—য়ের এই দৃষ্টি অ্যাশেন-ডেনের কাছে বিব্রতকর বলে মনে হতো। কিন্তু অ্যাশেনডেন জানে, মনের কথাটা কি করে বলতে শুরু করা যায়—উনি এখন তা ই ভাবছেন। দু-তিন মিনিট এমনি চুপচাপ থাকার পর অবশেষে উনি বললেন, 'আমি আশা করছি, আজ রাতে একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। দশটা নাগাদ তার ট্রেন এখানে এসে পৌছুবে।' হাতঘড়ির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন উনি, 'লোকটা নির্লোম মেক্সিকান বলে পরিচিত।'

'কেন ?'

'কারণ তার লোম নেই এবং সে মেক্সিকান।'

'ব্যাখ্যাটা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলেই মনে হচ্ছে,' অ্যাশেনডেন বললো।

'নিজের সম্পর্কে সমস্ত কথাই সে তোমাকে বলবে। লোকটা প্রচণ্ড বকে। যখন প্রথম দেখা হয়, তখন ও প্রচণ্ড আর্থিক দুর্গতির মধ্যে ছিলো। মনে হয় ও মেক্সিকোতে কোনো বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলো এবং সেখান থেকে পালাবার সময় পরনের পোশাকটা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসতে পারেনি। আমি ওকে যখন দেখি, তখন ওর পোশাকটাও ব্যবহারের উপযুক্ত ছিলো না। খুশি করতে চাইলে ওকে তুমি জেনারেল বলে ডেকো। ও হুয়ের্তার বাহিনার একজন জেনারেল ছিলো বলে দাবী করে।···অন্তত আমার ধারণা, লোকটার নাম হুয়ের্তা। যাই হোক, ওর বড়ো বড়ো বক্তার আর শেষ নেই—বলে, সবকিছু ঠিকমতো চললে এতোদিনে ও নাকি যুদ্ধমন্ত্রী হয়ে যেতো! লোকটা খারাপ নয়, ওকে আমার বেশ দরকারী বলেই মনে হয়েছে। সত্যি বলতে কি ওর বিরুদ্ধে আমার একটাই অভিযোগ, ও সুগন্ধি ব্যবহার করে।'

'তা এখানে আমি আসছি কি করে?' অ্যাশেনডেন শুধালো।

'ওই লোকটা ইতালিতে যাবে। আমি ওর জন্যে একটা কঠিন কাজ রেখেছি এবং আমার ইচ্ছে, তুমিও ওর সঙ্গে থাকবে। বেশি টাকাকড়ির ব্যাপারে ওর ওপরে আস্থা রাখতে আমি খুব একটা আগ্রহী নই। লোকটা জুয়াড়ি, নারীসঙ্গ করতে ভীষণ ভালোবাসে।···তুমি জেনেভা থেকে অ্যাশেনডেনের পাসপোর্টে এসেছো বোধ হয়?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তোমার জন্যে আর একটা পাসপোর্ট করিয়ে রেখেছি। সামারভিলের নামে কূটনৈতিক পাসপোর্ট, সঙ্গে ফ্রান্স ও ইতালির ভিসা। তোমরা দুজনে একসঙ্গে গেলেই ভালো হয়। একবার চলতে থাকলে, লোকটা দারুণ মজার। আমার মনে হয়, তোমাদের পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে রাখা উচিত।'

'কাজটা কি?'

'তা তোমাকে জানানো কতোখানি উচিত হবে, সে সম্পর্কে আমি এখনও ঠিক মনস্থির করিনি।'

অ্যাশেনডেন কোনো জবাব দিলো না। এক নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো দুজনে, যেন ওরা রেলের একই কামরায় বসে থাকা দুটি অপরিচিত যাত্রী—দুজনেই ভাবছে অন্য ব্যক্তিটি কে, কি তার পরিচয়।

'তোমার জায়গায় হলে, আমি ওই জেনারেলকেই অধিকাংশ কথাবার্তা বল
দিতাম। নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টুকু ছাড়া নিজের সম্পর্কে তাকে আর কি
বলতাম না। আমি কথা দিতে পারি, সে তোমাকে কোনো প্রশ্ন করবে না এবং
আমার ধারণা, তার নিজস্ব রীতি অনুসারে সেদিক দিয়ে সে একজন ভদ্রলোক।'

'লোকটার আসল নাম কি?'

'আমি সব সময় তাকে ম্যানুয়েল বলে সম্বোধন করি। সেটা সে খুব একটা
পছন্দ করে কিনা জানি না, তবে তার নাম ম্যানুয়েল কারমোনা।'

'আপনি যা বলেননি তার থেকে আমি বুঝতে পারছি, লোকটা একটা পুরো-
দস্তুর বদমাশ।'

হালকা নীলরঙা চোখ দুটো নিয়ে র—মৃদু হাসলেন, 'ঠিক অতোদূর আর
যাওয়া উচিত হবে কিনা জানি না। লোকটা সরকারী স্কুলে লেখাপড়া করার সুযোগ
পায়নি। খেলা সম্পর্কে ওর ধারণা ঠিক তোমার বা আমার মতো নয়। ও কাছে-
পিঠে থাকলে আমি আমার সোনার সিগারেট কেসটা হাতের সামনে ফেলে রাখবো
কিনা জানি না। তবে পোকার খেলায় ও যদি তোমার কাছে টাকা হারে এবং
তোমার সিগারেট কেসটা ও যদি হাতিয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে ও সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে
বাঁধা রেখে তোমার ধার শোধ করে দেবে। সামান্য সুযোগ পেলেই ও তোমার স্ত্রীকে
পটিয়ে ফেলবে। কিন্তু তুমি তখন রুখে দাড়ালে ও নিজের শেষ সম্বলটুকুও তোমার
সঙ্গে ভাগ করে নেবে। গ্রামোফোনে গোনদের আভ মারিয়া শুনলে ওর দু গাল
বেয়ে চোখের জল নেমে আসবে, কিন্তু ওকে অপমান করলে ও তোমাকে কুকুরের
মতো গুলি করে মারবে। শোনা যায়, মেক্সিকোতে কোনো পুরুষ মানুষ এবং তার
মদের পাত্রের মাঝখানে গিয়ে দাড়ানোটা নাকি অপমানজনক। ম্যানুয়েল নিজে
আমাকে বলেছে, একবার একজন ওলন্দাজ না জেনে তার এবং একটা পানশালার
মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলো বলে সে তৎক্ষণাৎ রিভলভার বের করে তাকে গুলি করে
মেরে ফেলে।'

'তাতে ওর কিছুই হয়নি?'

'না। মনে হয় ও কোনো বড়ো ঘরের ছেলে। তাই ব্যাপারটা চেপে যাওয়া
হয় এবং পত্রিকাগুলোতে লেখা হয়, ওলন্দাজটা আত্মহত্যা করেছে। বাস্তবিক পক্ষে
ব্যাপারটা কিন্তু তা-ই। মানুষের জীবন সম্পর্কে নির্লোম মেক্সিকানটির খুব একটা
শ্রদ্ধা ভক্তি আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

র-য়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা অ্যাশেনডেন এবারে সামান্য একটু
চমকে উঠলো, তারপর আরও সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলো বড়ো সাহেবের

ক্লান্ত, রেখাঙ্কিত হলদে মুখখানাকে। সে জানতো, উনি অকারণে এ মন্তব্যটা করেননি।

'অবিশ্যি মানবজীবনের মূল্য সম্পর্কে অনেক অর্থহীন কথাই বলা হয়েছে। যুক্তিসঙ্গত কারণেই তুমি বলতে পারো, পোকার খেলায় তুমি যে প্রতিঘাতগুলো করো তার একটা অপরিহার্য মূল্য আছে। তুমি যা করতে চাও, সেটাই সেগুলোর মূল্য। যুদ্ধে একজন জেনারেলের কাছে মানুষই প্রতিঘাত। এবং ভাবপ্রবণতার জন্যে সে যদি তাদের মানুষ বলে মনে করে তাহলে সে নেহাতই বোকা।'

'কিন্তু মানুষ অনুভব করতে পারে, চিন্তা করতে পারে। কাজেই তারা যদি বুঝতে পারে যে তাদের অযথা অপব্যয় করা হচ্ছে, তাহলে ভবিষ্যতে তারা আর সেভাবে ব্যবহৃত হতে রাজী নাও হতে পারে।'

'যাকগে, সে সব এখানে হচ্ছে না। আমাদের কাছে খবর আছে, কনস্তানতিন আন্দ্রেইদি নামে একটা লোক কনস্তানতিনোপল থেকে কিছু দলিলপত্র নিয়ে রওনা হচ্ছে। ওই দলিলগুলো আমরা হাত করতে চাই। লোকটা জাতে গ্রীক, পেশায় এনভার পাশার একজন এজেন্ট। তার ওপরে এনভারের অগাধ আস্থা। এনভার মৌখিকভাবেও তাকে কিছু বলে দিয়েছে এবং সেগুলো এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে তা কাগজে লিখে জানানো যায় না। লোকটা ইথাকা নামে একটা জাহাজে পাইরেউস থেকে রওনা হয়েছে। রোমে যাবার পথে সে ব্রিন্দিসিতে নামবে এবং সেখানকার জার্মান দূতাবাসে কাগজপত্রগুলো জমা দিয়ে আর যা কিছু জানাবার তা ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রদূতকে মুখে বলবে।'

'অ।'...

ইতালি তখনও নিরপেক্ষ দেশ। অক্ষশক্তিগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করছে তাকে নিরপেক্ষ রাখার আর মিত্রপক্ষ চেষ্টা করছে যাতে ইতালি তাদের দলে এসে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

'ইতালির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা ঝামেলায় জড়াতে চাই না, সেটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে আন্দ্রেইদির রোমে পৌঁছনো আমাদের আটকাতেই হবে।'

'যে কোনো মূল্যে?' প্রশ্ন করলো অ্যাশেনডেন।

'টাকাটা কোনো ব্যাপার নয়,' ব্যঙ্গের হাসিতে র—য়ের ঠোঁট দুটো বেঁকে উঠলো।

'আপনি কি করতে চাইছেন?'

'তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।'

'আমার কল্পনাশক্তি উর্বর।'

'আমি চাই, নির্লোম মেক্সিকানের সঙ্গে তুমি নেপলসে যাবে। লোকটা কিউবায় ফেরার ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহী। মনে হয় সেখানে তার বন্ধু-বান্ধবরা একটা ঘটনা ঘটাবার আয়োজন করছে এবং সে যথাসম্ভব তার কাছাকাছি থাকতে চায়—যাতে ব্যাপারটা পাকা হলেই সে এক লাফে মেক্সিকোতে গিয়ে হাজির হতে পারে। তার নগদ টাকার প্রয়োজন। টাকাটা আমি সঙ্গেই নিয়ে এসেছি…অ্যামেরিকান ডলার…আজ রাতে সেগুলো আমি তোমাকে দিয়ে দেবো। তুমি ওগুলো নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।'

'টাকাটা কি অনেক?'

'ভালোই। তবে আমার মনে হয়েছে, বোঝাটা বেশি না হলে কাজটা তোমার পক্ষে একটু সহজ হবে—তাই পুরো টাকাটা আমি হাজার ডলারের নোটে এনেছি। আন্দ্রেইদির নিয়ে আসা কাগজপত্রগুলোর বদলে তুমি নির্লোম মেক্সিকানটাকে ওই টাকাগুলো দিয়ে দেবে।'

অ্যাশেনডেনের ঠোঁটে একটা প্রশ্ন লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু তার বদলে অন্য একটা প্রশ্ন জিগেস করলো সে।

'কি করতে হবে তা ওই লোকটা বুঝতে পেরেছে তো?'

'পরিষ্কার বুঝেছে।'

দরজায় টোকার শব্দ। পরক্ষণেই দরজা খুলে গেলো এবং দেখা গেলো নির্লোম মেক্সিকানটি ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'এসে গেছি! শুভসন্ধ্যা, কর্নেল। আপনাকে দেখে আমি একেবারে পুলকিত!'

র—উঠে দাঁড়ালেন, 'আসার পথে সময়টা ভালো কেটেছে তো, ম্যানুয়েল? ইনি মিঃ সোমারভিল, ইনিই তোমার সঙ্গে নেপলসে যাচ্ছেন। আর এই হচ্ছে জেনারেল কারমোনা।'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, স্যার।'

লোকটা এতো জোরে অ্যাশেনডেনের হাতে ঝাঁকুনি দিলো যে অ্যাশেনডেনের মুখটা কুঁচকে উঠলো।

'আপনার হাতটা একেবারে লোহার মতো, জেনারেল,' অস্ফুটে বললো সে।

লোকটা ওদের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলো।

'আজ সকালেই আমি হাত আর নখের প্রসাধন করিয়েছি। তবে খুব ভালো-ভাবে করা হয়েছে বলে মনে হয় না। আরও চকচকে নখ আমার পছন্দ।'

লোকটার নখগুলো ছুঁচলো করে কাটা। তাতে টকটকে লাল রঙ লাগানো।

অ্যাশেনডেনের মনে হচ্ছিলো, নখগুলো ঠিক আরশির মতো ঝকঝকে। শীত নেই, অথচ জেনারেলের গায়ে ভেড়ার চামড়ার কলারওলা ফারের কোট। তার প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে একরাশ সুগন্ধির ঢেউ নাকে ভেসে আসে।

'তোমার কোটটা খোলো, জেনারেল।' র—বললেন, 'তারপর একটা চুরুট ধরাও।'

নির্লোম মেক্সিকানটি দীর্ঘকায়। চেহারাটা রোগা-পাতলা গোছের হলেও ওকে দেখে খুবই শক্তিশালী বলে মনে হয়। পরনে সুন্দর ছাঁটের নীল সার্জের স্যুট, কোটের বুকপকেটে নিখুঁত ভাঁজ করা রেশমি রুমাল। মনিবন্ধে একটা সোনার ব্রেসলেট। চোখ-মুখ দেখতে ভালোই, তবে প্রমাণ মাপের চাইতে একটু বড়োসড়ো। চোখ দুটো বাদামি এবং উজ্জ্বল। মানুষটা একেবারে নির্লোম। ওর দেহের হলদে চামড়াটা মেয়েদের ত্বকের মতো মসৃণ। ভুরু কিংবা অক্ষিপল্লবও নেই। মাথায় একটা হালকা বাদামি রঙের পরচুলা—তার চুলগুলো বেশ লম্বা এবং সেগুলো শিল্পসম্মতভাবে এলোমেলো করে রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই মানুষটাকে কেমন যেন ভয়াবহ বলে মনে হয়। লোকটার চেহারা হাস্যকর, দেখলে বিতৃষ্ণা জাগে, অথচ চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

কুর্সিতে বসে পাতলুনটা একটু টেনে নিলো মানুষটা, যাতে হাঁটুর কাছ দুটো ভাঁজ ভেঙে গোল হয়ে না যায়।

'তারপর বলো ম্যানুয়েল, আজও কারুর হৃদয় ভাঙলে নাকি?' র—য়ের কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গভরা রসিকতার সুর।

লোকটা অ্যাশেনডেনের দিকে ফিরে তাকালো।

'মেয়েদের ব্যাপারে সফলতা পাই বলে আমাদের বন্ধুবর, এই কর্নেল মশাই, আমাকে হিংসে করেন। আমি ওঁকে বলেছি, শুধু আমার কথাটা একটু শুনলেই উনি আমার মতো যতোগুলো খুশি মেয়েমানুষ পেতে পারেন। একমাত্র যে জিনিসটা থাকা দরকার, তা হলো আত্মবিশ্বাস। প্রত্যাখ্যানকে ভয় না পেলে আপনি কোনোদিনই প্রত্যাখ্যাত হবেন না।'

'বাজে কথা ছাড়ো, ম্যানুয়েল। তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে, যার জন্যে মেয়েরা তোমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।'

লুকোবার চেষ্টা না করে আত্মতৃপ্তিতে হেসে উঠলো মানুষটা। ইংরেজী ভাষাটা সে দিব্যি ভালোই বলে—উচ্চারণের ঝোঁকটা হিস্পানি, কিন্তু স্বরভঙ্গি অ্যামেরিকানদের মতো।

'আপনাকে বলতে আপত্তি নেই কর্নেল—আপনি জিগেস করলেন বলেই বলছি,

ট্রেনে এক মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ-আলাপ হয়েছে। ও শাশুড়িকে দেখতে লিয়ঁতে আসছিলো। বয়েস খুব একটা কম নয়। মেয়েদের যে ধরনের চেহারা আমি পছন্দ করি, ও তার চাইতে রোগা-পাতলা। তবে ও আমাকে সময়টা ভালোভাবে কাটাতে সাহায্য করেছে।'

'ঠিক আছে, এবারে কাজের কথায় আসা যাক,' র—বললেন।

'আমি আপনার কাজে লাগার জন্যে তৈরি, কর্নেল।' অ্যাশেনডেনের দিকে এক ঝলক তাকালো লোকটা, 'মিঃ সামারভিল কি ফৌজি আদমি?'

'না,' র—বললেন, 'উনি একজন লেখক।'

'সব রকমের লোক নিয়েই দুনিয়া। আপনার পরিচয় পেয়ে আমি খুশি হলাম, মিঃ সামারভিল। আমি আপনাকে এমন অনেক কাহিনী বলতে পারি যেগুলো আপনাকে আগ্রহী করে তুলবে। আমি নিশ্চিত জানি, আমাদের মধ্যে বেশ ভালোই বনিবনা হবে। আপনার মধ্যে একটা দরদী মন আছে। সে দিকে আমি ভয়ানক সংবেদনশীল। সত্যি বলতে কি, আমি এক গুচ্ছ স্নায়ুর সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নই। বিদ্বেষী চরিত্রের কারুর সঙ্গে থাকলে আমি একেবারে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবো।'

'আশা করি আমাদের যাত্রাপথটা আনন্দময় হয়ে উঠবে,' অ্যাশেনডেন বললো।

'আমাদের বন্ধুটি ব্রিন্দিসিতে কবে পৌঁছুচ্ছেন?' র—য়ের দিকে ফিরে মেক্সিকোর লোকটা প্রশ্ন করলো।

'চোদ্দ তারিখে সে ইথাকা জাহাজে পাইরেউস থেকে রওনা হবে। জাহাজটা সম্ভবত পুরনো। তবে তোমরা বরং হাতে বেশ খানিকটা সময় রেখেই ব্রিন্দিসিতে যেও।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত।'

র—কুর্সি থেকে উঠে, হাত দুটো পকেটে গুঁজে টেবিলের ধারে উঠে বসলেন। ওঁর পরনে হতশ্রী উর্দি, টিউনিকের বোতামগুলো খোলা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর পোশাকে মোড়া মেক্সিকানটির পাশে ওঁকে রীতিমতো নোংরা ও অগোছালো বলে মনে হচ্ছিলো।

'তুমি যে কাজটা নিয়ে যাচ্ছো, মিঃ সামারভিল আসলে সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না এবং আমি ওঁকে কিছু বলতেও চাই না। আমার মনে হয়, ব্যাপারটা তুমি গোপন রাখলেই ভালো হয়। কাজটা হাসিল করার জন্যে তোমার যা টাকা-পয়সা লাগবে, সেটা তোমাকে দিয়ে দেবার জন্যে ওঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজটা তুমি কিভাবে করবে সেটা তোমার নিজের ব্যাপার। অবিশ্যি সে কাজে

ওঁর পরামর্শের দরকার হলে, তুমি তা চাইতে পারো।'

'অন্যের পরামর্শ আমি বড়ো একটা চাই না এবং কখনই তা গ্রহণ করি না।'

'কাজটা করতে গিয়ে তুমি সমস্ত কিছু তালগোল পাকিয়ে ফেললেও আমি আশা করবো, মিঃ সামারভিলকে তুমি তার বাইরে রাখবে। ওঁকে কোনোমতেই এর মধ্যে জড়ানো চলবে না।'

'আমি কথা দিয়ে কথা রাখি, কর্নেল।' নির্লোম মেক্সিকানটি মর্যাদাময় ভঙ্গিতে বললো, 'আমাকে কেটে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও আমি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না।'

'মিঃ সামারভিলকেও আমি ঠিক তা-ই বলেছি। আর কাজটা যদি ভালোভাবে মিটে যায় তাহলে কাগজপত্রগুলোর বদলে আমি তোমাকে যে টাকাটা দেবো বলেছিলাম, মিঃ সামারভিলকে নির্দেশ দেওয়া আছে উনি তোমাকে তা মিটিয়ে দেবেন। সেগুলো তুমি কি উপায়ে পেলে, তা নিয়ে উনি মাথা ঘামাবেন না।'

'সেটা না বললেও চলে। তবে একটা জিনিস আমি একেবারে পরিষ্কার করে নিতে চাই। আপনি আমাকে যে কাজের ভার দিয়েছেন আমি যে সেটা শুধুমাত্র টাকার জন্যে নিইনি, তা মিঃ সামারভিল নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন?'

'পুরোপুরি,' র—সরাসরি লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন।

'দেহে ও মনে আমি পুরোপুরি মিত্রশক্তির পক্ষে। বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতাকে বলাৎকার করার জন্যে আমি কিছুতেই জার্মানদের ক্ষমা করতে পারি না। আপনি আমাকে যে টাকাটা দেবার প্রস্তাব জানিয়েছেন আমি যদি তা গ্রহণ করি, তাহলে এই কারণেই করবো যে প্রথমত এবং প্রধানত আমি একজন দেশপ্রেমী। মিঃ সামারভিলকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি বোধহয়?'

র—ঘাড় নাড়লেন। মেক্সিকানটি অ্যাশেনডেনের দিকে তাকালো, 'অত্যাচারী শাসকদের শোষণ এবং ধ্বংসের হাত থেকে আমার দুঃখিনী দেশকে মুক্ত করার জন্যে এক অভিযানের আয়োজন করা হচ্ছে। অমি যা পাবো তার প্রতিটি কপর্দকই বন্দুক আর টোটার পেছনে ব্যয় করা হবে। আমার নিজের জন্যে টাকা-পয়সার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি একজন সৈনিক, রুটির এক টুকরো শক্ত কানা আর সামান্য কটা জলপাই হলেই আমার দিব্যি চলে যায়। ভদ্রলোকদের মাত্র তিনটে কাজে ব্যস্ত থাকা মানায়—যুদ্ধ, তাস আর মেয়েমানুষ। একটা রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে পাহাড়-পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিতে কোনো খরচা লাগে না, অসুবিধেও কিছু নেই—এবং সেটাই সত্যিকারের যুদ্ধ, কৌশলে সৈন্য পরিচালনা করে বড়ো বড়ো অস্ত্র

দাগানোটা আসল যুদ্ধ নয়। মেয়েরা স্রেফ আমার জন্যেই আমাকে ভালোবাসে। আর তাস খেলায় সাধারণত আমি জিতে থাকি।'

সুগন্ধি মাখা রুমাল আর সোনার ব্রেসলেট সহ এই অদ্ভুত লোকটার আশ্চর্য উদ্দীপনা ভীষণ পছন্দ হলো অ্যাশেনডেনের। পরচুলা এবং বিশাল, নির্লোম মুখ সত্ত্বেও লোকটার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। লোকটা অদ্ভুত, কিন্তু দেখে মনে হয় না ওকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা যায়। অনন্ত ওর আত্মপ্রসাদ।

'তোমার জিনিসপত্র কোথায়, ম্যানুয়েল?' র—জানতে চাইলেন।

আচমকা প্রশ্নে বক্তৃতায় বাধা পড়ায় হয়তো সামান্য একটু কুঞ্চন জেনারেলের ভ্রূ-দুটিকে একটু গাঢ়তর করে তুললো, কিন্তু নিজের অসন্তুষ্টির অন্য কোনো লক্ষণ সে প্রকাশ করলো না। অ্যাশেনডেনের সন্দেহ হলো, লোকটা কর্নেলকে সূক্ষ্ম আবেগ সম্পর্কে বোধহীন একটা বর্বর বলে ধরে নিয়েছে।

'স্টেশনে রেখে এসেছি।'

'মিঃ সামারভিলের কাছে কূটনৈতিক পাসপোর্ট আছে। তুমি চাইলে, নিজের মালপত্রের সঙ্গে উনি তোমারটাও বিনা পরীক্ষায় সীমান্ত দিয়ে পার করে দিতে পারবেন।'

'আমার জিনিসপত্র খুবই কম—সামান্য কয়েকটা স্যুট আর গোটা কতক অন্তর্বাস। তবে মিঃ সামারভিল ওটার ভার নিলে বোধ করি ভালোই হয়। প্যারী থেকে আসার আগে আমি রেশমের গোটা ছয়েক পাজামা স্যুট কিনেছিলাম।'

'আর তোমার কি কি আছে?' র—অ্যাশেনডেনের দিকে তাকালেন।

'শুধু একটা ব্যাগ। আমার ঘরেই রয়েছে।'

'এখানে লোকজন থাকতে থাকতে কাউকে দিয়ে সেটাকে বরং স্টেশনে পাঠিয়ে দাও। একটা দশে তোমাদের ট্রেন।'

'অ্যাঁ?'

অ্যাশেনডেন এই প্রথম শুনলো, তাকে আজ রাতেই রওনা হতে হবে।

'আমার মনে হয়, তোমাদের যতো শীঘ্রি সম্ভব নেপলসে চলে যাওয়া ভালো।'

'খুবই ভালো কথা।'

'আমি শুতে যাচ্ছি,' র—উঠে দাঁড়ালেন। 'তোমরা এখন কি করতে চাও, জানি না।'

'আমি লিয়ঁতে একটু হেঁটে-চলে বেড়াবো,' নির্লোম মেক্সিকান বললো। 'আমি জীবন সম্পর্কে আগ্রহী। আমাকে একশোটা ফ্রাঁ ধার দেবেন কর্নেল? আমার কাছে দরকার খুচরো নেই কি না।'

পকেট-বই থেকে জেনারেলকে নোটটা দিয়ে র—অ্যাশেনডেনের দিকে তাকালেন, 'তুমি কি করবে ? এখানেই অপেক্ষা করবে নাকি ?'

'না, আমি স্টেশনে গিয়ে একটু পড়বো।'

'যাবার আগে তোমরা দুজনেই বরং একটা করে হুইস্কি আর সোডা খেয়ে যাও। তুমি কি বলো, ম্যানুয়েল ?'

'আপনার অসীম করুণা, তবে কিনা আমি আবার শ্যাম্পেন আর ব্র্যাণ্ডি ছাড়া কক্ষণো কিছু পান করি না।'

'মিশিয়ে ?' র—শুকনো গলায় জিগেস করলেন।

'মেশাতেই হবে এমন কোনো কথা নেই,' গম্ভীর গলায় জবাব দিলো জেনারেল।

র—ব্র্যাণ্ডি ও সোডা আনার ফরমাশ দিলেন এবং সেগুলো আসার পর তিনি এবং অ্যাশেনডেন দুটো পাত্র থেকেই নিজেদের পানীয় ঢেলে নিলেন। কিন্তু নির্লোম মেক্সিকানটি একটা পাত্র থেকে তিন ভাগ পানীয় ঢেলে নিয়ে নির্জলা ব্র্যাণ্ডিটাই সশব্দে দু চুমুকে নামিয়ে দিলো। তারপর কুর্সি ছেড়ে উঠে কোটটা গায়ে গলিয়ে যে ভঙ্গিমায় সে এক হাতে নিজের কালো টুপিটা তুলে নিলো, একজন রোম্যান্টিক অভিনেতা ঠিক সেই ভঙ্গিতেই নিজের প্রেমিকাকে অন্য একজন যোগ্যতর পুরুষের কাছে তুলে দেয়। অন্য হাতটা র—য়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বললো, 'তাহলে আমি আপনাকে শুভরাত্রি এবং সুন্দর স্বপ্ন দেখার কামনা জানাচ্ছি, কর্নেল। খুব শীগগিরি আমাদের আর দেখা হবে বলে মনে হয় না।'

'সব কিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলো না, ম্যানুয়েল। আর তা করে ফেললেও নিজের মুখটা বন্ধ করে রেখো।'

'আপনাদের যে সমস্ত কলেজে ভদ্রঘরের ছেলেদের নৌবাহিনীর অফিসার হবার জন্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, শুনেছি তারই একটাতে সোনার অক্ষরে লেখা আছে: ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে 'অসম্ভব' বলে কোনো শব্দ নেই। আমি আবার 'বিফলতা' শব্দটার অর্থ জানি নে।'

'ওটার অনেক ভালো ভালো সমার্থ শব্দ আছে,' র—বললেন।

'আপনার সঙ্গে আমি স্টেশনে দেখা করবো, মিঃ সামারভিল,' নির্লোম মেক্সিকানটি দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

র—স্মিত মুখে অ্যাশেনডেনের দিকে তাকালেন। এই মৃদু হাসিটুকুই সর্বদা ওঁর মুখখানাকে অমন ভয়ঙ্কর ধূর্ত করে রাখে।

'লোকটার সম্পর্কে তোমার কি মনে হলো ?'

'আপনি আমাকে হারিয়ে দিলেন,' অ্যাশেনডেন বললো। 'লোকটা ভাঁড় না

ভণ্ড? দেখে তো মনে হলো ময়ূরের মতোই অকেজো। ওই বীভৎস চেহারা নিয়েও ও কি সত্যি সত্যি মেয়েদের সঙ্গে অমন বেশি মেলামেশা করে? ওকে বিশ্বাস করা যায়, এ ধারণা আপনার কেন হলো?'

'আমার মনে হয়েছিলো ওকে তোমার পছন্দ হবে। একটি চরিত্র বটে, তাই না? তবে আমার ধারণা, ওকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি।' আচমকা র—য়ের চোখ দুটো ছায়াঘন হয়ে উঠলো, 'আমাদের সঙ্গে দু-নম্বুরি করে ওর কোনো সুবিধে হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে উনি ফের বললেন, 'তবে ঝুঁকিটা আমাদের নিতেই হবে।...আমি তোমাকে দুটো টিকিট আর টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি, তারপরে তুমি নিজের পথ দেখতে পারো। আমি ক্লান্ত, এবারে শুয়ে পড়তে চাই।'

দশ মিনিট বাদে অ্যাশেনডেন একটা কুলির কাঁধে নিজের ব্যাগটা চাপিয়ে দিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হলো।

প্রায় দু ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে বলে অ্যাশেনডেন বিরাম কক্ষে আরাম করে বসলো। ঘরে আলোটা ভালোই ছিলো, তাই একটা উপন্যাস পড়তে লাগলো সে। যে ট্রেনটা তাদের সরাসরি রোমে নিয়ে যাবে, ক্রমে পারী থেকে তার এসে পৌছবার সময় এগিয়ে এলো—কিন্তু নিলোম মেক্সিকানটি এসে হাজির হলো না। সামান্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে শুরু করলো অ্যাশেনডেন, লোকটাকে খোঁজার জন্যে ঘর থেকে প্লাটফর্মে বেরিয়ে এলো সে। আসলে সে ট্রেন-জ্বর নামে পরিচিত একটা দুঃখজনক ব্যামোতে ভোগে। ট্রেন আসার এক ঘণ্টা আগে থেকেই তার ভয় হতে শুরু করে—যদি ট্রেনটা সে ধরতে না পারে। হোটেলের দারোয়ানদের ওপরে সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, কারণ তারা কিছুতেই সময়মতো তার ঘর থেকে মালপত্র নামিয়ে আনে না। হোটেলের বাস যে কেন অমন শেষ মুহূর্তে আসে তা সে কিছুতেই ভেবে পায় না। রাস্তায় সামান্য যানজট হলেই তার মাথা খারাপ হয়ে যায় আর স্টেশনে কুলিদের গয়ংগচ্ছ ভাব তাকে একেবারে তিতিবিরক্ত করে তোলে। মনে হয় গোটা দুনিয়াই যেন তাকে দেরি করিয়ে দেবার জন্যে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র এঁটেছে। সে বেষ্টনী পেরিয়ে যাবার সময় কিছু মানুষ অবধারিত ভাবে তার পথ জুড়ে থাকে। অন্যেরা দীর্ঘ সারি বেঁধে অন্য সমস্ত ট্রেনের টিকিট কাটতে থাকে এবং বিরক্তিকর ভাবে অতিরিক্ত যত্নসহকারে নিজেদের খুচরো পয়সা গুনে নেয়। তার মালপত্র নিবন্ধভুক্ত করাতে সীমাহীন সময় লাগে। কোনও বন্ধু-বান্ধবের তার সঙ্গে কোথাও যাবার কথা থাকলে, অ্যাশেনডেন জানে তারা স্টেশনেই পড়ে থাকবে—কারণ তারা মোক্ষম সময়ে খবরের কাগজ কিনতে যাবে, কিংবা প্লাটফর্ম ধরে একটু পায়চারি

করতে যাবে অথবা কোনো স্বল্পপরিচিতের সঙ্গে কথা বলার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়বে কিংবা আচমকা একটা টেলিফোন করার ইচ্ছায় একছুটে কোথাও উধাও হয়ে যাবে। সত্যি বলতে কি, সমস্ত পৃথিবীটাই ষড়যন্ত্র এঁটে চেষ্টা করে যাতে সে কোনো ট্রেনই ধরতে না পারে। তাই অন্তত আধ ঘণ্টা আগে ওপরের তাকে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে নিজের কোণটিতে স্থিতু না হওয়া অব্দি অ্যাশেনডেন কিছুতেই খুশি হতে পারে না। কথনও কখনও অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি স্টেশনে এসে পড়ায়, যে ট্রেনটা ধরার কথা তার আগের ট্রেনেই সে উঠে পড়েছে।

রোম এক্সপ্রেসের সিগন্যাল দেওয়া হয়েছে, অথচ নির্লোম মেক্সিকানটির তখনও কোনো পাত্তা নেই। ট্রেন এলো, লোকটাকে তখনও দেখা গেলো না। অ্যাশেনডেন ক্রমশ আরও বেশি হয়রান হয়ে উঠতে লাগলো। প্লাটফর্ম ধরে জোর কদমে পায়চারি করতে করতে সে সবকটা বিরামকক্ষ দেখে নিলো। যাত্রীদের মালপত্র যে ঘরে জমা রাখা হয়, সেখানেও গিয়ে ঢুকলো—কিন্তু লোকটাকে খুঁজে পেলো না। ট্রেনে ঘুমোবার জন্যে কোনো আলাদা কামরা নেই, কিন্তু বেশ কয়েকজন যাত্রী নেমে গিয়েছিলো বলে অ্যাশেনডেন একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় দুটো জায়গা পেয়ে গেলো। কামরার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে প্লাটফর্মের এদিক থেকে সেদিক এবং স্টেশনের ঘড়িটার দিকে বারবার তাকাতে লাগলো। সঙ্গীটি এসে না পৌছুলে, তার এ ট্রেনে যাওয়া নিরর্থক। কুলিটা চিৎকার করে 'ভেতরে ঢুকুন' বলতেই অ্যাশেনডেন ট্রেন থেকে মালপত্র নামিয়ে নেবে বলে মনস্থির করে ফেললো। কিন্তু হতচ্ছাড়াকে পেলে যখন ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে, তখনই লোকটাকে দেখতে পেলো সে। ট্রেন ছাড়তে আর তিন মিনিট বাকি, তারপর দু মিনিট, তারপর এক। এই শেষ সময়ে প্লাটফর্মে মাত্র সামান্য কয়েকটা লোক, যাত্রীরা সকলেই যে যার আসনে বসে পড়েছে। ঠিক তখনই লোকটাকে দেখলো অ্যাশেনডেন। পেছন পেছন দুটো কুলি তার মালপত্র বয়ে আনছে আর মাথায় গোলাকার টুপি পরা একটা লোকের সঙ্গে অলস ভঙ্গিতে প্লাটফর্ম ধরে এগিয়ে অসেছে নির্লোম মেক্সিকানটা। অ্যাশেনডেনকে দেখতে পেয়ে সে হাত নাড়লো।

'আরে মশাই, আপনি ওখানে! আমি তো ভাবছিলাম আপনার কি হলো।'

'ওহ ভগবান! আপনি শীগগিরি আসুন, নয়তো আমরা আর ট্রেনটা ধরতে পারবো না।'

'আমি ট্রেন ধরতে পারিনি—এমন কোনোদিনও হয়নি। তা আপনি ভালো জায়গা-টায়গা পেয়েছেন কি? স্টেশন মাস্টার তো আজ রাতের মতো চলে গেছেন। ইনি তাঁর সহকারী।'

অ্যাশেনডেন লোকটার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়তেই গোল টুপি পরা লোকটা মাথা থেকে টুপিটা তুলে ধরলো।

'কিন্তু এটা তো একটা সাধারণ ডিব্বা! আমি তো এতে চেপে যেতে পারবো না!' অমায়িক হাসি মাথা মুখে স্টেশন মাস্টারের সহকারীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো নির্লোম মেক্সিকানটি, 'আমার জন্যে এর চাইতে একটা ভালো ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে হবে, মঁশের।'

'নিশ্চয়ই করবো, জেনারেল। আমি আপনাকে বিছানা আছে এমন একটা কামরায় তুলে দেবো—নিশ্চয়ই দেবো।'

সহকারী স্টেশন মাস্টার ওদের নিয়ে ট্রেনটার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা খালি কামরার দরজা খুলে দিলো। কামরাটায় দুটো বিছানা পাতা। মেক্সিকানটি খুশি মনে সব কিছু দেখে নিলো, লক্ষ্য করলো কুলিরা ওদের মালপত্র গুছিয়ে রাখছে।

'এতে আমাদের ভালোভাবেই কাজ চলে যাবে। আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ,' গোল টুপি পরা লোকটার দিকে একটা হাত এগিয়ে দিলো সে। 'আপনার কথা আমি ভুলবো না। পরের বার মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলে আমি তাঁকে জানিয়ে দেবো, আপনি আমার সঙ্গে কি রকম ভদ্র ব্যবহার করেছেন।'

'আপনি অত্যন্ত সহৃদয়, জেনারেল। আমি আপনার কাছে ভীষণ কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো।'

বাঁশি বাজলো, ট্রেনও চলতে শুরু করলো।

'মিঃ সামারভিল, আমার মনে হয় একটা সাধারণ প্রথম শ্রেণীর কামরার চাইতে এটা অনেক বেশি ভালো।' মেক্সিকানটি বললো, 'কি করে সেরা জিনিসগুলো আদায় করে নিতে হয়, একজন ভালো ভ্রমণার্থীর তা শিখে নেওয়া উচিত।'

কিন্তু অ্যাশেনডেন তখনও চরম ক্ষিপ্ত।

'আপনি কেন এমন মাপা সময়ে এসে পৌঁছনো স্থির করলেন, আমি তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। ট্রেনটা ধরতে না পারলে আমাদের একজোড়া বুদ্ধু বনতে হতো।'

'আরে মশাই, তেমন আশঙ্কা বিন্দুমাত্রও ছিলো না। এখানে পৌঁছেই আমি স্টেশন মাস্টারকে বলে রেখেছিলাম, আমি মেক্সিকোর সামরিক বাহিনীর কম্যাণ্ডার ইন-চিফ জেনারেল কারমোনা। ব্রিটিশ ফিল্ড মার্শালের সঙ্গে একটা মন্ত্রণা-সভায় মিলিত হবার কারণে আমাকে সামান্য কয়েক ঘণ্টার জন্যে লিয়ঁতে যাত্রাভঙ্গ করতে হয়েছে। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, আমার আসতে দেরি হলে উনি যেন ট্রেনটাকে একটু আটকে রাখেন এবং এমন ইঙ্গিতও দিয়েছিলাম যে আমার সরকার

হয়তো এ বিষয়ে ওঁকে নির্দেশ পাঠাবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করছেন। লিয়ঁতে আমি আগেও এসেছি, এখানকার মেয়েদের আমার ভালো লাগে। প্যারীর মেয়েদের মতো এদের অমন কেতা-কায়দা নেই, তবে কিছু একটা আছে এবং কিছু একটা যে আছে তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। তা শুয়ে পড়ার আগে আপনি এক চুমুক ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নেবেন নাকি?'

'না, ধন্যবাদ,' অ্যাশেনডেন বিরস কণ্ঠে বললো।

'আমি চিরদিনই শোবার আগে এক গ্লাস মদ্য পান করে থাকি, তাতে স্নায়ুগুলো স্থিতু হয়।'

স্যুটকেস খুলে লোকটা বিনা আয়াসেই একটা বোতল খুঁজে বের করলো। বোতলটা ঠোঁটের কাছে ধরে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে, মুখটা হাতের পিঠ দিয়ে মুছে একটা সিগারেট ধরালো সে। তারপর জুতো খুলে শুয়ে পড়লো টান হয়ে। অ্যাশেন-ডেন আলোটা কমিয়ে দিলো।

নির্লোম মেক্সিকানটি চিন্তিত স্বরে বলতে লাগলো, 'আমি কোনোদিনই স্থির করে উঠতে পারিনি, ঘুমোবার আগে ঠোঁটে সুন্দরী রমণীর চুমু কিংবা সিগারেট —দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি মধুর। আচ্ছা, আপনি কখনও মেক্সিকোতে গেছেন? কালকে আমি আপনাকে মেক্সিকোর কথা বলবো। তাহলে শুভ রাত্রি।'

শীগগিরি একটানা শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনে অ্যাশেনডেন বুঝলো, লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে। সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যে সে নিজেও ঢুলতে শুরু করলো। কিন্তু একটু বাদেই তার ঘুম ভেঙে গেলো। মেক্সিকানটি তখনও গভীর ঘুমে নিশ্চল। গা থেকে ফারের কোটটা খুলে নিয়ে ওটাকে সে কম্বলের মতো করে গায়ে চাপা দিয়েছে। মাথায় সেই পরচুলা। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি তুলে ট্রেনটা সশব্দে ব্রেক কসে থেমে গেলো এবং পলকের মধ্যে, কি হয়েছে অ্যাশেনডেন তা বোঝার আগেই, মেক্সি-কানটা নিতম্বের কাছে হাত রেখে ঝট করে উঠে দাঁড়ালো।

'কি হলো?'

'কিছু নয়। সম্ভবত আমাদের থামাবার জন্যে সিগন্যাল দেওয়া হয়েছে।'

মেক্সিকানটি ধুপ করে বিছানায় বসে পড়লো। অ্যাশেনডেন আলোটা জেলে বললো, 'অমন গভীর ঘুমে থেকেও আপনি খুব চট করে জেগে গেছেন।'

'আমার পেশায় থাকলে আপনাকে তা করতেই হবে।'

অ্যাশেনডেনের জিগেস করতে ইচ্ছে করছিলো সেটা খুন-খারাবি করা, ষড়যন্ত্র কষা নাকি সৈন্য দলকে হুকুম দেওয়া। কিন্তু জিগেস করাটা বিচক্ষণতা হবে কি না, তা সে সঠিকভাবে বুঝতে পারলো না। জেনারেল নিজের ব্যাগ খুলে ফের বোতলটা

বের করে নিলো।

'এক চুমুক নেবেন নাকি? রাত্তির বেলা হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে এর মতো কিছু জিনিস হয় না।'

অ্যাশেনডেন রাজী হলো না। লোকটা ফের বোতলটাকে ঠোঁটের কাছে ধরে বেশ খানিকটা তরল পদার্থ গলা দিয়ে নামিয়ে দিলো। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরালো একটা। ইতিমধ্যেই অ্যাশেনডেন ওকে প্রায় এক বোতল ব্র্যাণ্ডি পান করতে দেখেছে এবং তার আগে শহরে যখন ঘুরে বেড়িয়েছে তখন সম্ভবত আরও বেশ খানিকটাই সে গিলেছে। অথচ এখন পর্যন্ত লোকটা অবশ্যই নিতান্ত স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে। ওর হাবভাব বা কথাবার্তায় এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যাতে মনে হয়, ও সন্ধ্যে থেকে লেমনেড ছাড়া অন্য কিছু পান করেছে।

ট্রেন চলতে শুরু করলো, অ্যাশেনডেনও ফের ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম যখন ভাঙলো তখন ভোর হয়েছে। অলস ভঙ্গিতে ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখলো, মেক্সিকানটির‌ও ঘুম ভেঙেছে। সিগারেট টানছে মানুষটা। তার কাছাকাছি মেঝেটা সিগারেটের পোড়া টুকরোয় বোঝাই। ধূসর আর ভারি হয়ে উঠেছে কামরার ভেতরকার বাতাস। অ্যাশেনডেনকে লোকটা মিনতি করে বলেছিলো, সে যেন জানলা খোলার জন্যে পীড়াপীড়ি না করে—কারণ রাতের বাতাস অতি বিপজ্জনক।

'পাছে আপনার ঘুম ভেঙে যায়, সেই ভয়ে আমি এতোক্ষণ বিছানা ছেড়ে উঠিনি। তা কলঘরে কি আপনি আগে যাবেন, না আমি?'

'আমার কোনো তাড়া নেই,' অ্যাশেনডেন বললো।

'আমি অনেক দিনের ঘাগু মাল, অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার অভিজ্ঞতা আমার অনেক দিনের। তবে আমার বেশি সময় লাগবে না। আপনি কি প্রতিদিন দাঁত সাফ করেন?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো অ্যাশেনডেন।

'আমিও তা-ই। এ অভ্যেসটা আমি নিউ ইয়র্কে শিখেছিলাম। চিরদিনই আমি মনে করি, সুন্দর দাঁতের সারি পুরুষ মানুষের অলঙ্কার।'

কামরায় একটা বেসিন। জেনারেল দাঁত মেজে, দারুণ উদ্দীপনার সঙ্গে সশব্দে কুলকুচি করে মুখ ধুলো। ব্যাগ থেকে এক শিশি ডিকোলন বের করে, তার খানিকটা তোয়ালেতে ঢেলে, তোয়ালেটা হাতে এবং মুখে বুলিয়ে নিলো। একটা চিরুনি দিয়ে পরচুলাটা বিন্যস্ত করলো। গত রাতে হয় ওটা একটুও এদিক-সেদিক নড়েনি, নয়তো অ্যাশেনডনের ঘুম ভাঙার আগেই মানুষটা ওটাকে ঠিকঠাক করে নিয়েছে। তারপর সে ফের ব্যাগ থেকে স্প্রে লাগানো একটা শিশি বের করে

সেটার স্ফীত অংশে চাপ দিতেই, তার কোট এবং জামা সুগন্ধির হালকা মেঘে ভরে উঠলো। রুমালটা নিয়েও সেই একই কাণ্ড করলো মানুষটা। তারপর সমস্ত কর্তব্য সেরে ফেলা মানুষের মতো উৎফুল্ল মুখ নিয়ে অ্যাশেনডেনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এবারে আমি দিনটার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে প্রস্তুত। আমার জিনিসগুলো আমি আপনার জন্যে রেখে দিচ্ছি। ওডিকোলনটার জন্যে আপনার আতঙ্কিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই—প্যারীর মধ্যে এটা সেরা জিনিস।'

'অনেক ধন্যবাদ,' অ্যাশেনডেন বললো, 'তবে জল আর সাবান ছাড়া আমার আর কিছুই লাগবে না।'

'জল? স্নানের সময় ছাড়া আমি আর কক্ষণো জল ব্যবহার করি না। চামড়ার পক্ষে ওর চাইতে রদ্দি জিনিস আর কিছু হয় না।'

সীমান্তের কাছাকাছি এসে গত রাত্রে আচমকা ঘুম ভেঙে লাফিয়ে ওঠা জেনা-রেলের ইঙ্গিতময় ভঙ্গিমাটার কথা হঠাৎ মনে পড়ায় অ্যাশেনডেন বললো, 'আপনার কাছে কোনো রিভলভার-টার থাকলে, সেটা বরঞ্চ আমাকে দিয়ে দিন। কূটনৈতিক পাসপোর্ট থাকায় ওরা আমাকে খানাতল্লাসি করবে বলে মনে হয় না। তবে আপনাকে তল্লাসি করার কথাটা ওদের মাথায় আসতে পারে। কোনো রকম অহেতুক ঝামেলা কিন্তু আমরা চাই না।'

'এটাকে অস্ত্র না বলে, স্রেফ একটা খেলনাই বলা চলে।' পেছনের পকেট থেকে বিপজ্জনক আকৃতির একটা গুলিভর্তি রিভলভার বের করে, সেটা অ্যাশেনডেনের হাতে তুলে দিলো লোকটা, 'এটাকে আমি এক ঘণ্টার জন্যেও ছেড়ে থাকা পছন্দ করি না—মনে হয় যেন পুরোপুরি পোশাক পরিনি। তবে আপনি ঠিকই বলেছেন, আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাই নে। আমার ছুরিটাও আমি আপনাকে রাখতে দিচ্ছি। রিভলভারের বদলে আমি চিরদিনই ছুরি ব্যবহার করতে বেশি ভালোবাসি, ওটা অনেক বেশি মার্জিত অস্ত্র।'

'আমার মনে হয়, ওটা স্রেফ অভ্যেসের ব্যাপার। হয়তো ছুরির ব্যবহারে আপনি বেশি স্বচ্ছন্দ।'

'দেখুন, রিভলভারের ঘোড়া সকলেই টিপতে পারে। কিন্তু ছুরি ব্যবহার করতে হলে মরদ হওয়া দরকার।'

অ্যাশেনডেনের মনে হলো যেন একটি মাত্র দেহভঙ্গিমায় লোকটা নিজের ওয়েস্ট কোট খুলে, কোমরবন্ধ থেকে একটা ভয়ঙ্কর খুনে ছুরি বের করে, সেটার দীর্ঘ ফলাটা খুলে ধরলো। বিশাল, নগ্ন, কুৎসিত মুখে খুশির হাসি হেসে ছুরিটা অ্যাশেনডেনের হাতে তুলে দিলো সে।

'এর চাইতে সুন্দর ইস্পাতের টুকরো আমি সারা জন্মেও দেখিনি, মিঃ সামারভিল। এটা ক্ষুরের মতো ধারালো আর বেশ শক্তপোক্ত। এটা দিয়ে আপনি সিগারেটের কাগজ কাটতে পারবেন আবার একটা ওক গাছও মুড়িয়ে ফেলতে পারবেন। কক্ষণো অকেজো হবে না। ফলাটা বন্ধ করে রাখলে মনে হবে, এই ধরনের ছুরি দিয়েই স্কুলের ছেলেরা ডেস্কে খাঁজ কাটে।'

খুট করে ফলাটা বন্ধ করে অ্যাশেনডেন ছুরিটাকেও রিভলভারের সঙ্গে পকেটে রেখে দিলো।

'আর কিছু আছে?'

'আমার হাত দুটো,' মেক্সিকানটা উদ্ধত ভঙ্গিতে জবাব দিলো। 'তবে শুল্ক বিভাগের অফিসাররা তা নিয়ে কোনো ঝামেলা করবে বলে মনে হয় না।'

করমর্দনের সময় লোকটার সেই লৌহ-কঠিন মুষ্টির কথা মনে করে সামান্য শিউরে উঠলো অ্যাশেনডেন। বিশাল, দীর্ঘ আর মসৃণ হাত। হাতের পিঠ বা মণিবন্ধ—কোথাও একগাছি চুল নেই। ছুঁচলো রক্তিম প্রসারিত নখগুলো দেখে সত্যিই মনে কেমন যেন অমঙ্গল আশঙ্কা জেগে ওঠে।

সীমান্তে পৌঁছে অ্যাশেনডেন ও জেনারেল কারমোনা আলাদা আলাদা ভাবে নিয়মকানুনগুলো পালন করে এলো। কামরায় এসেই সঙ্গীর রিভলভার আর ছুরিটা ফিরিয়ে দিলো অ্যাশেনডেন।

'এবারে আমার অনেক বেশি স্বস্তি লাগছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেললো লোকটা। 'এক হাত তাস খেললে কেমন হয়?'

'ভালোই।'

ফের ব্যাগ খুলে নির্লোম মেক্সিকানটি ব্যাগের এক কোণ থেকে এক প্যাকেট তেলচিটে ফরাসী তাস বের করে নিলো। 'একার্তে' জানা আছে কিনা জিগেস করায় অ্যাশেনডেন যখন 'না' বললো, তখন সে পীকেট খেলার কথা বললো। এ খেলাটার সঙ্গে অ্যাশেনডেন অপরিচিত নয়, তাই ওরা বাজি ঠিক করে খেলতে শুরু করলো। দুজনেই দ্রুত কাজ করার পক্ষপাতী, তাই ওরা প্রথম ও শেষ হাত দুটো দ্বিগুণ করে চার হাতের খেলা চালাতে লাগলো। অ্যাশেনডেন বেশ ভালোই তাস পাচ্ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিলো যেন মেক্সিকানটা প্রতিবারই ওর চাইতে বেশি ভালো তাস পাচ্ছে। অ্যাশেনডেন চোখ খোলা রেখে খেলছিলো, তবু সে সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। একটার পর একটা খেলায় হারতে হারতে শেষ অব্দি সে হাজার খানেক ফ্রাঁ হেরে গেলো। তখনকার দিনে অঙ্কটা বেশ মোটা।

জেনারেল ইতিমধ্যে অসংখ্য সিগারেট ধ্বংস করেছে। আঙুলের মোচড়ে সিগারেট পাকিয়ে, কাগজের প্রান্ত দুটো জিভের লালায় সেঁটে, সে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় নিজেই সিগারেট তৈরি করে নেয়। শেষ অব্দি ছট করে কুর্সিতে শরীরের হেলান রেখে লোকটা জিগেস করলো, 'আচ্ছা, আপনি কোনো কাজ নিয়ে বাইরে গেলে আপনার তাস খেলার লোকসানটা কি ব্রিটিশ সরকারই মিটিয়ে থাকেন?'

'অবশ্যই না!'

'দেখুন, আমার মতে আপনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট হেরেছেন। এটা যদি আপনার খরচার হিসেবে লেখা হতো তাহলে আমি রোমে পৌছনো অব্দি খেলা চালিয়ে যাবার প্রস্তাব রাখতাম। কিন্তু আমার সম্পর্কে আপনি সহানুভূতি দেখিয়েছেন এবং এটা আপনার নিজের টাকা গচ্চা যাচ্ছে। তাই এ টাকা আমি আর জিততে চাইনে।'

লোকটা তাসগুলো গুছিয়ে এক পাশে সরিয়ে রাখলো। অ্যাশেনডেন খানিকটা বিষণ্ণভাবে কয়েকটা নোট বের করে মেক্সিকানটির হাতে তুলে দিলো। লোকটা নোটগুলো গুণে, যথারীতি নিখুঁতভাবে সেগুলোকে ভাঁজ করে তার পকেট-বইতে ঢুকিয়ে রাখলো। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে, প্রায় স্নেহ প্রদর্শনের ভঙ্গিতেই সে অ্যাশেনডেনের হাটুতে চাপড় মেরে বললো, 'আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। আপনি বিনয়ী, আপনি নিজেকে জাহির করতে চান না, আপনার দেশবাসীর মতো ঔদ্ধত্যও আপনার মধ্যে নেই। আমি জানি আমি যা বলতে চাইছি, আপনি আমার উপদেশটা ঠিক সেই অর্থেই গ্রহণ করবেন। দেখুন, যাদের আপনি চেনেন না তাদের সঙ্গে কখনও পীকেট খেলবেন না।'

অ্যাশেনডেন খানিকটা বিহ্বল হয়ে উঠেছিলো এবং তার মুখেও হয়তো সেটা ফুটে উঠেছিলো। কারণ মেক্সিকানটি তক্ষুনি তার হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে বললো, 'আমি আপনাকে আঘাত দিয়ে ফেলিনি তো? পৃথিবীর কোনো কিছুর বিনিময়েই আমি কিন্তু তা করতে চাই না। অধিকাংশ পীকেট খেলোয়াড়ের চাইতে আপনি কিন্তু খারাপ খেলেন না। ব্যাপারটা তা নয়। আমরা যদি বেশি দিন এক সঙ্গে থাকি তাহলে আমি আপনাকে শিখিয়ে দেবো, কি করে তাস খেলায় জিততে হয়। লোকে টাকা জেতার জন্যে তাস খেলে, কাজেই তাতে হারার কোনো অর্থই হয় না।'

'আমি তো ভেবেছিলাম শুধু প্রেম আর যুদ্ধেই সব কিছু চলে,' অ্যাশেনডেন চাপা গলায় হাসলো।

'যাক, আপনাকে হাসতে দেখে খুশি হলাম। নিজের লোকসানকে এভাবেই

মেনে নিতে হয়। আপনি খোশমেজাজি, বিচার বুদ্ধিও আছে। জীবনে আপনি অনেক দূর অব্দি যাবেন। মেক্সিকোতে গিয়ে আমি যখন নিজের তালুকটা আবার ফিরে পাবো, তখন আপনি এসে আমার সঙ্গে অবশ্যই কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাবেন। আপনার জন্যে আমি রাজার যোগ্য সমাদরের ব্যবস্থা করবো। আপনি আমার সেরা ঘোড়াগুলোতে চাপবেন, আমরা একসঙ্গে ষাঁড়ের লড়াই দেখতে যাবো। আর যেসব মেয়েকে মনে ধরবে, তাদের কথা একবার মুখ ফুটে বললেই চলবে—তাহলেই আপনি তাদের পেয়ে যাবেন।'

অ্যাশেনডেনকে সে এক বিশাল তালুক, বসতবাড়ির লাগোয়া বিরাট ভূ-সম্পত্তি আর মেক্সিকোর খনির কথা বললো—ওগুলো এখন তার হাত থেকে বেদখল হয়ে গেছে। যে সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যে সে বাস করতো, তার কথাও শোনালো। কথাগুলো সত্যি হোক বা না হোক, তাতে কিছু এসে-যায় না—কারণ তার ধ্বনিময় শব্দ-বিন্যাস একেবারে রোম্যান্সের তীব্র সুগন্ধে সমৃদ্ধ। যে সুবিস্তৃত জীবনের বর্ণনা সে দিচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো তা যেন অন্য এক যুগের। তার অলঙ্কারময় অঙ্গভঙ্গিমায় চোখের সামনে যেন ভেসে উঠছিলো তামাটে দুরান্ত, সবুজ ক্ষেতের বিশাল সমারোহ, গবাদি পশুর বড়ো বড়ো দল আর জ্যোৎস্নারাতে বাতাস আর গিটারের ঝঙ্কারে মিলিয়ে যাওয়া অন্ধ গায়কের গান।

'সমস্তই খুইয়েছি—সব কিছু। প্যারীতে সামান্য কিছু কাজ-রোজগারের জন্যে আমাকে বাধ্য হয়ে স্প্যানিশ ভাষা শেখাতে হয়েছে, অ্যামেরিকানগুলোকে শহরের নিশীথ-জীবন দেখাতে হয়েছে। যে আমি এক রাতের খানার পেছনে কয়েক হাজার ফ্র্যাংক খরচ করেছি, সেই আমাকেই রুটির জন্যে একটা অন্ধ ইণ্ডিয়ানের মতো ভিক্ষে করতে হয়েছে। সুন্দরী মেয়েদের কব্জিতে হীরের ব্রেসলেট বেঁধে দিয়ে আমি আনন্দ পেতাম, অথচ সেই আমিই মায়ের বয়সী একটা বুড়ীর কাছ থেকে স্যুটের কাপড় নিতে বাধ্য হয়েছি। তবু ধৈর্য ধরে থেকেছি। আগুনের ফুলকি যেমন ওপরের দিকে উঠবেই, মানুষের জীবনেও তেমনি দুর্ভোগ থাকবেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য কখনও চিরস্থায়ী হতে পারে না। এতোদিনে সময় হয়েছে, এবারে শীগগিরি আমরা আঘাত হানবো।'

তেলচিটে তাসগুলো তুলে নিয়ে মানুষটা সেগুলোকে ছোটো ছোটো ভাগে সাজিয়ে রাখলো।

'দেখা যাক, তাসগুলো কি বলে। তাস কখনও মিথ্যে বলে না। জীবনের যে একটিমাত্র কাজ আমার ওপরে বোঝা হয়ে চেপে আছে, তাসের ওপরে আর একটু বিশ্বাস রাখতে পারলে আমি সেটাকেও এড়াতে পারতাম। আমার বিবেক একেবারে

পরিষ্কার। ওই পরিস্থিতিতে পড়লে অন্য যে কোনো মানুষ যা করতো, আমিও ঠিক তা-ই করেছি। দুঃখ এই, যে কাজটা আমি স্বেচ্ছায় এড়াতে পারতাম, সে কাজটাই প্রয়োজনের তাগিদে আমাকে বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে।'

তাসগুলো দেখে নিয়ে লোকটা কিছু তাস যেন কি একটা পদ্ধতিতে আলাদা করে এক পাশে সরিয়ে রাখলো, অ্যাশেনডেন ঠিক বুঝতে পারলো না। বাকি তাস-গুলোকে ভেঁজে নিয়ে ফের সে সেগুলোকে ছোটো ছোটো ভাগে সাজিয়ে রাখলো।

'তাস আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলো—এ কথা আমি কোনোদিনও অস্বীকার করবো না। একেবারে স্পষ্ট আর নির্দিষ্ট ছিলো ওদের সাবধানী সঙ্কেত। প্রেম, শ্যামলা রঙের মেয়েমানুষ, বিপদ, বিশ্বাসঘাতকতা আর মৃত্যু। আপনার মুখের ওপরে ওই নাকটার মতোই সরল-সাধারণ ছিলো সঙ্কেতটা। যে কোনো বুদ্ধুও তার অর্থ বুঝতে পারতো, আর আমি তো সারাটা জীবনই তাস ব্যবহার করে আসছি। তাস না দেখে আমি প্রায় কখনই কোনো কাজ করি না। কাজেই এর কোনো কৈফিয়ত নেই। আসলে আমার মানসিক চেতনা তখন ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো। আপনারা উত্তুরে জাতের মানুষ—আপনারা জানেন না, প্রেম কি জিনিস। আপনারা জানেন না প্রেম কিভাবে মানুষের ঘুম কেড়ে নেয়, খিদে ভুলিয়ে দেয়, জ্বর-গ্রস্তের মতো রোগা করে তোলে মানুষকে। আপনারা বোঝেন না, প্রেম এমন এক উন্মাদনা যা মানুষকে উন্মাদ করে দেয়, বাসনাকে তৃপ্ত করার জন্যে মানুষ তখন কিছুতেই পিছপা হয় না। আমার মতো মানুষ প্রেমে পড়লে যে কোনো বোকামো, যে কোনো অপরাধই করে ফেলতে পারে—এভারেস্টের চাইতে উঁচু পাহাড়ে উঠতে পারে, অতলান্তিকের চাইতে চওড়া সমুদ্রে সাঁতার কাটতে পারে। সে তখন ঈশ্বর, সে তখন শয়তান। মেয়েমানুষই আমার সর্বনাশের কারণ।'

নির্লোম মেক্সিকানটি তাসগুলোর দিকে ফের এক ঝলক তাকিয়ে, ছোটো ছোটো ভাগগুলো থেকে কয়েকটা তাস তুলে বাকিগুলোকে সেখানেই রেখে দিলো। তারপর ফের ভেঁজে নিলো হাতের তাসগুলোকে।

'অসংখ্য মেয়েমানুষ আমাকে ভালোবেসেছে। এটা আমি মিথ্যে জাঁক দেখাবার জন্যে বলছি না। এর কোনো ব্যাখ্যাও আমি দিতে চাই না। তবে এটা স্রেফ বাস্তব ঘটনা। মেক্সিকো সিটিতে গিয়ে জিগেস করুন, তারা ম্যানুয়েল কারমোনা এবং তার মহিলা-বিজয় সম্পর্কে কি জানে। তাদের জিগেস করবেন, কজন মেয়েমানুষ ম্যানুয়েল কারমোনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছে।'

সামান্য ভ্রূ কুঁচকে চিন্তিত মুখে মানুষটাকে লক্ষ্য করতে থাকে অ্যাশেনডেন। সে ভেবে পায় না, র—য়ের মতো একজন ধূর্ত-চতুর মানুষ যিনি, অমন সুনিশ্চিত সহজ

প্রবৃত্তির বশে নিজের কাজের লোক বেছে নেন, তিনি এবারে ভুল করেছেন কি না। ভাবতে ভাবতে খানিকটা অস্বস্তি অনুভব করে সে। ওই নির্লোম মেক্সিকানটা কি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে যে সে একেবারে দুর্নিবার, নাকি ও স্রেফ গায়ে পড়ে জোর গলায় মিথ্যে বলছে? ইতিমধ্যে লোকটা সবকটা তাসই প্যাকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে, শুধু চারটে তাস মুখ ওলটানো অবস্থায় পাশাপাশি তার সামনে পড়ে রয়েছে। একটা একটা করে ওই চারটে তাসই স্পর্শ করলো সে, কিন্তু একটাও তুলে সোজা করে রাখলো না।

'এখানেই নিয়তি রয়েছে, পৃথিবীর কোনো শক্তিই একে বদলাতে পারবে না।' লোকটা বলতে লাগলো, 'তাসগুলো তুলে দেখতে আমার দ্বিধা জাগছে। চিরদিনই এই মুহূর্তটা আমাকে আতঙ্কে ভরিয়ে তোলে, আমাকে জোর করে শক্ত হতে হয়—কারণ এই তাসগুলোই হয়তো আমাকে বলে দেবে, একটা নিদারুণ বিপদ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি সাহসী পুরুষ। কিন্তু কখনও কখনও আমিও এই অবস্থায় পৌঁছে যাই, তখন ওই চারটে তাস তুলে দেখার মতো সাহস আমার আর থাকে না।'

সত্যি—যে প্রচণ্ড মানসিক উদ্বেগ নিয়ে লোকটা তাসগুলোর পিঠের দিক লক্ষ্য করছিলো, সেই উদ্বেগ লুকিয়ে রাখার কোনো চেষ্টাও সে করছিলো না।

'কি যেন বলছিলাম আপনাকে?'

'আপনি বলছিলেন, মেয়েরা আপনার আকর্ষণকে দুর্নিবার বলে মনে করে,' শুকনো গলায় জবাব দিলো অ্যাশেনডেন।

'কিন্তু একবার আমি একটি মেয়েকে দেখেছিলাম—সে আমাকে রুখে দিয়েছিলো। মেক্সিকো সিটির একটা বাড়িতে আমি ওকে প্রথমবার দেখি, ও তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলো আর আমি উঠছি। মেয়েটা খুব একটা সাংঘাতিক সুন্দরী নয়, ওর চাইতে বেশি সুন্দরী আরও বহু মেয়েকেই আমি ইচ্ছেমতো পেয়েছি। তবে ওর মধ্যে এমন কিছু ছিলো যা আমাকে আকর্ষণ করলো। যে বুড়িটা বাড়ির তত্ত্বাবধান করতো আমি তাকে বললাম, মেয়েটিকে সে যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। মেক্সিকো সিটিতে গেলেই আপনি ওই বুড়িকে চিনতে পারবেন। সবাই তাকে লা মার্কোয়েজা বলে ডাকে। বুড়ি আমাকে বললো, মেয়েটি ওখানকার বাসিন্দা নয়—তবে মাঝে-মধ্যে ওখানে আসা-যাওয়া করেছে। আমি তাকে বললাম, পরদিন সন্ধেবেলা সে যেন মেয়েটিকে ওখানে এনে রাখে এবং আমি না আসা অব্দি ওকে যেন যেতে না দেয়। কিন্তু পরদিন আমার যেতে দেরি হয়ে গেলো। ওখানে পৌঁছবার পর লা মার্কোয়েজা আমাকে জানালো যে মেয়েটি বলে গেছে, ও কারুর জন্যে অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত

নয়। আমি শান্ত স্বভাবের মানুষ, মেয়েরা খেয়ালিপনা বা খুনসুটি করলে আমি কিছু মনে করিনে। আমি মনে করি সেটা ওদের সৌন্দর্যের অংশবিশেষ। তাই আমি একটু হেসে ওকে একটা একশো ডুয়োরোর নোট পাঠিয়ে দিলাম এবং কথা দিলাম পরদিন আমি একেবারে সময়মতো এসে হাজির হবো। কিন্তু পরদিন একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সময়ে ওখানে যেতেই লা মার্কোয়েজা একশো ডুয়োরোর নোটটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, আমাকে মেয়েটির পছন্দ হয়নি। ওর ধৈর্যের অভাব দেখে আমি হাসলাম। তারপর আমার আঙুলের হীরের আংটিটা খুলে বৃদ্ধাকে সেটা দিয়ে বললাম, সে যেন আংটিটা মেয়েটিকে দেয় এবং যেন ত্যাখে এটা দিয়ে মেয়েটির মত বদলানো যাবে কিনা। পরদিন সকালে লা মার্কোয়েজা আংটির প্রতিদানে আমাকে একটা লাল কার্নেশন ফুল এনে দিলো। আমি মজা পাবো না রাগ করবো, ভেবে পেলাম না। প্রেমের পথে কোনো রকম বাধা পেতে আমি অভ্যস্ত নই, প্রেমের জন্যে পয়সা খরচ করতে (সুন্দরী মেয়েদের পেছনে টাকা না ওড়ালে টাকা রেখে কি লাভ ?) আমি কখনও দ্বিধা করি না। তাই লা মার্কোয়েজাকে আমি বললাম, সে যেন মেয়েটিকে গিয়ে বলে—রাত্রিবেলা আমার সঙ্গে খানা খেলে আমি ওকে এক হাজার ডুয়োরো দেবো। একটু বাদেই বৃদ্ধা জবাব নিয়ে এলো, খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি যদি মেয়েটিকে বাড়িতে ফিরতে দিই, তবে ও আসবে। দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে আমি ওর শর্ত মেনে নিলাম। মেয়েটি সত্যিকারের গুরুত্ব দিয়ে কথাটা বলেছে বলে আমি চিন্তা করিনি। আমি ভেবেছিলাম, নিজের ওজন আরও বেশি করে বাড়িয়ে তোলার জন্যেই ও অমন কথা বলেছে। যাই হোক, ও নৈশভোজের জন্যে আমার বাড়িতে এলো। আমি কি আপনাকে বলেছিলাম, মেয়েটি সুন্দরী নয় ? অনিন্দ্যসুন্দরী, অমন রূপসী আমি জীবনেও দেখিনি। আমি মাতাল হয়ে গেলাম। মেয়েটির যেমন রূপ তেমনি বুদ্ধি। আন্দালুজিয়দের সবটুকু সৌন্দর্যই ছিলো ওর মধ্যে। আমি ওকে জিগেস করলাম, কেন ও আমাকে অমন হেলাফেলা করেছে। ও তাতে মুখের ওপরেই আমাকে উপহাস করলো। আমি নিজেকে ওর মনোমতো করে তোলার চেষ্টা করলাম, সমস্ত রকমের কৌশল প্রয়োগ করলাম, এমন কি নিজেকেও ছাপিয়ে গেলাম। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই ও কুর্সি ছেড়ে উঠে বিদায় চাইলো। জিগেস করলাম ও কোথায় যাচ্ছে। ও বললো, আমি ওকে যেতে দেবো বলে কথা দিয়েছিলাম এবং এক কথার মানুষ হিসেবে ও আমাকে বিশ্বাস করেছে। আমি অনুযোগ করলাম, যুক্তি দেখালাম, খেপে উঠলাম, গালমন্দ করলাম—কিন্তু ও আমার কথাটাকেই আঁকড়ে রইলো। শেষ পর্যন্ত পরদিন রাত্রে ওই একই শর্তে ও আমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে—শুধু এই সম্মতিটুকুই আমি ওর কাছ থেকে আদায় করতে পারলাম।

'আপনি ভাবছেন, আমি একটা বুদ্ধু। কিন্তু আমি তখন পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে সুখী মানুষ। সাতদিন আমার সঙ্গে রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়া করার জন্যে আমি ওকে এক হাজার রুপোর ডুয়ো দিয়েছি। প্রথম ষাঁড়ের লড়াই দেখতে যাওয়া মানুষের মতো দুরু দুরু বুকে প্রতি সন্ধ্যায় হৃৎপিণ্ডটাকে মুখের মধ্যে নিয়ে আমি ওর অপেক্ষায় থাকতাম।

'প্রতিটা সন্ধ্যায় ও আমাকে নিয়ে খেলতো, আমাকে বিদ্রূপ করতো, আমার সঙ্গে খুনসুটি করতো, আমাকে পাগল করে দিতো। পাগলের মতোই আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। এর আগে বা পরে আমি কোনোদিনও কাউকে অতো ভালোবাসিনি। তখন আমার মনটা বিক্ষিপ্ত, আর কোনো কিছুতেই মন দিতে পারি না—সমস্ত কাজেই অবহেলা। এদিকে আমি একজন দেশপ্রেমী, দেশকে ভালো-বাসি। আমরা কয়েকজন একটা ছোট্ট দলে সমবেত হয়ে স্থির করেছি, যে কুশাসন আমরা ভোগ করছি তা আর সহ্য করবো না। সমস্ত লোভনীয় পদগুলো অন্যদের দেওয়া হয়েছে আর আমাদের শুধু কর দিয়ে যেতে হচ্ছে—যেন আমরা সবাই ব্যবসা-দার মানুষ। দিনের পর দিন জঘন্য অপমানের মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাদের। কিন্তু আমাদের অর্থবল আছে, জনবল আছে। পরিকল্পনা স্থির করে আমরা তখন আঘাত হানতে প্রস্তুত। আমার হাতে অসংখ্য কাজ—সভা-সমিতিতে যাওয়া, গুলি-বারুদ সংগ্রহ করা, বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই মেয়েমানুষটি তখন এমনভাবে আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে আমি কোনো কাজেই মন দিতে পারছি না।

'আপনি হয়তো ভাবছেন, আমাকে অমনভাবে বোকা বানাবার জন্যে ওর ওপরে আমার রাগ করা উচিত ছিলো। চিরদিন আমার সামান্যতম খেয়াল-খুশিও আমি মিটিয়ে এসেছি। আমি বিশ্বাস করতাম না, আমার বাসনাকে জোরালো করে তোলার জন্যেই মেয়েটা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ও বলেছিলো, আমাকে ভালো না বাসা অব্দি ও নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করবে না এবং আমিও ওর ওই কথাটাকে সরল-সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলাম। ও বলেছিলো, ওর ভালোবাসা অর্জনের দায়িত্ব আমার। ওকে আমার স্বর্গের পরী বলে মনে হতো। অপেক্ষা করার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম। আমার বাসনা এতোই তীব্র ছিলো যে আমি অনুভব করতাম, আজ হোক বা দুদিন পরে হোক তার আঁচ একদিন নিজে থেকেই ওর মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। এ যেন প্রেইরির বুকে জ্বলে ওঠা আগুন—যা চতুর্দিকে সমস্ত কিছুকেই আত্মসাৎ করে ফেলে। অবশেষে…অবশেষে একদিন মেয়েটি বললো, ও আমাকে ভালোবাসে। তীব্র আবেগের বশে মনে হলো আমি মূর্ছাহত হয়ে পড়ে যাবো, মরে

যাবো। ওহ্‌, সে কি কষ্ট! সে কি উন্মাদনা! দুনিয়ায় আমার যা কিছু আছে তা সবই তখন আমি ওকে দিয়ে দিতে পারতাম, সম্ভব হলে আকাশ থেকে তারাগুলোকে ছিনিয়ে এনে সাজিয়ে দিতাম ওর নিবিড় চুলগুলোতে। আমার প্রেমের মাত্রাধিক্য প্রমাণের জন্যে আমি তখন কিছু একটা করতে চাইছিলাম—করতে চাইছিলাম কোনো অসম্ভব, অবিশ্বাস্য কাজ। আমি নিজেকে ওর কাছে উৎসর্গ করতে চাইছিলাম—ওকে দিতে চাইছিলাম আমার সত্তা, আমার আত্মা, আমার মান-সম্মান, আমি এবং আমার যথাসর্বস্ব। সেদিন রাতে মেয়েটি যখন আমার আলিঙ্গনে লীন হয়ে শুয়ে আছে, তখন ওকে আমি আমাদের পরিকল্পনাটার কথা শোনালাম—বললাম আমাদের মধ্যে কে কে তার সঙ্গে জড়িত। হঠাৎ অনুভব করলাম মনোযোগী হওয়ায় ওর শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, টিপ টিপ করছে ওর চোখের পাতা। এর নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, কিন্তু সেটা কি—তা আমি জানি না। ওর যে হাতখানা আমার মুখে মৃদু চাপড় দিচ্ছিলো তা যেন শীতল আর শুকনো। নিমেষের মধ্যে এক চকিত সন্দেহ আমাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেললো। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ে গেলো, তাস আমাকে কি বলেছিলো: প্রেম, একটি শ্যামলা রঙের মেয়ে, বিপদ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং মৃত্যু। তিন তিন বার তাসগুলো ওই একই কথা বলেছে, কিন্তু আমি তাতে আদৌ সতর্ক হইনি। আমি যে কিছু লক্ষ্য করেছি, তা আমি মেয়েটিকে একটুও বুঝতে দিইনি। আমার বুকের কাছে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে ও তখন বলছিলো, এ সমস্ত কথা শুনতে ওর ভয় করছে। আমাকে জিগেস করলো অমুক অমুক এর সঙ্গে জড়িত আছে কিনা। আমি ওর কথার জবাব দিলাম। আমি স্থির নিশ্চিত হতে চাইছিলাম। অসীম চাতুর্যে, চুমু দেবার মাঝে মাঝে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে, ও আমার কাছ থেকে আমাদের পরিকল্পনাটার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় একটি একটি করে জেনে নিলো। এতোক্ষণে আমিও নিশ্চিত হলাম। আপনি আমার সামনে বসে রয়েছেন—এ বিষয়ে আমি যতোটা নিশ্চিত ঠিক ততোটাই নিশ্চিত হয়ে বুঝলাম, মেয়েটা গুপ্তচর। ও প্রেসিডেন্টের গুপ্তচর—ওর শয়তানী রূপের প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে বশ করানোর জন্যে ওকে পাঠানো হয়েছে আর আমাদের সমস্ত গুপ্ত খবরই ও আমার কাছ থেকে বের করে নিয়েছে। আমাদের সকলের জীবনই এখন ওর হাতে। বুঝতে পারলাম, ওকে এই ঘর থেকে বেরুতে দিলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সবাই মারা পড়বো। অথচ ওকে আমি ভালোবাসি, ভালোবাসি। ওহ্‌, বাসনার সে যে কি বিষ জ্বালা আমার বুকের ভেতরটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছিলো তা আমি আপনাকে ভাষায় বোঝাতে পারবো না। এ প্রেমে কোনো পুলক নেই, এ শুধু যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা—কিন্তু এ সেই অপরূপা প্রাণেশ্বরী

যন্ত্রণা যা সমস্ত আনন্দকে ছাপিয়ে যায়। এ সেই স্বর্গীয় যন্ত্রণা, ঐশ্বরিক পরমানন্দে লীন হয়ে থেকে সাধুসন্তরা যার কথা বলেন। আমি জানতাম জ্যান্ত অবস্থায় মেয়েটাকে ঘর থেকে বেরুতে দেওয়া চলবে না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছিলো, দেরি করলে আমি সাহস হারিয়ে ফেলবো।

'এবারে আমি ঘুমোবো ভাবছি,' ও বললো।

'ঘুমোও, সোনা আমার,' আমি জবাব দিলাম।

'ও আমাকে বললো, 'তুমি আমার হৃদয়ের আত্মা'। এটাই ওর শেষ কথা। তার পর ওর ভারি হয়ে ওঠা চোখের পাতা দুটি—আঙুরের মতো ঘন রঙা আর ঈষৎ ভেজা ভেজা দুটি নেত্র পল্লব—ওর চোখ দুটিকে ঢেকে দিলো। সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বুকের সঙ্গে লেগে থাকা ওর বুকের নিয়মিত ওঠা-নামার ছন্দে বুঝলাম ও ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ওকে ভালোবাসি। তাই ও কষ্ট পাবে, যন্ত্রণা পাবে—তা আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। ও একটা গুপ্তচর—হ্যাঁ, গুপ্তচর। কিন্তু যা অনিবার্য তা জানার আতঙ্ক থেকে ওকে রেহাই দেবার জন্যে আমার হৃদয় কাতর হয়ে উঠলো। আশ্চর্য, ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও ওর ওপরে আমার রাগ হচ্ছিলো না। ওর নীচতার জন্যে ওকে আমার ঘৃণা করা উচিত ছিলো, কিন্তু আমি তাও পারছিলাম না। শুধু অনুভব করছিলাম, আমার আত্মাটা রাত্রির মোড়কে ঢাকা রয়েছে। বেচারী! ওর জন্যে দুঃখে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো। ওকে জড়িয়ে রাখা হাতটা আমি আস্তে আস্তে সরিয়ে নিলাম। সেটা আমার বাঁ হাত। ডান হাতটা মুক্তই ছিলো। হাতের ওপরে ভর রেখে আমি নিজের শরীরটাকে টেনে তুললাম। কিন্তু ও এতো সুন্দর···শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুরিটাকে ওর সুন্দর গলাটার ওপরে আড়াআড়ি ভাবে নামিয়ে আনার সময় আমি অন্য দিকে নিজের মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম। ঘুম থেকে না জেগেই ও মৃত্যুর দেশে চলে গেলো।'

কথা থামিয়ে ভ্রূ কুঁচকে সামনে পড়ে থাকা চারটে তাসের দিকে তাকালো মানুষটা। তাস কটা তখনও তুলে নেবার প্রতীক্ষায় মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে।

'অমন যে হবে তা আমি তাস দেখে আগেই বুঝেছিলাম। তবু কেন আমি তাসের সাবধানী সঙ্কেত শুনিনি? আর কোনোদিনও আমি তাসের দিকে তাকাবো না। চুলোয় যাক ওরা। সরিয়ে নিন ওগুলোকে!'

এক প্রচণ্ড হিংস্র ভঙ্গিমায় পুরো প্যাকেটটাই মেঝের ওপরে ছিটকে ফেললো মানুষটা।

'যদিও আমি যুক্তিবাদী, তবু ওর আত্মার জন্যে আমি প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়েছি।' ঠেস দিয়ে বসে নির্লোম মেক্সিকানটি একটা সিগারেট পাকিয়ে নিলো।

তারপর এক বুক ধোঁয়া টেনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'কর্নেল বলছিলেন, আপনি একজন লেখক। কি লেখেন আপনি?'

'গল্প,' অ্যাশেনডেন জবাব দিলো।

'গোয়েন্দা গল্প?'

'না।'

'কেন? একমাত্র ওই গল্পগুলোই আমি পড়ি। আমি লেখক হলে গোয়েন্দা গল্পই লিখতাম।'

'ওসব লেখা বড্ড কঠিন, অবিশ্বাস্য কল্পনাশক্তি থাকা দরকার। একবার আমি একটা হত্যা কাহিনীর পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু খুনটা এতোই সুদক্ষভাবে করা হয়েছিলো যে আমি কিছুতেই খুনীকে ধরিয়ে দেবার পথ খুঁজে পেলাম না। অথচ গোয়েন্দা কাহিনীর একটা রীতি হচ্ছে, একেবারে শেষটায় এসে সমস্ত রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে এবং অপরাধীর বিচার হবে।'

'আপনি যেমনটি ভাবছেন আপনার খুনটা যদি ততোটাই সুদক্ষভাবে করা হয়ে থাকে, তাহলে একমাত্র যে উপায়ে আপনি খুনীর অপরাধ প্রমাণ করতে পারেন তা হচ্ছে খুনের উদ্দেশ্যটা আবিষ্কার করা। উদ্দেশ্যটা একবার বের করে ফেলতে পারলে যে প্রমাণগুলো আগে আপনার নজর এড়িয়ে গেছে সেগুলো ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। উদ্দেশ্যটা খুঁজে না পেলে সবচাইতে মারাত্মক প্রমাণগুলোও অকেজো হয়ে যায়। যেমন ধরুন, কোনো জ্যোৎস্নাহীন অন্ধকার রাতে কোনো নির্জন রাস্তায় আপনি একটা লোককে তেড়ে গিয়ে তার বুকে ছুরি মারলেন। কে ভাববে যে কাজটা আপনার? কিন্তু লোকটা যদি আপনার স্ত্রীর প্রেমিক বা আপনার ভাই হয়, কিংবা সে যদি আপনাকে ঠকিয়ে থাকে বা অপমান করে থাকে—তাহলে এক ফালি কাগজ, এক টুকরো সুতো বা হঠাৎ বলে ফেলা কোনো মন্তব্যই আপনাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে উঠবে। লোকটা যখন খুন হয় তখন আপনি কি করছিলেন? ওই সময়ের আগে বা পরে অন্তত ডজনখানেক লোক আপনাকে দেখেছে কি না? তখন এ সমস্ত প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু লোকটা যদি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত হয় তাহলে মুহূর্তের জন্যেও কেউ আপনাকে সন্দেহ করবে না।'

একাধিক কারণেই অ্যাশেনডেন আলোচনার ধারাটাকে বদলাতে চাইছিলো। রোম থেকে তারা দুজনে দুদিকে যাবে। অ্যাশেনডেনের মনে হচ্ছিলো, পারস্পরিক গতিবিধি সম্পর্কে সঙ্গীটির সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া দরকার। রোম থেকে মেক্সিকানটি যাচ্ছে ব্রিন্দিসিতে আর অ্যাশেনডেন নেপলসে। নেপলসে তার ওতেল দ্য বেলফাস্তে থাকার ইচ্ছে। ওটা বন্দরের কাছাকাছি একটা বিশাল দ্বিতীয়

শ্রেণীর হোটেল। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং মিতব্যয়ী প্রমোদভ্রমণকারীদের ওই হোটেলে নিত্য যাতায়াত। অ্যাশেনডেন ভাবলো, জেনারেল তার ঘরের নম্বরটা জানতে পারলে প্রয়োজন হলে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসবাদ না করেই সোজা তার ঘরে গিয়ে হাজির হতে পারবে। তাই পরের স্টেশনে নেমে অ্যাশেনডেন একটা খাম কিনে আনলো। তারপর খামের ওপরে জেনারেলকে দিয়েই ব্রিন্দ্রিসি ডাকঘরের প্রযত্নে জেনারেলের নামটা লিখিয়ে নিলো। এবারে অ্যাশেনডেনকে যা করতে হবে তা হচ্ছে, এক টুকরো কাগজে শুধু একটা সংখ্যা লিখে খামটাকে ডাকে ফেলে দেওয়া।

নির্লোম মেক্সিকানটি দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো, 'আমার মতে এতো সব সাবধানতা নেওয়া স্রেফ ছেলেমানুষী। এ কাজে আদৌ কোনো ঝুঁকি নেই। তবে যা-ই হোক না কেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—আপনাকে আমি জড়াবো না।'

'এ ধরনের কাজে আমার খুব একটা জ্ঞান নেই।' অ্যাশেনডেন বললো, 'এ ব্যাপারটাতে আমি শুধু কর্নেলের নির্দেশটুকুই পালন করবো এবং যতোটুকু জানা বিশেষ প্রয়োজন, তার চাইতে বেশি কিছুই জানতে চাইবো না।'

'ঠিক তাই। কোনো সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে পড়ে আমাকে যদি বাধ্য হয়ে কোনো মারাত্মক কাজ করে ফেলতে হয় এবং আমি যদি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি—তাহলে আমাকে অবিশ্যি রাজনৈতিক বন্দী হিসেবেই গণ্য করা হবে। তবে আজ হোক বা দুদিন বাদেই হোক, ইতালি মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে নামতে বাধ্য এবং তখনই আমি মুক্তি পেয়ে যাবো। আমি সমস্ত কিছুই বিচার বিবেচনা করে দেখেছি। তবে আপনার কাছে আমার মিনতি, আমাদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে আপনি মনের মধ্যে কোনোরকম উদ্বেগ পুষে রাখবেন না। মনে করবেন, এটা টেমস নদীতে বনভোজন করতে যাবার মতোই একটা সহজ ব্যাপার।'

অবশেষে ওরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। নেপলসগামী গাড়ির কামরায় নিজেকে একা আবিষ্কার করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো অ্যাশেনডেন। ওই বাচাল, বীভৎস, অদ্ভুত মানুষটার হাত থেকে রেহাই পেয়ে এখন সে খুশি। লোকটা কনস্তানতিন আন্দ্রেইদির সঙ্গে দেখা করার জন্যে ব্রিন্দ্রিসিতে চলে গেছে এবং অ্যাশেনডেনকে সে নিজের সম্পর্কে যা বলেছে তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, তাহলে ওই গ্রীক গুপ্তচরটির জায়গায় সে নিজে নেই বলে অ্যাশেনডেন অবশ্য নিজেকে অভিনন্দন জানাতে পারে। আন্দ্রেইদি লোকটা কেমন হতে পারে তা ভাবতে লাগলো অ্যাশেনডেন। তার চিন্তার মধ্যে এক ধরনের বিষণ্ণতা এসে পড়ে। গোপন কাগজপত্র আর বিপজ্জনক কিছু তথ্য নিয়ে লোকটা নিজের অজান্তে দড়ির ফাঁসের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে

দিচ্ছে। কিন্তু এরই নাম যুদ্ধ এবং শুধুমাত্র নির্বোধরাই মনে করে, বাচ্চাদের দস্তানা হাতে এঁটে এর মোকাবিলা করা সম্ভব।

নেপলসে পৌঁছে হোটেলে একটা ঘর নিলো অ্যাশেনডেন এবং ঘরের নম্বরটা বড়ো হাতের অক্ষরে একটা টুকরো কাগজে লিখে, সেটা নির্লোম মেক্সিকানটির উদ্দেশ্যে ডাকে পাঠিয়ে দিলো। তারপর ব্রিটিশ বাণিজ্যদূতের দফতরে গিয়ে হাজির হলো সে—কারণ প্রয়োজনবোধে র—সেখানেই খবর পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছেন। অ্যাশেনডেন দেখলো, দূতাবাসের লোকেরা তার সম্পর্কে অবগত আছে এবং সমস্ত কিছুই ঠিকঠাক চলছে। এবারে এ সমস্ত ব্যাপার এক পাশে সরিয়ে রেখে সে নিজেকে একটু আনন্দ দেবে বলে স্থির করলো। দক্ষিণের এই দেশে বসন্ত অনেকদিন আগেই এসেছে। কর্মব্যস্ত পথঘাটগুলো সূর্যের আলোয় উষ্ণ। নেপলস শহরটাকে অ্যাশেনডেন বেশ ভালোমতোই চেনে। পিয়াজা দি স্থান ফার্দিনান্দোর কর্মকোলাহল আর পিয়াজা দেল প্লেবিসিটোর সুন্দর গির্জাটা তার মনে অতীতের মধুর স্মৃতি জাগিয়ে তুললো। স্ত্রাদা দি শিয়ারা সেই আগের মতোই হট্টগোলে ভরা। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে খাড়া হয়ে উঠে যাওয়া সরু গলিগুলোর দিকে তাকালো অ্যাশেনডেন। গলির উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর পাশে সারি বেঁধে শুকোতে দেওয়া পোশাক-আশাকগুলো যেন উৎসব উপলক্ষে লাগানো অসংখ্য নিশানের মতো উড়ছে। অলস ভঙ্গিমায় সমুদ্র-সৈকত ধরে বেড়াতে বেড়াতে পোসিলিপ্পোতে এসে হাজির হলো সে। এখানকার একটা পুরনো লতানে পালাজোতে যৌবনের অনেক রোম্যান্টিক মুহূর্ত কাটিয়েছে অ্যাশেনডেন। সে লক্ষ্য করলো, অতীতের স্মৃতি এক আশ্চর্য সূক্ষ্ম বেদনা নিয়ে তার হৃদয়ের তন্ত্রীতে ঝংকার তুলতে শুরু করেছে। ছোট্ট একটা রোগা লিকলিকে টাট্টু ঘোড়ায় চেপে পাথুরে রাস্তায় খটাখট শব্দ তুলে এবারে সে গ্যালেরিয়াতে এসে হাজির হলো। তারপর একটা অ্যামেরিকানো পান করতে করতে তাকিয়ে রইলো ওখানে ইতস্তত ঘুরে ফিরে বেড়াতে থাকা লোকগুলোর দিকে।

তিনটে দিন স্রেফ আলসেমি করে কাটিয়ে দিলো অ্যাশেনডেন, যা এই অদ্ভুত অপরিষ্কার এবং আনন্দদায়ক শহরের সঙ্গে সম্পূর্ণ মানিয়ে যায়। চতুর্থ দিন সকালে সে সবেমাত্র স্নান সেরে একটা তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তোয়ালে-টায় জল শুষছে না—এমন সময় হুট করে দরজা খুলে একটা লোক ঘরে ঢুকে পড়লো।

'কি চাই?' চিৎকার করে উঠলো অ্যাশেনডেন।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি আমাকে চেনেন না নাকি?'

'হে ভগবান, এতো সেই মেক্সিকান! নিজের এ কি চেহারা করেছেন আপনি?'

লোকটা নিজের পরচুলাটা বদলে নিয়েছে। এটার রঙ কালো, চুলগুলো ছোটো করে ছাঁটা, মাথার সঙ্গে টুপির মতো সেঁটে আছে। এতে লোকটার পুরো ভোলই বদলে গেছে। এখন ওর পরনে একটা ধূসর রঙের স্যুট।

'আমি মাত্র একটি মিনিট থাকতে পারি। লোকটা এখন দাড়ি কামাচ্ছে।'

অ্যাশেনডেন অনুভব করলো, আচমকা তার গাল দুটো লালচে হয়ে উঠেছে।

'তাহলে লোকটাকে আপনি পেয়েছেন ?'

'সেটা কঠিন হয়নি। জাহাজে গ্রীকযাত্রী সে একাই ছিলো। পারে এসে লাগার পর আমি জাহাজে উঠে গিয়ে পাইরেউস থেকে আসা আমার এক বন্ধুর খোঁজ করলাম। বললাম, আমি জর্জ দিয়োজেনাইদিস নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। এমন একটা ভান করলাম যেন সে না আসায় আমি ভীষণ হতভম্ব হয়ে গেছি। তারপর আন্দ্রেইদির সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করলাম। লোকটা একটা ভুয়া নাম নিয়ে জাহাজে এসেছে। নিজের নাম বললো, লোমবার্দোজ। সে জাহাজ থেকে নামতেই আমি তার পিছু নিলাম। লোকটা প্রথমেই কি করলো, জানেন ? একটা নাপিতের দোকানে ঢুকে দাড়ি কামালো। এর কারণটা কি হতে পারে বলে আপনার মনে হয় ?'

'কিছুই না। যে কোনো লোকই নিজের দাড়ি কামিয়ে ফেলতে পারে।'

'আজ্ঞে আমার তা মনে হয় না। ও নিজের ভোল বদলাতে চাইছিলো। হ্যাঁ, লোকটা ধূর্ত বটে !'

'তা আপনিও তো নিজের ভোল বদলেছেন। আমি তো কিছুতেই আপনাকে চিনতে পারতাম না।'

'প্রত্যেকেরই সাবধানতা নেওয়া দরকার। এখন আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধু। পুরো দিনটা আমাদের ব্রিন্দিসিতে কাটাতে হয়েছে। লোকটা ইতালীয় ভাষায় কথা বলতে পারে না। আমার সাহায্য পেয়ে সে খুব খুশি। এক সঙ্গেই আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি। ওকে আমি এই হোটেলেই নিয়ে এসেছি। বলেছে, আসছে কাল ও রোমে চলে যাবে। কিন্তু আমি ওকে চোখের বাইরে যেতে দেবো না। বলেছে, ও নেপলস দেখতে চায়। আমিও বলেছি, যা কিছু দেখার আছে তার সমস্তই আমি ওকে দেখিয়ে দেবো।'

'লোকটা আজই রোমে যাচ্ছে না কেন ?'

'সেটা ওর কাহিনীরই একটা অংশ। লোকটা বলে বেড়াচ্ছে, সে একজন গ্রীক ব্যবসায়ী—যুদ্ধের সময়ে পয়সা-কড়ি করেছে। বলেছে, সে উপকূল ধরে যাতায়াত-কারী দুটো স্টিমারের মালিক ছিলো। স্টিমার দুটোকে সে সবেমাত্র কিছুদিন হলো

বিক্রি করে দিয়েছে। এখন সে পারীতে গিয়ে একটু বেপরোয়া মজা লুটতে চায়। বলেছে, পারীতে যাওয়া তার সারা জীবনের সাধ এবং অবশেষে সেই সুযোগ এসেছে। লোকটা আর কিছু বলেনি। আমি ওকে দিয়ে কথা বলাবার চেষ্টা করেছি। বলেছি আমি একজন হিস্পানি, যুদ্ধের উপকরণ সম্পর্কে তুরস্কের সঙ্গে যোগাযোগের বন্দোবস্ত করার জন্যে আমি ব্রিন্দিসিতে এসেছিলাম। লোকটা আমার কথাগুলো শুনেছে—বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা সম্পর্কে ও আগ্রহী। কিন্তু আমাকে কিচ্ছুটি বলেনি। আমারও মনে হয়েছে, ওকে আর জোরাজুরি না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তা কাগজপত্রগুলো কিন্তু ওর পরনের পোশাকের মধ্যেই আছে।'

'কি করে জানলেন ?'

'লোকটা মাঝে মাঝেই শরীরের মধ্যদেশে হাত বোলায়। কাগজগুলো ওর কোমরবন্ধের মধ্যে, নয়তো অন্তর্বাসের সেলাইয়ের মধ্যে রয়েছে।'

'তা লোকটাকে আপনি এই হোটেলে নিয়ে আসতে গেলেন কেন ?'

'মনে হলো, এটাই আমাদের পক্ষে বেশি সুবিধেজনক হবে। হয়তো আমরা ওর মালপত্র তল্লাশি করতে চাইতে পারি।'

'আপনিও কি এখানে এসে উঠেছেন নাকি ?'

'না, আমি তেমন বুদ্ধু নই। লোকটাকে বলেছি, আমি রাতের ট্রেনেই রোমে চলে যাচ্ছি, তাই আর ঘর নেবো না। কিন্তু এবারে আমাকে যেতে হচ্ছে—আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে নাপিতের দোকানটার বাইরে ওর সঙ্গে দেখা করবো বলে কথা দিয়েছি।'

'ঠিক আছে।'

'দরকার হলে আজ রাতে আমি আপনাকে কোথায় পাবো ?'

এক মুহূর্ত নির্লোম মেক্সিকানের দিকে তাকিয়ে রইলো অ্যাশেনডেন। তারপর ঈষৎ ভ্রূ-কুঁচকে অন্যদিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, 'সন্ধেবেলাটা আমি আমার ঘরেই কাটাবো।'

'খুব ভালো কথা। তা দয়া করে একটু দেখবেন, বাইরের বারান্দায় কেউ আছে কিনা ?'

অ্যাশেনডেন দরজা খুলে বাইরের দিকে তাকালো। কাউকে দেখতে পেলো না। বছরের এই সময়টাতে হোটেল এখন প্রায় ফাঁকা। নেপলসে এখন বিদেশীর সংখ্যা খুবই কম। ব্যবসার অবস্থা মন্দা।

'ঠিক আছে,' বললো অ্যাশেনডেন।

নির্লোম মেক্সিকান বীরদর্পে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। দরজাটা বন্ধ করে দিলো

অ্যাশেনডেন। তারপর দাড়ি কামিয়ে আস্তে-সুস্থে বেশভূষা সেরে নিলো। পথঘাটে সূর্যটা যথারীতি উজ্জ্বল কিরণ ছড়াচ্ছে। পথচারী এবং ছ্যাকড়া গাড়ি টেনে নেওয়া রোগাপটকা ঘোড়াগুলোর চালচলন সেই আগের মতোই রয়েছে। কিন্তু এসব দৃশ্য অ্যাশেনডেনের মনটাকে আর আগেকার মতো আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারলো না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলো সে। অভ্যেসের বশে বাণিজ্য-দূতাবাসে গিয়ে সে খোঁজ নিলো, তার জন্যে কোনো তারবার্তা আছে কিনা। কিছুই নেই। এবারে সে কুকের অফিসে গিয়ে রোমগামী ট্রেনের যাত্রানির্ঘণ্ট দেখতে লাগলো। মাঝরাত্তের ঠিক পরেই একটা ট্রেন আছে, আর একটা আছে ভোর পাঁচটায়। প্রথম ট্রেনটাই সে ধরতে চায়। মেক্সিকানটির কি পরিকল্পনা আছে, তা সে জানে না। তবে লোকটা যদি সত্যি সত্যিই কিউবাতে যেতে চায়, তাহলে সে এখান থেকে স্পেনে রওনা দিলেই ভালো করবে। অফিসের বিজ্ঞপ্তিটার দিকে তাকিয়ে অ্যাশেনডেন দেখলো, পরের দিন নেপলস থেকে একটা জাহাজ বার্সিলোনাতে রওনা হচ্ছে।

নেপলস এখন অ্যাশেনডেনের কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। ঝলমলে পথঘাট তার চোখ দুটোকে ক্লান্ত করে তুলছে, বাইরের ধুলোবালি একেবারে অসহ্য, হৈ-হট্টগোলে কানে তালা ধরে যায়। গ্যালেরিয়াতে গিয়ে একপাত্র সুরা পান করলো সে। বিকেলে একটা সিনেমা দেখতে গেলো। তারপর হোটেলে ফিরে এসে কেরানীটিকে বললো, আগামীকাল খুব ভোরে সে এখান থেকে রওনা হচ্ছে—তাই এক্ষুণি পয়সা-কড়ি মিটিয়ে দিতে চায়। এবারে নিজের মালপত্র সে স্টেশনে রেখে এলো। ঘরে রইলো শুধু একটা ব্রিফকেস—তার মধ্যে তার সংকেতলিপির ছাপানো অংশ আর দু-একখানা বই। রাতের খাওয়া সেরে নিলো অ্যাশেনডেন। তারপর হোটেলে ফিরে নির্লোম মেক্সিকানটির জন্যে প্রতীক্ষায় বসে রইলো। সে যে অত্যধিক বিচলিত হয়ে উঠেছে তা সে নিজের কাছেও লুকিয়ে রাখতে পারছিলো না। একটা বই পড়তে শুরু করলো অ্যাশেনডেন। কিন্তু বইটা ক্লান্তিকর ঠেকলো। অন্য একটা বই তুলে নিলো সে। কিন্তু মনটা অন্যত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলো। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালো সে। সবে তো সন্ধ্যে! ফের বইটা তুলে নিলো অ্যাশেনডেন—ঠিক করলো, ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়া শেষ না হওয়া অব্দি সে আর ঘড়ির দিকে তাকাবে না। কিন্তু একমনে পাতার পর পাতা পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও বিষয়বস্তুটা তার কাছে ঠিক স্পষ্ট হলো না। ফের ঘড়ির দিকে তাকালো সে। হে ভগবান, মাত্র সাড়ে দশটা! অ্যাশেনডেন ভাবতে লাগলো নির্লোম মেক্সিকানটা এখন কোথায়, কি করছে। তার ভয় হচ্ছিলো, লোকটা যদি সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলে! তার পরেই তার মনে হলো, জানলাগুলো বন্ধ করে পর্দাগুলো টেনে রাখাই ভালো। ইতিমধ্যে

অসংখ্য সিগারেট টেনেছে সে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো, রাত পৌনে এগারোটা। হঠাৎ একটা কথা মনে আসতেই তার হৃৎপিণ্ডটা যেন বুকের মধ্যে ধাক্কা মারতে লাগলো। কৌতূহলবশে নিজের নাড়ি পরীক্ষা করতে লাগলো অ্যাশেনডেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলো, নাড়ির গতি একেবারে স্বাভাবিক। রাতটা গরম, ঘরের মধ্যে গুমোট—অথচ তার হাতপাগুলো বরফের মতো ঠাণ্ডা। বিরক্ত হয়ে অ্যাশেনডেন ভাবলো, এ কি অশান্তি—যা আদৌ দেখতে চাই না, তেমন ছবি কেন কল্পনায় চোখের সামনে ভেসে উঠছে! লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে সে প্রায়ই কোনো হত্যাকারীকে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বারবারই তার মনে ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্টের সেই ভয়াবহ বর্ণনাটা ভেসে উঠেছে। এ প্রসঙ্গটা নিয়ে সে ভাবতে চায় না, অথচ বারবার এটা নিয়েই সে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে। বইটা অ্যাশেনডেনের হাত থেকে হাঁটুর ওপরে খসে পড়লো—গোলাপের কদর্য নকশা আঁকা বাদামি রঙের দেয়াল-কাগজের দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগলো, নেপলসে কাউকে বাধ্য হয়ে খুন করতে হলে হত্যাকারী কাজটা কোথায় এবং কিভাবে করবে।

ফের সময়টা দেখে নিলো অ্যাশেনডেন। এখন সে ভীষণ ক্লান্ত। এখন সে স্রেফ বসেই আছে, বই পড়ারও চেষ্টা করছে না। মনটা একেবারে শূন্য।

তারপরেই ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে উঠে দাঁড়ালো অ্যাশেনডেন। সমস্ত শরীরের মাংসপেশীগুলো শিউরে উঠলো তার।

'চমকে দিলাম নাকি?' নিলোম মেক্সিকানটা সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললো, 'আমি তো ভাবলাম, দরজায় টোকা না দিলেই আপনি বেশি পছন্দ করবেন!'

'আপনাকে কেউ ভেতরে ঢুকতে দেখেছে?'

'রাতের চৌকিদারটা আমাকে হোটেলে ঢুকিয়েছে। আমি যখন ঘণ্টি বাজালাম, সে তখন ঘুমোচ্ছে। লোকটা আমার দিকে তাকিয়েও দেখেনি। দুঃখিত, বড্ড দেরি করে ফেললাম। কিন্তু পোশাক-টোশাক পালটে আসতে হলো কিনা।'

নিলোম মেক্সিকানের পরনে এখন সেই আগেকার পোশাক, মাথায় সেই পুরনো পরচুলা। পরিবর্তনটা সত্যিই অস্বাভাবিক। এখন ওকে আরও বড়োসড়ো, আরও উদ্দীপ্ত লাগছে। মুখের আদলটাই যেন বদলে গেছে। অ্যাশেনডেনের দিকে এক ঝলক তাকালো মানুষটা, 'আরে, আপনি অতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন যে! ভয় পাননি নিশ্চয়ই?'

'কাগজপত্রগুলো পেয়েছেন?'

'না। ওগুলো লোকটার সঙ্গে ছিলো না। শুধু এগুলো ছিলো।' টেবিলের ওপরে

একটা পেটমোটা পকেট-বই আর একটা পাসপোর্ট রাখলো লোকটা।

'ওগুলো আমি চাই নে, তুলে নিন,' অ্যাশেনডেন দ্রুত বললো।

নির্লোম মেক্সিকান দু কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিনিসগুলো ফের নিজের পকেটে রেখে দিলো।

'কোমরবন্ধের মধ্যে কি ছিলো? আপনি তো বলেছিলেন, লোকটা বারবার শরীরের মধ্যদেশে হাত বুলিয়ে দেখে!'

'শুধু টাকাকড়ি। আমি পকেট-বইটাও খুঁজে দেখেছি—কয়েকটা ব্যক্তিগত চিঠি-পত্র আর কিছু মেয়েমানুষের ছবি ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। আজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে বেরুবার আগে লোকটা নিশ্চয়ই কাগজপত্রগুলো স্যুটকেসে চাবি বন্ধ করে রেখে গেছিলো।'

'নিকুচি করেছে।'

'ওর ঘরের চাবিটা আমার কাছে আছে। আমরা বরঞ্চ ওর মালপত্রগুলো একটু খুঁজে দেখি।'

পাকস্থলির গভীরে এক ধরনের অসুস্থতার অনুভূতি টের পেলো অ্যাশেনডেন। সামান্য ইতস্তত করতে লাগলো সে।

'কোনো ঝুঁকি নেই, দোস্ত,' যেন একটা বাচ্চা ছেলেকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মেক্সিকানটা বললো। 'তবে আপনার ভালো না লাগলে আমি একাই যাবো।'

'না, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো,' অ্যাশেনডেন বললো।

'হোটেলে কেউ জেগে নেই। মিঃ আন্দ্রেইদিও আমাদের বিরক্ত করবে না। ইচ্ছে হলে আপনার জুতোজোড়া খুলে নিন।'

অ্যাশেনডেন কোনো জবাব দিলো না। হাত দুটো সামান্য কাঁপছে দেখে ভ্রু কোঁচকালো সে। তারপর ফিতের বাঁধন খুলে জুতো দুটো পা থেকে খুলে নিলো। মেক্সিকানটিও তা-ই করলো।

'আপনি বরঞ্চ আগে যান,' লোকটা বললো। 'বাঁ দিকে ঘুরে বারান্দা ধরে সোজা এগিয়ে যাবেন। আটত্রিশ নম্বর ঘর।'

অ্যাশেনডেন ঘরের দরজা খুলে বাইরে পা বাড়ালো। নির্দিষ্ট দরজার কাছে পৌঁছে মেক্সিকানটি চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুললো। তারপর ভেতরে ঢুকে আলো জ্বাললো। এবারে অ্যাশেনডেন ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। সে লক্ষ্য করলো, জানলার শার্সিগুলোও বন্ধ রয়েছে।

'ব্যাস, এবারে আমরা নিরাপদ। এখন আমরা ইচ্ছেমতো সময় নিতে পারি।' পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে চেষ্টা করতে করতে অবশেষে সঠিক চাবির

সন্ধান পেলো লোকটা। স্যুটকেসটা পোশাক-আশাকে ঠাসা। 'সস্তা পোশাক,' পোশাকগুলো বের করতে করতে মেক্সিকানটি অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বললো। 'আমার নিজস্ব মত হচ্ছে, সবচাইতে সেরা জিনিস কিনলে আখেরে সেটা সবচাইতে সস্তা পড়ে।'

'কথা কি বলতেই হবে?' অ্যাশেনডেন জিগেস করলো।

'বিপদের মশলা এক এক জনের ওপরে এক এক রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আমাকে তা স্রেফ উত্তেজিত করে, আর আপনার মেজাজ বিগড়ে দেয়।'

'দেখুন আমি ভয় পাচ্ছি, কিন্তু আপনি পাননি।' অ্যাশেনডেন অকপট সারল্যে স্বীকার করলো।

'ওটা স্রেফ স্নায়ুর ব্যাপার।'

ইতিমধ্যে মেক্সিকানটি দ্রুত হাতে পোশাকগুলো নামিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে সে-গুলোর তল্লাশি সেরে নিয়েছিলো। স্যুটকেসের মধ্যে কোন রকমের কোনো কাগজপত্র নেই। এবারে ছুরিটা বের করে স্যুটকেসের ভেতরকার কাপড়ের আস্তরণটা ছিঁড়ে ফেললো সে। কিন্তু জিনিসটা নেহাতই সস্তা, ভেতরের কাপড়টা গঁদ দিয়ে সাঁটা—ওর মধ্যে কিছু লুকিয়ে রাখাই সম্ভব নয়।

'এখানে নেই। নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে কোথাও লুকোনো আছে।'

'কাগজগুলো লোকটা কোনো অফিসে জমা রাখেনি তো? যেমন ধরুন, কোনো বাণিজ্যিক দূতাবাসে?'

'দাড়ি কামাবার সময়টুকু বাদে লোকটা এক মুহূর্তের জন্যেও আমার চোখের আড়াল হয়নি।'

নির্লোম মেক্সিকানটি এবারে বাসনের আলমারি আর দেরাজের টানাগুলো খুলে খুলে দেখলো। মেঝেতে কোনো ফরাশ পাতা নেই। কিন্তু সে খাটের তলা, তোশকের তলাও খুঁজে দেখলো। গোপন জায়গার সন্ধানে ওপরে-নিচে ছুটে বেড়াতে লাগলো তার কালো চোখ দুটো। অ্যাশেনডেনের মনে হলো, ওই চোখ দুটোর নাগাল থেকে কিছুই এড়িয়ে যেতে পারে না।

'যদি নিচের কেরানীটার কাছে রেখে থাকে?'

'আমি তা জানতে পারতাম। তাছাড়া তেমন সাহস লোকটার হবে না। কিন্তু এখানে নেই। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছিনে।' রহস্য সমাধানের প্রয়াসে মেক্সিকানটি ভ্রূ-কোঁচকালো।

'এবারে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি, চলুন,' অ্যাশেনডেন বললো।

'এক মিনিট।'

হাঁটু মুড়ে বসে মেক্সিকানটি দ্রুত এবং নিখুঁত ভাবে পোশাকগুলো ভাঁজ করে সেগুলো স্যুটকেসে রেখে, স্যুটকেসটা চাবি বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো। তারপর আলো নিভিয়ে আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে বাইরের দিকে তাকালো। অ্যাশেনডেনকে ইঙ্গিতে ডেকে, বাইরে বেরিয়ে এলো সে। অ্যাশেনডেন বাইরে আসতেই সে দরজাটা চাবি বন্ধ করলো। তারপর চাবিটা পকেটে গুঁজে, অ্যাশেনডেনের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে অ্যাশেনডেন নিজের কপাল ও স্যাঁতসেঁতে হাত দুটো মুছে নিলো, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছি!'

'ওখানে কিন্তু সত্যিই এতোটুকুও বিপদ ছিলো না। কিন্তু এখন আমরা কি করবো? কাগজগুলো না পাওয়ায় কর্নেল তো চটে যাবেন!'

'আমি ভোর পাঁচটার ট্রেনে রোমে যাচ্ছি। ওখান থেকে নির্দেশ জানতে চেয়ে তার পাঠাবো।'

'খুব ভালো কথা। আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।'

'আমার মনে হয় আপনার পক্ষে এ দেশ থেকে আরও তাড়াতাড়ি সরে পড়াটাই বেশি মঙ্গলজনক হবে। কালই একটা জাহাজ বার্সিলোনাতে যাচ্ছে। আপনি সেটা-তেই যান না কেন? দরকার হলে আমি না হয় সেখানে গিয়েই আপনার সঙ্গে দেখা করবো।'

'আমাকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে আপনি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন দেখছি!' নির্লোম মেক্সিকান সামান্য হাসলো, 'বেশ, আমি বার্সিলোনাতেই যাবো। আমার কাছে স্পেনের ভিসা আছে।'

অ্যাশেনডেন ঘড়ির দিকে তাকালো। মাত্র কিছুক্ষণ আগে দুটো বেজেছে। তার মানে এখনও তাকে প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। তার সঙ্গীটি আয়েস করে একটা সিগারেট পাকিয়ে জিগেস করলো, 'ছোট্ট করে একটু খাওয়া-দাওয়া করলে কেমন হয়? আমার তো নেকড়ের মতো খিদে পেয়েছে।'

খাবারের কথা ভাবতেই অ্যাশেনডেনের শরীর উলটে এলো। কিন্তু তার ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছিলো। নির্লোম মেক্সিকানের সঙ্গে সে বাইরে যেতে চায় না, অথচ একা একা হোটেলে থাকার ইচ্ছেও তার নেই।

'এতো রাতে কোথায় যাবেন?'

'চলুন আমার সঙ্গে। আমি আপনাকে জায়গা খুঁজে দেবো।'

টুপিটা মাথায় চাপিয়ে ব্রিফকেসটা হাতে তুলে নিলো অ্যাশেনডেন। সিঁড়ি ভেঙে নিচে গিয়ে দেখলো, হলঘরের মেঝেতে একটা গদির ওপরে শুয়ে দারোয়ানটা

অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাছে লোকটার ঘুম ভেঙে যায়, তাই আলতো পায়ে ডেস্কটা পেরিয়ে গেলো দুজনে। অ্যাশেনডেন লক্ষ্য করলো, চিঠি রাখার খুপরিগুলোর মধ্যে তার ঘরের খুপরিতে একটা চিঠি রয়েছে। ওটা বের করে নিয়ে সে দেখলো, চিঠিটা তার নামেই লেখা হয়েছে। পা টিপে টিপে হোটেল থেকে বেরিয়ে দরজাটা টেনে দিলো ওরা। তারপর দ্রুত পায়ে শখানেক গজ হেঁটে গিয়ে, একটা আলোক স্তম্ভের নিচে দাঁড়িয়ে অ্যাশেনডেন পকেট থেকে চিঠিটা বের করে দেখলো সেটা বাণিজ্য দূতাবাস থেকে এসেছে। তাতে লেখা হয়েছে: 'সঙ্গের তারবার্তাটা আজ রাতেই এসেছে। যদি ওটা জরুরী হয়, তাই দূত মারফত আপনার হোটেলে পাঠিয়ে দিলাম'। তার মানে মাঝরাতের খানিকক্ষণ আগে, যখন অ্যাশেনডেন নিজের ঘরে বসেছিলো, তখনই ওটা হোটেলে ছেড়ে যাওয়া হয়েছে। তারবার্তাটা খুলে অ্যাশেনডেন দেখলো, সেটা সাঙ্কেতিক ভাষায় পাঠানো হয়েছে।

'তাহলে এখন এটা থাক,' তারবার্তাটা ফের পকেটে গুঁজে রাখলো অ্যাশেনডেন।

নির্জন রাস্তা ধরে নির্লোম মেক্সিকানটা এমনভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলো যেন নিজের রাস্তা সে ভালোভাবেই চেনে। অ্যাশেনডেন হাঁটছিলো তার পাশে পাশে। অবশেষে একটা অন্ধ গলিতে একটা হট্টগোলে ভরা জঘন্য সরাইতে গিয়ে ঢুকলো সে। বললো, 'এটা রিৎজ নয়, তবে এতো রাতে একমাত্র এ ধরনের জায়গাতেই আমাদের কিছু খেতে পাবার সম্ভাবনা আছে।'

অ্যাশেনডেন দেখলো, সে একটা লম্বা হতশ্রী ঘরে এসে ঢুকেছে। ঘরের অন্য প্রান্তে শুঁটকো চেহারার এক যুবক একটা পিয়ানোর কাছে বসে আছে। দুধারে দেয়ালের কাছ বরাবর টেবিল এবং তার সামনে বেঞ্চি পাতা। বেশ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন। মহিলারা বয়স্কা, মুখে রং করা, বীভৎসদর্শনা। ওদের কর্কশ উচ্ছলতা একই সঙ্গে কোলাহলময় এবং প্রাণহীন। সকলেই বিয়ার ও মদ্য পান করছিলো। অ্যাশেনডেন এবং নির্লোম মেক্সিকানটি ভেতরে ঢুকতেই সকলে ওদের দিকে ফিরে তাকালো। অ্যাশেনডেন অনুভব করলো, তার সামান্য ইঙ্গিতময় কটাক্ষেই ওই মহিলারা মৃদু হাসিতে গলে পড়তে প্রস্তুত। তাই তাদের বিলোল কটাক্ষ এড়াবার জন্যে সে কুর্সিতে বসে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখলো। ইতিমধ্যে শুঁটকো চেহারার যুবকটি পিয়ানোতে সুর ধরতেই কয়েকটি যুগল উঠে নাচতে শুরু করেছে। পুরুষের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি না থাকায় কয়েকটি মহিলা নিজেরাই একসঙ্গে নাচছে। জেনারেল দু প্লেট স্পাগেত্তি আর এক বোতল ক্যাপ্রি মদ আনার ফরমাশ দিয়েছিলো। মদটা এসে হাজির হতেই সে লোভীর মতো পুরো এক গ্লাস খালি করে, পাস্তার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অন্যান্য

টেবিলে বসে থাকা মহিলাদের দিকে তাকাতে লাগলো।

'আপনি নাচেন কি?' অ্যাশেনডনকে প্রশ্ন করলো লোকটা। 'আমি এদের মধ্যেই একটি মহিলাকে আমার সঙ্গে একপাক নাচতে বলবো।

কুর্সি ছেড়ে উঠে মেক্সিকানটি যে মহিলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, অ্যাশেনডেন লক্ষ্য করলো তার অন্তত চোখ দুটো ঝকঝকে আর দাঁতগুলো সাদা। মহিলা উঠে দাঁড়ালো, মেক্সিকানটি নিজের হাত মেলে দিয়ে ওকে বেষ্টন করে ধরলো। ভালোই নাচে লোকটা। অ্যাশেনডেন দেখলো, সে কথা বলতে শুরু করেছে। মহিলা হাসলো। যে নির্বিকার ভঙ্গিতে মহিলা মেক্সিকানটির নাচের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা আগ্রহে রূপান্তরিত হয়ে উঠলো। শীগগিরি ওরা খোস মেজাজে গল্প জুড়ে দিলো। তারপর নাচ শেষ হলো। মহিলাকে নিজের টেবিলে পৌঁছে দিয়ে, মেক্সিকানটি অ্যাশেনডেনের কাছে ফিরে এসে ফের এক গ্লাস মদ্য পান করলো।

'কেমন মনে হলো আমার মালটিকে?' অ্যাশেনডেনকে জিগেস করলো সে। 'মন্দ নয়, তাই না? নাচ জিনিসটা শরীরের পক্ষে উপকারী। আপনি ওদের কাউকে আপনার সঙ্গে নাচতে বলুন না? জায়গাটা কিন্তু বেশ ভালো, তাই না? এ ধরনের জায়গা খুঁজে বের করার ব্যাপারে আপনি সব সময় আমার ওপরে নির্ভর করতে পারেন। এ ব্যাপারে আমার একটা সহজ দক্ষতা আছে।'

পিয়ানো-বাদক ফের বাজনা শুরু করতেই মহিলা মেক্সিকানটির দিকে তাকালো এবং লোকটা বুড়ো আঙুল তুলে নাচের জায়গাটা দেখাতেই মহিলা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। নির্লোম মেক্সিকান কোটের বোতাম এঁটে, পিঠটা বাঁকিয়ে শরীরটা একটু ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের টেবিলের কাছেই মহিলার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। মহিলাকে সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচালো, কথা বলতে বলতে হাসলো। ইতিমধ্যেই ঘরের প্রত্যেকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেছে। স্প্যানিশ উচ্চারণে ভরতরে ইতালিয় ভাষায় সে এর-ওর-তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করছে। তার বাকচাতুর্যে সবাই হাসছে। হঠাৎ পরিচারককে দুটো প্লেটে স্তূপাকৃতি ম্যাকারনী নিয়ে আসতে দেখে মেক্সিকানটি নাচ থামিয়ে দিলো। তারপর ভদ্রতার কোনো রকম রীতিনীতি না মেনে, মহিলাকে তার ইচ্ছে মতো টেবিলে চলে যেতে দিয়ে, সে তাড়াতাড়ি এসে খেতে শুরু করে দিলো।

'আপনি একটু ম্যাকারনী খাবেন তো, তাই না?'

'আমার খিদে নেই,' অ্যাশেনডেন জবাব দিলো।

কিন্তু খেতে শুরু করে সে অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করলো, আসলে সে ক্ষুধার্ত। নির্লোম মেক্সিকানটি গোগ্রাসে গিলছিলো। যে মহিলা তার সঙ্গে নাচছিলো, সে

এই স্বল্প অবকাশেই নিজের সমস্ত কথা জেনারেলকে জানিয়ে দিয়েছিলো। জেনারেল এখন তা আবার অ্যাশেনডনের কাছে পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। ফের এক বোতল মদ আনার ফরমাশ দিয়ে সে জিগেস করলো, 'কি, দোস্ত, এখন আগের চাইতে ভালো লাগছে তো?'

'আমি বলতে বাধ্য—লাগছে।' অ্যাশেনডেন মৃদু হাসলো।

'অনুশীলন—এখন আপনার শুধু দরকার অনুশীলন, চর্চা।'

অ্যাশেনডেনের বাহুতে মৃদু চাপড় দেবার জন্যে হাত বাড়ালো মানুষটা।

'ওটা কি?' অ্যাশেনডেন চমকে উঠলো, 'আপনার আস্তিনের সামনের দিকটায় ও কিসের দাগ?'

'ওটা?' নির্লোম মেক্সিকানটি নিজের আস্তিনের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলো, 'ওটা কিছু নয়। রক্তের দাগ। ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে, আমি নিজেই কেটে ফেলেছি।'

অ্যাশেনডেন নিশ্চুপ হয়ে গেলো। দরজার ওপরের দিকে ঝোলানো ঘড়িটাকে খুঁজতে চাইলো তার চোখ দুটো।

'আপনি কি আপনার ট্রেনের জন্যে উদ্বিগ্ন? দাঁড়ান, আর একবার নেচে নিই। তারপর আমিই আপনাকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে যাবো।'

কুর্সি ছেড়ে উঠে মেক্সিকানটি চরম আত্মবিশ্বাসে সবচাইতে কাছে বসে থাকা মহিলাটিকে নিজের বাহুবন্ধনে আঁকড়ে ধরে নাচতে নাচতে দূরে চলে গেলো। সোনালি পরচুলা আর নির্লোম মুখে লোকটার চেহারা একেবারে ভয়ঙ্কর, অথচ নাচের সময় তার গতিভঙ্গিমা সত্যিই অনুপম। এতো অপরূপ তার ছন্দ যে স্পষ্টই বোঝা যায়, জাঁকালো পোশাক পরা নৃত্যসঙ্গিনীটিও তার ভঙ্গিমায় মাতাল হয়ে উঠেছে। দেখতে জঘন্য কুৎসিত হলেও এখন লোকটার মধ্যে বেড়ালের মতো এক ধরনের ত্রস্ত চমৎকারিত্ব এসে গেছে, যাকে এক ধরনের সৌন্দর্যও বলা চলে এবং সেই কারণেই লজ্জাজনক হলেও, লোকটার প্রতি মনের মধ্যে এক ধরনের গোপন আকর্ষণ জেগে ওঠে। লোকটাকে দেখে প্রাক-অ্যাজটেক যুগের পাথরে কুঁদে তোলা মূর্তির কথা মনে হয় অ্যাশেনডেনের—যে মূর্তিতে আছে বর্বরতা আর প্রাণশক্তি, যা ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর, অথচ তা সত্ত্বেও যার মধ্যে আছে এক বিষণ্ণ ও ইঙ্গিতময় সৌন্দর্য।

নাচতে নাচতে অ্যাশেনডেনের কাছ দিয়ে যাবার সময় নির্লোম মেক্সিকানটি খুশিয়াল ভঙ্গিমায় হাত নাড়লো, 'বাজনা থামলেই আমি এসে পড়বো। আপনি টাকাকড়ি মিটিয়ে ফেলুন।'

লোকটার মনের ভেতরটা দেখতে ইচ্ছে করছিলো অ্যাশেনডেনের। কিভাবে

যে ওর মনটা কাজ করে তা অ্যাশেনডেন কল্পনাও করতে পারে না। একটু পরেই সুরভিত রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ফিরে এলো লোকটা।

'সময়টা ভালো কাটলো তো, জেনারেল?' অ্যাশেনডেন জিগেস করলো।

'আমার সময় সর্বদাই ভালো কাটে। মালটা নেহাতই রদ্দি ছিলো, কিন্তু তাতে আমার কি এসে-যায়? দু হাতের বাঁধনে কোনো মেয়েমানুষের শরীরকে জড়িয়ে রাখার অনুভূতিটাই আমার ভালো লাগে। আমার প্রতি তীব্র কামনায় মেয়েমানুষ-টার অস্থিমজ্জাগুলো রোদে-রাখা মাখনের মতো গলে যাবে, চোখ দুটো নিস্তেজ হয়ে উঠবে, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে যাবে—এ দৃশ্য আমার ভীষণ প্রিয়। ওই বেচারী ফর্সা মাগীটা নেহাতই রদ্দি ছিলো, তবে মেয়েমানুষ তো বটে!'

ওরা বেরিয়ে এলো। মেক্সিকানটি পায়ে হেঁটে যাবার প্রস্তাব রাখলো। এতো রাতে এই অঞ্চলে ট্যাক্সি পাবার সম্ভাবনাও নিতান্ত কম। আকাশটা তারায় তারা-ময়। গ্রীষ্মের রাত। বাতাস যেন থমকে আছে। মৃত মানুষের প্রেতাত্মার মতো নৈঃশব্দ্য যেন তাদের পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো। স্টেশনে শুধু দু-একজন কুলি ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। বিরাম-কক্ষটা শূন্য, তবু নির্লোম মেক্সিকান আর অ্যাশেনডেন একে-বারে কোণের দিকে গিয়ে বসলো।

'আমার ট্রেন ছাড়তে এখনও এক ঘণ্টা বাকি। ততোক্ষণে দেখি, এই তারটায় কি খবর আছে।' পকেট থেকে তারবার্তা আর ব্রিফকেস থেকে সংকেত লিপির বইটা বের করে নিলো অ্যাশেনডেন। সংকেতের দুটো অংশ—একটা তার ব্রিফ-কেসের ছিপছিপে বইটা অন্যটা একটা সাদা কাগজে লিখে তাকে দেওয়া হয়েছিলো এবং অ্যাশেনডেন মিত্রপক্ষের অঞ্চল ছেড়ে চলে আসার সময়ই সেটা মুখস্থ করে নষ্ট করে ফেলেছে। চশমা সেঁটে কাজ শুরু করলো অ্যাশেনডেন। নির্লোম মেক্সিকান তখন নিজের কোণটিতে বসে সিগারেট পাকাচ্ছে আর টানছে। অ্যাশেনডেন কি করছে না করছে সেদিকে তার বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নেই। সংখ্যাগুলোকে শব্দে পরি-বর্তন করে একটা আলাদা কাগজে লিখতে লাগলো অ্যাশেনডেন। এই ধরনের কাজ করার সময় সে শব্দগুলোকে কখনও খেয়াল করে লেখে না। কারণ সে দেখেছে, শব্দগুলোর অর্থ সম্পর্কে সচেতন থাকলে পুরো কাজটা শেষ হবার আগেই ঝুপ করে একটা সিদ্ধান্ত ধরে নেওয়া হয় যেটা মানুষকে ভুল করিয়ে দিতে পারে। তাই অনু-বাদের কাজটা সে যান্ত্রিকভাবেই শেষ করে, পর পর শব্দগুলো লিখে যাবার সময় শব্দগুলোর দিকে সে আদৌ মনোযোগী থাকে না। অবশেষে কাজটা শেষ হবার পর সম্পূর্ণ তারবার্তাটা পড়লো অ্যাশেনডেন: 'কনস্তানতিন আন্দ্রেইদি অসুস্থতার জন্যে পাইরেউসে আটকে গেছেন। উনি জাহাজে রওনা হতে পারবেন না। জেনেভাতে

ফিরে এসে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করো।'

প্রথমে অ্যাশেনডেন কিছু বুঝতে পারলো না। ফের নিজের লেখাটা পড়লো সে। তারপরেই তার মাথা থেকে পা অব্দি কেঁপে উঠলো। এবং এই একবারের জন্যে আত্ম-সংযম হারিয়ে সে বোকার মতো ক্রুদ্ধ হিংস্র কর্কশ গলায় ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো, 'হতভাগা আহাম্মুক, তুমি ভুল লোককে খুন করে এসেছো!'

স্বপ্ন

ঘটনাচক্রে ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে চাকরির খাতিরে আমাকে নিউইয়র্ক থেকে পেত্রোগ্রাদে যেতে হয়েছিলো এবং নিরাপত্তার খাতিরে আমাকে তখন ভ্লাডিভোস্টক হয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। সকালবেলা সেখানে নেমে সারাটা দিন আমি যথাসম্ভব ভালোভাবেই একটা অলস দিন কাটিয়ে দিলাম। যতোদূর মনে পড়ে, রাত নটা নাগাদ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান ট্রেনটার ছাড়ার কথা ছিলো। স্টেশনের রেস্তোরাঁতে আমি একা একাই খাওয়াদাওয়া সেরে নিলাম। রেস্তোরাঁতে ভীষণ ভিড় ছিলো এবং যে লোকটির সঙ্গে আমি ছোট্ট একটা টেবিলের ভাগীদার হয়েছিলাম, তাঁর চেহারাটা আমাকে খুব মজা দিয়েছিলো। লোকটি রুশ, লম্বা চেহারা, কিন্তু ভীষণ গাট্টাগোট্টা—এমন একখানা ভুঁড়ি যে তাঁকে বাধ্য হয়েই টেবিল থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে বসতে হয়েছিলো। আকৃতির তুলনায় তাঁর হাত দুটো ছিলো ছোটো ছোটো, চর্বির থাকের মধ্যে ডোবানো। চুলগুলো লম্বা, কালো, পাতলা এবং টাক লুকোবার জন্যে মাথার এধার থেকে ওধার অব্দি সযত্নে টেনে আঁচড়ানো। গালে-গলায় এক হয়ে যাওয়া প্রকাণ্ড মুখখানা নিখুঁতভাবে কামানো। নাকটা বেজায় ছোটো, যেন একতাল মাংসের ওপরে ছোট্ট একটা বোতাম। চকচকে কালো চোখ দুটোও খুদে খুদে। কিন্তু ঠোঁট দুটো বিশাল এবং লাল। লোকটির পরনে ছিলো নিখুঁত ছাঁটের কালো স্যুট। স্যুটটা জীর্ণ নয়, তবে হতশ্রী—দেখে মনে হয় প্রথমবারের পর থেকে ওটা আর ইস্ত্রি করা বা বুরুশ দিয়ে ঝাড়া হয়নি।

রেস্তোরাঁয় পরিবেশনের বন্দোবস্ত ভালো ছিলো না, কোনো পরিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও ছিলো এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আলাপ-সালাপ করতে শুরু করে দিলাম। রুশটি তরতর করে সুন্দর ইংরেজী বল-ছিলেন। উচ্চারণে একটা ঝোঁক আছে, তবে তা ক্লান্তিকর নয়। আমার এবং আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বহু প্রশ্নই জিগেস করলেন। সে সময় আমার যা

পেশা, তাতে আমার পক্ষে সাবধান হয়ে কথাবার্তা বলার প্রয়োজন ছিলো। তাই খোলাখুলি কথা বলার ভান দেখিয়ে, অথচ প্রকৃত ঘটনা গোপন রেখে, আমি তাঁর প্রশ্নাবলীর জবাব দিলাম। আমি ওঁকে বললাম, আমি একজন সাংবাদিক। উনি জিগেস করলেন আমি গল্প-উপন্যাস লিখি কিনা এবং আমি যখন স্বীকার করলাম যে অবসর মুহূর্তে আমি সেসব লিখে থাকি, তখন উনি পরবর্তী যুগের রুশ ঔপন্যাসিক-দের নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। ওঁর কথাবার্তা বুদ্ধিদীপ্ত। স্পষ্টই বোঝা যচ্ছিলো ভদ্রলোক শিক্ষিত।

ইতিমধ্যে আমরা পরিচারকটিকে কোনোক্রমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাঁধাকপির স্যুপ আনিয়ে নিয়েছি। এবারে ভদ্রলোক তাঁর পকেট থেকে ছোট্ট একটা ভদকার বোতল বের করে আমাকে অংশ গ্রহণ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। ভদকার প্রভাব না কি জাতিগত স্বাভাবিক বাকপটুত্বের জন্যে জানি না, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই—আমি কিছু জিগেস না করা সত্ত্বেও—উনি নিজের সম্পর্কে অনেক কথাই আমাকে বলে ফেললেন। মনে হলো, এক বড় বংশে ওঁর জন্ম। পেশায় উনি আইনজীবী এবং একজন সংস্কারপন্থী। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝামেলা হবার দরুন বহুদিন ওঁকে বিদেশে কাটাতে হয়েছে, এখন দেশে ফিরছেন। কাজের খাতিরে ব্লাডিভোস্টকে উনি আটকে গিয়েছিলেন, আশা করছেন এক সপ্তাহের মধ্যেই মস্কোতে রওনা হবেন এবং আমি সেখানে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করলে উনি যারপর নাই খুশি হবেন।

'আপনি কি বিবাহিত?' উনি জিগেস করলেন।

কথাটা ওঁর জানার কি প্রয়োজন, বুঝতে পারলাম না। তবু জানালাম, আমি বিবাহিত।

'আমি একজন বিগতদার মানুষ,' ভদ্রলোক সামান্য দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আমার স্ত্রী ছিলো একজন সুইস, জেনেভার মেয়ে। খুবই কৃষ্টিসম্পন্ন মহিলা। নিখুঁত ইংরেজী, জার্মান আর ইতালিয় ভাষায় কথা বলতো। আর ফরাসী তো ছিলো ওর মাতৃভাষা। বিদেশীদের তুলনায় ওর রুশ ভাষায় দক্ষতা ছিলো সাধারণের চাইতে অনেক বেশি। উচ্চারণে কোনো ঝোঁক প্রায় ছিল না বললেই চলে।'

ট্রের উপরে একরাশ প্লেট নিয়ে একজন পরিচারক আমাদের কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছিলো। আমি রুশ ভাষা প্রায় কিছুই জানি না—তবু মনে হলো ভদ্রলোক পরি-চারকটিকে ডেকে জিগেস করলেন, পরবর্তী পদের জন্যে আমাদের আর কতোক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হবে। লোকটা হড়বড় করে সম্ভবত ভদ্রলোককে আশ্বাস জানিয়েই ফের দ্রুতপায়ে চলে গেলো। ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'বিপ্লবের পর থেকে রেস্তোরাঁগুলোয় পরিবেশন ব্যবস্থা একেবারে জঘন্য হয়ে উঠেছে।'

ভদ্রলোক তাঁর বিংশতিতম সিগারেটটি ধরালেন আর আমি হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, রওনা হবার আগে আমার কপালে মোটামুটি একটু পেট ভরে খাওয়া জুটবে কিনা।

'আমার স্ত্রী ছিলো এক অসাধারণ মহিলা।' ভদ্রলোক ফের বলতে লাগলেন, 'পেত্রোগ্রাদের যে সমস্ত সেরা স্কুলগুলোতে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের মেয়েরা পড়াশুনো করে, তেমনি একটা স্কুলে ও ভাষা শেখাতো। বেশ কতকগুলো বছর আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতোই একসঙ্গে বাস করেছি। তবে ওর স্বভাবটা ছিলো হিংসুটে ধরনের, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাকে ও সকলের কাছ থেকে আলাদা করে রাখতে চাইতো।'

আমার পক্ষে হাসি সামলে রাখা মুশকিল হচ্ছিলো। অমন কুৎসিত চেহারার মানুষ আমি জীবনেও দেখিনি। আরক্তিম ও সদাপ্রফুল্ল মোটা মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে এক ধরনের সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু এই বিষাদময় স্থূলত্ব বড়ো বিরক্তিকর।

'ওর প্রতি আমি বিশ্বস্ত ছিলাম, এমন ভান আমি করছি না। ওকে আমি যখন বিয়ে করি তখন ও ছেলেমানুষটিও ছিলো না। দশ বছর আমরা বিবাহিত জীবন কাটিয়েছি। ওর চেহারাটা ছিলো ছোটোখাটো, রোগা-পাতলা। গায়ের রঙটা ফর্সা ছিলো না। ওর মধ্যে অধিকারবোধ বড়ো তীব্র ছিলো। ও ছাড়া অন্য কাউকে আমার ভালো লাগবে, ও তা সহ্য করতে পারতো না। শুধুমাত্র আমার চেনাজানা মহিলাদেরই নয়—আমার বন্ধু-বান্ধব, আমার বেড়ালটা, আমার বইপত্র ...সব কিছুকেই ও হিংসে করতো। একবার আমার অনুপস্থিতিতে ও আমার একটা কোট কাকে যেন দান করে দিয়েছিলো, তার একমাত্র কারণ—আমি অন্য কোনো কোটই অতো পছন্দ করতাম না। কিন্তু আমি ধীর স্থির প্রকৃতির মানুষ। ওকে আমার একঘেয়ে লাগতো তা অস্বীকার করছি না, কিন্তু ওর বদমেজাজকে আমি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলেই মেনে নিয়েছিলাম। যতোক্ষণ পর্যন্ত অস্বীকার করা সম্ভব হতো, আমি ওর অভিযোগগুলোকে অস্বীকার করে যেতাম এবং যখন তা অসম্ভব হয়ে উঠতো, আমি স্রেফ দু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে বসে সিগারেট টানতাম।

'ও অনবরত আমার সঙ্গে যে ঝগ্গাট-ঝামেলাগুলো করতো, তাতে আমার তেমন কিছু এসে-যেতো না। আমি আমার নিজের মতো করে জীবন কাটাতাম। মাঝে মাঝে সত্যি সত্যিই ভাবতাম, ও আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে নাকি ভীষণ ঘৃণা করে। মনে হতো, প্রেম আর ঘৃণার মধ্যে সম্পর্কটা ভীষণ ঘনিষ্ঠ।

'হয়তো এমনি করেই অধ্যায়টার পরিসমাপ্তি অব্দি আমরা একসঙ্গে জীবন কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু একদিন রাত্রে একটা ভারি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেলো। স্ত্রীর

তীক্ষ্ণ চিৎকারে আমার ঘুম ভাঙলো। চমকে উঠে ওর কাছে জানতে চাইলাম, কি হয়েছে। ও বললো, ও একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছে…দেখেছে, আমি ওকে খুন করার চেষ্টা করছি। আমরা একটা বিশাল অট্টালিকার ওপরের তলায় থাকতাম এবং যে গর্তটাকে ঘিরে সিঁড়িটা ওপরের দিকে উঠে গেছে সেটা বেশ চওড়া। ও স্বপ্ন দেখেছে, আমরা সবেমাত্র ওপর তলায় পৌছতেই আমি ওকে চেপে ধরে থামটা টপকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিলাম। সিঁড়ির ছ তলা নিচের চত্বরটা শান বাঁধানো এবং ওপর থেকে সেখানে পড়ে যাওয়ার অর্থ, নিশ্চিত মৃত্যু।

'ও ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। আমি ওকে শান্ত করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু পরদিন সকালে এবং দু-তিন দিন বাদে ও ফের ওই প্রসঙ্গটা তুললো। আমি হেসে উড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্য করলাম, ব্যাপারটা ওর মনের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে। আমিও বিষয়টা নিয়ে না ভেবে পারছিলাম না। কারণ স্বপ্নটা আমাকে এমন একটা জিনিস দেখিয়ে দিয়েছিলো যা আমি আগে চিন্তাও করিনি। আমার স্ত্রী জানতো আমি ওকে ঘৃণা করি এবং ওর হাত থেকে রেহাই পেলে আমি খুশি হবো। ও জানতো, ও অসহ্য এবং কোনো কোনো সময়ে ওর এ কথাও মনে হতো যে আমি ওকে খুন করে ফেলতে পারি। পুরুষমানুষের মনের চিন্তা ধারণার অতীত এবং যে সমস্ত চিন্তা আমাদের মনে এসে ঢোকে তা স্বীকার করতে গেলে আমাদের লজ্জায় পড়তে হয়। কখনও কখনও আমার মনে হয়েছে, ও কোনো প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গেলে ভালো হয়। আবার কখনও কখনও মনে হয়েছে, ওর যন্ত্রণাহীন এবং আকস্মিক মৃত্যুই আমাকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু আমি নিজে থেকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে এই অসহনীয় বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি—এ কথা আমার কখনও কোনোদিনও মনে আসেনি।

'স্বপ্নটা আমাদের দুজনের ওপরেই এক অদ্ভুত ছাপ রেখে গিয়েছিলো। ওটা আমার স্ত্রীকে আতঙ্কিত করে তুলেছিলো—ও আগের তুলনায় একটু কম মুখরা এবং একটু বেশি সহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু আমি সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কিছুতেই নিচের দিকে না তাকিয়ে পারতাম না। মনে হতো, কতো সহজেই না ওর স্বপ্নটাকে সত্যি করে তোলা যায়। সিঁড়ির বেষ্টনী বিপজ্জনক রকমের নিচু। আচমকা একটা ঝটকানি দিলেই কাজ হাসিল। চিন্তাটা আমার মন থেকে সরিয়ে রাখা শক্ত হয়ে উঠলো।

'কয়েক মাস বাদে একদিন রাতে আমার স্ত্রী আবার আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললো। আমি তখন ভীষণ ক্লান্ত আর অবসন্ন। ও তখন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আর কাঁপছে। ফের ওই স্বপ্নটা দেখেছে ও। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ও আমাকে

জিগেস করলো, আমি ওকে ঘেন্না করি কি না। রুশ দিনপঞ্জির সব কজন সাধুসন্তের নামে শপথ করে বললাম, আমি ওকে ভালোবাসি। অবশেষে ও আবার ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু আমি জেগে রইলাম। আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেন দেখতে পাচ্ছি ও সিঁড়ির গর্তের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছিলো আমি যেন ওর চিৎকার শুনতে পাচ্ছি—শুনতে পাচ্ছি শানবাঁধানো মেঝেতে ওর আছড়ে পড়ার শব্দ। আমার সমস্ত শরীর তখন কেঁপে কেঁপে উঠছিলো, আমি কিছুতেই তা থামাতে পারছিলাম না।'

রুশ ভদ্রলোকটি কথা থামালেন। ওঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের লিখন। উনি এতো সুন্দর আর স্বচ্ছন্দভাবে কাহিনীটা বলছিলেন যে আমি তা মন দিয়ে শুনছিলাম। বোতলে তখনও খানিকটা ভদকা ছিলো, উনি সেটা ঢেলে নিয়ে এক চুমুকে গিলে ফেললেন।

'শেষ অব্দি আপনার স্ত্রী কিভাবে মারা গেলেন?' খানিকক্ষণ নীরবতার পর আমি জিগেস করলাম।

একটা নোংরা রুমাল বের করে উনি নিজের কপালটা মুছে নিলেন, 'ঘটনার সে এক অদ্ভুত যোগাযোগ। একদিন অনেক রাতে সিঁড়ির নিচে ওকে ঘাড় মটকে পড়ে থাকতে দেখা যায়।'

'কে ওঁকে ওই অবস্থায় প্রথম দেখতে পায়?'

'একজন ভাড়াটে। ওই মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটে যাবার সামান্য কিছুক্ষণ পরেই উনি বাড়িতে ফেরেন।'

'আর আপনি তখন কোথায় ছিলেন?'

ভদ্রলোক যে কি প্রচণ্ড বিদ্বেষী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন তা আমি বর্ণনা করতে পারবো না। ঝকঝক করে উঠলো ওঁর খুদে খুদে কালো চোখ দুটো।

'সেদিন সন্ধেটা আমি এক বন্ধুর সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। বাড়িতে ফিরেছিলাম আরও এক ঘণ্টা বাদে।'

সেই মুহূর্তে পরিচারকটি প্লেটে করে আমাদের ফরমাশ করা মাংস এনে হাজির করলো এবং রুশ ভদ্রলোকটি রীতিমতো খিদে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপরে। বিশাল বিশাল গরাসে খাবারগুলো মুখে গুঁজতে লাগলেন উনি।

আমি বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। ওই প্রায় অনবগুণ্ঠিত ভঙ্গিতে উনি কি সত্যিই আমাকে বলছিলেন যে উনি নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছেন? ওই অস্বাভাবিক মোটাসোটা আর ঢিলেঢালা স্বভাবের লোকটাকে দেখে তো আদৌ খুনে বলে মনে হয় না! ওঁর তেমন সাহস আছে বলেও আমি বিশ্বাস করতে পারি না। নাকি আমাকে সামনে রেখে উনি স্রেফ ব্যঙ্গভরা রসিকতা করছিলেন এতোক্ষণ?

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার ট্রেন ধরার সময় হয়ে গেলো এবং আমি ওঁকে রেখে চলে গেলাম। সেই থেকে আমি আর ওঁকে দেখিনি। কিন্তু আমি কোনোদিনই সঠিকভাবে বুঝতে পারিনি, সেদিন কথাগুলো উনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন, না কি সেগুলো স্রেফ রসিকতা মাত্র।

পরিবেশ

স্বামী দুপুরে খেতে আসবে বলে বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছিলো ও। সকালের তাজা আমেজটা ফুরিয়ে যেতেই মালয়ী চাকরটা জানলার খড়খড়িগুলো নামিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু ডরিস একটা খড়খড়ি একটুখানি তুলে রেখেছিলো, যাতে নদীটা একটু দেখা যায়। দুপুরের হাঁক ধরানো রোদে নদীতে যেন মৃত্যুর ফ্যাকাশে বিবর্ণতা। একটা স্থানীয় লোক ডিঙ্গিতে চেপে নদী দিয়ে যাচ্ছিলো। ডিঙিটা এতোই ছোটো যে নদীর বুকে সেটাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছিলো না। দিনটার রঙ ধূসর ও পাণ্ডুর, যা তাপের রঙেরই বিভিন্ন মাত্রা। (দিনটা ঠিক যেন নিচু পর্দায় গুঞ্জন তোলা প্রাচ্যের কোনো সুর, যার অনিশ্চিত একঘেয়েমি স্নায়ুগুলোকে উত্ত্যক্ত করে তোলে আর কান দুটো যার সমাপ্তির আশায় বৃথাই প্রতীক্ষা করতে থাকে অধৈর্য হয়ে।) উন্মাদ-উৎসাহে ঘুঘুঁরে পোকাগুলো তাদের বিরক্তিকর গান চালিয়ে যাচ্ছিলো একটানা অবিরাম—ঠিক নুড়ি পাথরে খসখস শব্দ তুলে বয়ে চলা নদীর স্রোতের মতো। হঠাৎ কোনো গায়ক-পাখির চিৎকৃত মধুর তানে তাদের গান চাপা পড়ে গেলো এবং মুহূর্তের জন্যে ইংলণ্ডের শ্যামা পাখির কথা মনে পড়ে বুকটা মুচড়ে উঠলো ডরিসের।

তারপরেই বাংলোর পেছন দিকে মোরাম-বেছানো পথে স্বামীর পায়ের শব্দ শুনতে পেলো ও। পথটা সোজা কাছারি বাড়ি অব্দি চলে গেছে। সেখানেই এতোক্ষণ কাজ করছিলো ওর স্বামী। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে কুর্সি থেকে উঠে পড়লো ডরিস। বাড়িটা খুঁটির ওপরে একটু উঁচু করে তৈরি। সিঁড়ির ছোট্ট সারিটা এক ছুটে পেরিয়ে এলো ওর স্বামী। তার টুপিটা ধরার জন্যে চাকরটা দরজার কাছেই অপেক্ষা করছিলো। খাওয়ার তথা বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে ডরিসকে দেখে আনন্দে চোখ দুটো আলোকিত হয়ে উঠলো মানুষটার।

'এই যে ডরিস, খিদে পেয়েছে নাকি?'

'প্রচণ্ড।'

'স্নান সেরে আসতে আমার এক মিনিট, তারপরেই আমি তৈরি!'

'শীগগিরি এসো,' মৃদু হাসলো ও।

পোশাক-ছাড়ার ঘরে উধাও হয়ে গেলো মানুষটা। তারপরেই মনের আনন্দে বেপরোয়া শিস দেবার আওয়াজ, যার জন্যে ডরিস ওকে সর্বদা বকুনি লাগায়। পোশাক-টোশাক টেনে হিঁচড়ে খুলে মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলছে। বয়েসটা উনত্রিশ, কিন্তু এখনও ও একটা স্কুলের ছেলের মতো—কোনোদিনও বড়ো হবে না। হয়তো এই জন্যেই ওর প্রেমে পড়েছিলো ডরিস। নইলে স্নেহের শত অনুরোধেও ওকে দিয়ে বলানো যাবে না, মানুষটা সুদর্শন। চেহারাটা মোটামুটি বর্তুল। মুখটা লাল, ব্রণ কণ্টকিত এবং পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুগোল। চোখ দুটো নীল। মানুষটাকে ভালো করে লক্ষ্য করে ডরিস তাকে বলতে বাধ্য হয়েছে, তার দেহের একটি অংশও ডরিসের প্রশংসার যোগ্য নয়। ডরিস বহুবারই বলেছে, তার চেহারাটা আদৌ ডরিসের পছন্দসই নয়।

'আমি কখনও বলিনি, আমি দেখতে সুন্দর।' লোকটা মৃদু হাসে।

'আমি যে তোমার মধ্যে কি দেখতে পেয়েছি, জানি না।'

আসলে সেটা ও ভালোভাবেই জানে। মানুষটা হাসিখুশি, প্রাণবন্ত, কোনো কিছুকেই সাংঘাতিক একটা গুরুত্ব দেয় না, সর্বদাই হাসে আর ওকেও হাসায়। জীবনটা ওর কাছে মজার জিনিস, গুরুগম্ভীর কিছু নয়। ওর হাসিটাও ভারি সুন্দর। ও সঙ্গে থাকলে নিজেকে সুখী বলে মনে হয় ডরিসের, মন-মেজাজও ভালো থাকে। ওর খুশিয়াল নীল চোখ দুটোতে গভীর স্নেহের ছবি ডরিসের মনটাকে স্পর্শ করে। এমন ভালোবাসা পেতে বড়ো তৃপ্তি। মধুচন্দ্রিমার সময় একদিন ওর কোলে বসে ডরিস ওর মুখটা নিজের দু হাতে ধরে বলেছিলো, 'তুমি একটা মোটা কুৎসিত লোক, গাই—কিন্তু তোমার মধ্যে একটা চটক আছে। তাই তোমাকে আমি ভালো না বেসে পারি না।'

ডরিসের সমস্ত সত্তায় তখন আবেগের ঢেউ বয়ে গিয়েছিলো, অশ্রুতে ভরে উঠেছিলো ওর চোখ দুটি। ও দেখেছিলো অনুভূতির তীব্রতায় গাইয়ের মুখটা মুহূর্তের জন্যে কুঁকড়ে উঠলো। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলেছিলো, 'মানসিক দিক দিয়ে হাবাগোবা এক মহিলাকে বিয়ে করে কি সাংঘাতিক কাণ্ডই না আমি করেছি!'

ডরিস তখন চাপা গলায় হেসে উঠেছিলো। গাইয়ের জবাব দেবার ধরনটাই এমনি এবং তার কাছ থেকে এ ধরনের জবাবই শুনতে চেয়েছিলো ডরিস।

ভাবতে অবাক লাগে, ন মাস আগেও ডরিস ওর নামটা জানতো না। সমুদ্রের ধারে ছোট্ট একটা জায়গায় মায়ের সঙ্গে এক মাসের ছুটি কাটাতে গিয়েছিলো ডরিস, সেখানেই গাইয়ের সঙ্গে ওর পরিচয়। ডরিস তখন পার্লামেন্টের একজন সদস্যের

সচিব। আর গাই তখন ছুটি কাটাতে দেশে এসেছে। একই হোটেলে উঠেছিলো ওরা। সামান্য কিছু সময়ের মধ্যে ডরিসকে নিজের সমস্ত কথা বলে দিয়েছিলো গাই। সেম্বলুতে তার জন্ম। সেখানকার দ্বিতীয় সুলতানের অধীনে তার বাবা দীর্ঘ তিরিশ বছর চাকরি করেছেন। স্কুল ছাড়ার পর গাইও সেই চাকরিতে যোগ দেয়। সেম্বলুকে সে ভীষণ ভালোবাসে। ডরিসকে সে বলেছিলো, 'শত হলেও ইংলণ্ড আমার কাছে একটা অচেনা জায়গা। সেম্বলুই আমার আসল দেশ।'

সেই সেম্বলু এখন ডরিসেরও দেশ। এক মাসের ছুটিটার শেষে গাই ওকে বিয়ের প্রস্তাব জানায়। এ ব্যাপারটা ঘটবে বলে ডরিস আগেই বুঝতে পেরেছিলো এবং ঠিক করেছিলো, গাইয়ের প্রস্তাবে ও রাজী হবে না। কারণ ও বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান, মাকে ছেড়ে অতো দূরে চলে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মুহূর্তটা যখন এলো, তখন কি যে হয়ে গেলো ডরিস তা জানে না—এক অপ্রত্যাশিত আবেগে ভেসে গিয়ে গাইয়ের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলো ও। আজ চার মাস হলো ওরা এই ছোট্ট মফঃস্বল অঞ্চলটাতে রয়েছে। গাই-ই এখানকার দফতরের প্রধান। ভারি সুখে আছে ডরিস।

একদিন ও গাইকে বলেছিলো, তাকে প্রত্যাখ্যান করবে বলে ও মোটামুটি মনস্থির করে ফেলেছিলো।

'প্রত্যাখ্যান করোনি বলে এখন দুঃখ হচ্ছে, তাই না?' ঝিকমিকে নীল চোখে একরাশ খুশির হাসি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলো গাই।

'প্রত্যাখ্যান করলে স্রেফ বোকা বনতে হতো! নিয়তি হোক, দৈব হোক বা তাকে আর যা ইচ্ছে হয় বলো—ভাগিস তা ঠিক সময়মতো হাজির হয়ে ব্যাপারটা পুরোপুরি আমার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছিলো!'

স্নানঘরের সিঁড়ি দিয়ে গাইয়ের দুমদাম করে নেমে যাবার শব্দ শুনতে পেলো ডরিস। ভীষণ শব্দ করে মানুষটা, এমন কি খালি পায়েও নিঃশব্দে হাঁটতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ তার কণ্ঠে বিস্ময়ের স্বর শোনা গেলো—স্থানীয় ভাষায় দু-তিনটে কথা…কি যে বললো, ডরিস বুঝতে পারলো না। তারপর আর একজনের গলা—জোরে নয়, ফিসফিসে স্বরে। সত্যি, স্নান করতে যাবার পথে এভাবে পাকড়াও করে কথাবার্তা বলা—ভীষণ বাজে। ফের কি যেন বললো গাই। কণ্ঠস্বরটা নিচু হলেও ডরিস বুঝতে পারলো, ও যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছে। অন্য দিকের কণ্ঠস্বরটা এবারে একটু চড়লো। কোনো মহিলার গলা। ডরিসের মনে হলো, কেউ হয়তো কোনো অভিযোগ জানাতে এসেছে। মালয়ী মেয়েদের রীতিই এমনি চুপিসাড়ে আসা। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, গাইয়ের কাছে ও আদৌ সুবিধে করতে পারছে না। কারণ গাইকে

'বেরিয়ে যাও' বলতে শুনলো ডরিস। এ কথাটা ডরিস স্পষ্টই বুঝতে পারলো এবং তারপরেই শব্দ শুনে বুঝলো, গাই দরজার ছিটকিনি তুলে দিচ্ছে। তারপর গায়ে জল ঢালবার আওয়াজ (এখানকার স্নানের ব্যবস্থায় এখনও মজা পায় ডরিস। স্নানঘর-গুলো শোবার ঘরের নিচে—একতলায়। সেখানে বড়োসড়ো একটা চৌবাচ্চায় জল ভর্তি থাকে, ছোট্ট একটা টিনের বালতি করে সেই জল গায়ে ঢালতে হয়।) এবং তার কয়েক মিনিট বাদেই গাই খাওয়ার ঘরে এসে হাজির। ওর চুলগুলো তখনও ভিজে। খেতে বসলো দুজনে।

'ভাগ্যি ভালো, আমার মনে সন্দেহ বা হিংসে নেই,' ডরিস হাসলো। 'তবে স্নানের সময় মহিলাদের সঙ্গে তোমার অমন উদ্দীপ্ত আলোচনা, আমার পক্ষে মেনে নেওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।'

গাইয়ের সাধারণত হাসিখুশিভরা মুখখানা এতোক্ষণ গোমড়া হয়ে ছিলো। এবারে ফের তা ঝলমলে হয়ে উঠলো, 'ওকে দেখে আমি ঠিক খুশি হইনি।'

'সেটা আমি তোমার গলার স্বর শুনেই বুঝেছি। সত্যি বলতে কি, আমার মনে হচ্ছিলো তুমি ওকে খানিকটা মেজাজ দেখালে।'

'কি সাহস, আমাকে ওভাবে পথের মধ্যে পাকড়াও করা!'

'কি চাইছিলো ও?'

'জানি না। গ্রামের বস্তিতে থাকে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে বা ওই ধরনের কিছু হবে।'

'আজ সকালে ওই মেয়েটাই এখানে ঘুরঘুর করছিলো কিনা, কে জানে!'

'এখানে কেউ ঘুরঘুর করছিলো নাকি?' গাইয়ের ভুরু দুটো সামান্য কুঁচকে উঠলো।

'হ্যাঁ। সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গোছগাছ করা আছে কিনা দেখতে আমি তোমার পোশাক পালটাবার ঘরটাতে ঢুকেছিলাম। তারপর সেখান থেকে গেলাম স্নানঘরে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখলাম, কে যেন দরজার ওধারে সরে গেলো। তখন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

'কথা বলেছিলে?'

'জিগেস করলাম, ও কি চায়। ও তাতে কি বললো ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'যতো রাজ্যের আজেবাজে লোক এখানে ঘোরাঘুরি করবে, আমি তা মোটেই বরদাস্ত করবো না। এখানে আসার কোনো অধিকার ওদের নেই।'

গাই মৃদু হাসলো। কিন্তু প্রেমে নিমগ্না নারীর চকিত অনুভূতি দিয়ে ডরিস লক্ষ্য করলো, ও শুধু ঠোঁট দিয়ে হাসছে—যথারীতি ওর চোখ দুটো হাসছে না। কি ওকে

এমন করে ভাবিয়ে তুলেছে, ভেবে পেলো না ডরিস।

'আজ সকালে কি করলে ?' জিগেস করলো গাই।

'তেমন কিছু নয়। একটু হাঁটতে গিয়েছিলাম।'

'গ্রামের মধ্যে ?'

'হ্যাঁ। দেখলাম, একজন নারকেল পাড়াবে বলে একটা শেকলে-বাঁধা বাঁদরকে গাছে চড়াচ্ছে। দেখে দারুণ লাগলো !'

'খুব মজার ব্যাপার, তাই না ?'

'জানো, দুটো বাচ্চা ছেলে লোকটার ওই কাণ্ড দেখছিলো। ছেলে দুটো অন্যদের চাইতে ঢের ফর্সা। মনে হলো ওরা হয়তো দো-আঁশলা। ওদের সঙ্গে কথা বললাম, কিন্তু ওরা এক বর্ণও ইংরেজী জানে না।'

'হ্যাঁ, এ গ্রামে দু-তিনটে দো-আঁশলা বাচ্চা আছে।'

'ওরা কার বাচ্চা ?'

'গ্রামেরই কোনো মেয়ে ওদের মা।'

'আর বাবা ?'

'এখানে এ ধরনের প্রশ্ন করাটা আমরা একটু বিপজ্জনক বলেই মনে করি।' একটু থেমে গাই বললো, 'এখানে অনেকেরই এদেশী বউ থাকে। তারা যখন দেশে ফিরে যায় বা বিয়ে করে, তখন ওদের টাকা-পয়সা দিয়ে গ্রামে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।'

ডরিস চুপ করে রইলো। যে রকম নির্লিপ্ত উদাসীন ভঙ্গিতে গাই কথাগুলো বললো তাতে মানুষটাকে যেন খানিকটা নির্মম বলে মনে হলো ওর। ও যখন জবাব দিলো তখন ওর অকপট সরল সুন্দর ইংরেজ মুখখানিতে প্রায় যেন ভ্রূকুটি ফুটে উঠেছে।

'কিন্তু বাচ্চাগুলোর কি হয় ?'

'তাদের জন্যে অবশ্যই উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সাধারণত সকলেই নিজেদের সাধ্যমতো ওদের যথেষ্ট টাকা-পয়সা দেয়, যাতে ওরা মোটামুটি শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। সরকারী অফিসে ওরা কেরানীর চাকরি-বাকরিও পেয়ে যায়। বুঝলে তো,—ওরা ভালোই থাকে।'

ডরিস বিধুর ভঙ্গিমায় মৃদু হাসলো, 'প্রথাটাকে আমি খুব ভালো বলবো, এমন প্রত্যাশা তুমি কোরো না।'

'তোমার কিন্তু অতোটা কঠোর হওয়া উচিত নয়,' গাইও মৃদু হাসলো।

'আমি কঠোর নই। তবে তোমার কোনোদিন অমনি একটি মালয়ী বউ ছিলো না বলে আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। তাহলে আমার খুব খারাপ লাগতো। ভেবে ভাখো,

ওই বাচ্চা দুটো যদি তোমার হতো!'

চাকরটা প্লেটগুলো বদলে দিয়ে গেলো। ওদের খাদ্য-তালিকায় কোনোদিনই তেমন বৈচিত্র্য থাকে না। খানা শুরু হয়েছিলো নদীর মাছ দিয়ে। কিন্তু মাছটা নীরস আর বিস্বাদ ছিলো বলে সেটাকে রুচিকর করে তুলতে ওদের বেশ কিছুটা করে টমেটোর চাটনির দরকার হয়েছিলো। তারপর এলো কিসের একটা স্ট্যু। গাই তার মধ্যে খানিকটা উরসেসটার স্ডস ঢেলে নিলো।

'বুড়ো সুলতান মনে করতেন, এ দেশটা সাদা-মেয়েমানুষদের পক্ষে উপযুক্ত নয়।' একটু বাদে গাই বলতে লাগলো, 'উনি তাই এদেশী মেয়েদের নিয়ে ঘর করতে খানিকটা উৎসাহই দিতেন বলা চলে। এখন অবিশ্যি অনেক কিছুই বদলে গেছে। দেশটা এখন বেশ শান্ত এবং আমার ধারণা, এখানকার জল-হাওয়ার সঙ্গে কিভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়, সেটাও এখন আমরা আগের চাইতে অনেক ভালোভাবে শিখে গেছি।'

'কিন্তু গাই, ওই ছেলে দুটোর মধ্যে বড়োটার বয়েস সাত বা আটের চাইতে বেশি নয়। অন্যটা বছর পাঁচেকের।'

'মফঃস্বলের দপ্তরগুলো ভয়ঙ্কর নির্জন। প্রায়ই একটানা ছ মাসের মধ্যে অন্য কোনো সাদা মানুষের দেখা পাওয়া যায় না। তার ওপরে নেহাত বালক বয়সেই এখানে লোকে চাকরি নিয়ে আসে।' ডরিসের দিকে তাকিয়ে গাই সেই আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে হাসলো, সঙ্গে সঙ্গে তার গোল অতি সাধারণ মুখটার রূপ যেন বদলে গেলো। 'কৈফিয়ৎ অনেক আছে, বুঝলে!'

গাইয়ের ওই হাসিটাকে সর্বদাই অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হয় ডরিসের। ওটা ওর শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। ডরিসের চোখ দুটো ফের কোমল ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো।

'তা অবশ্যই আছে।' ছোট্ট টেবিলটার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে গাইয়ের হাতে নিজের হাত রাখলো ডরিস, 'আমার ভাগ্যটা খুব ভালো, তোমার এই ছেলেমানুষ বয়েসেই আমি তোমাকে পাকড়াও করে ফেলেছি। সত্যি বলছি, যদি শুনতাম তুমিও ওইভাবে এখানে জীবন কাটিয়েছো তাহলে আমার ভীষণ মন খারাপ লাগতো।'

ওর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে মৃদু চাপ দিলো গাই, 'তুমি এখানে সুখী তো, সোনা?'

'প্রচণ্ড!'

লিনেনের ফ্রকটাতে ভীষণ ঠাণ্ডা আর সতেজ দেখাচ্ছিলো ডরিসকে। গরম ওকে কাবু করতে পারেনি। যৌবনের সুষমাটুকু ছাড়া ওর অন্য কোনো ঐশ্বর্য নেই। তবে বাদামি চোখ দুটো ভারি চমৎকার, মুখের অভিব্যক্তি সুন্দর সরলতায় ভরা,

ছোটো করে ছাঁটা কালো চুলগুলো পরিচ্ছন্ন পরিপাটি আর চকচকে। দেখে মনে হয় মেয়েটি প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা। পার্লামেন্টের যে সদস্যটির কাছে ও কাজ করতো, তিনি ওর মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি সুদক্ষ সচিবের সন্ধান পেয়েছিলেন।

'এ দেশটাকে আমি দেখামাত্রই ভালোবেসে ফেলেছিলাম।' ডরিস বললো, এখানে আমি এতো একা, তবু কখনও নিজেকে তেমন একা লেগেছে বলে মনে হয় না।'

মালয় দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে বিভিন্ন উপন্যাস পড়ে ডরিস মনে মনে একটা ধারণা গড়ে নিয়েছিলো যে এটা বড়ো বড়ো অলুক্ষুণে নদী আর নিস্তব্ধ দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ভরা একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন নিরানন্দ দেশ। প্রথম দিন উপকূল ধরে যাতায়াতকারী ছোট্ট স্টিমারটা ওদের নদীর মোহনার কাছে ছেড়ে দিয়েছিলো। জনা-বারো ডায়াক মাঝিমাল্লা সমেত একটা বিশাল নৌকো ওদের উদ্দিষ্ট অঞ্চলটাতে নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলো সেখানে। তখনই জায়গাটার দৃশ্য-শোভা দেখে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে যেন দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো ডরিসের। এ সৌন্দর্য আতঙ্ক জাগায় না, মনকে অন্তরঙ্গতায় ভরিয়ে তোলে। গাছে গাছে পাখিদের খুশিয়াল কূজনের মতো এ সৌন্দর্য উজ্জ্বল উচ্ছলতায় ভরা, যা ডরিস আদৌ আশা করেনি। নদীর দুই তীরে গরান আর বেঁটে পাম গাছ এবং তার পেছনে ঘন সবুজ অরণ্য। দূরে যতোদূর চোখ যায়, একের পরে এক নীল পাহাড়ের সারি। তখন বন্ধন বা বিষাদের কোনো অনুভূতি ডরিসের মনে আসেনি, বরং মনে হয়েছিলো এ এক উদার উন্মুক্ত পরিবেশ যেখানে উচ্ছ্বসিত কল্পনা সানন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে ইচ্ছাসুখে। চারদিকে সবুজের শোভা তখন ঝলমল করছিলো রোদের সোনায়, আকাশ ছিল প্রাণময় আর প্রসন্ন।

তীর ঘেঁষে নৌকো চলছিলো ওদের। মাথার ওপরে অনেক উঁচু দিয়ে একজোড়া বনকপোত উড়ে গেলো। হঠাৎ যেন এক ঝলক রঙ—ঠিক যেন একটা প্রাণময় জহরত—ওদের পথের এধার থেকে ওধারে ছুটে গেলো। আসলে ওটা একটা মাছরাঙা। গাছের ডালে দুটো বাঁদর পাশাপাশি লেজ ঝুলিয়ে বসে রয়েছে। আকাশ নির্মল। শুধু চওড়া ঘোলা নদীটার ওধারে, জঙ্গল পেরিয়ে দিগন্তের কাছটিতে হালকা এক সার সাদা মেঘ—ঠিক যেন সাদা পোশাক পরা এক সারি হাসিখুশি অথচ সচাকত ব্যালে-নর্তকী, মঞ্চের পেছনের অংশে দাঁড়িয়ে রয়েছে পর্দা ওঠার প্রতীক্ষায়। ডরিসের সমস্ত হৃদয় তখন আনন্দে ভরে গিয়েছিলো। এখন সেই সমস্ত কথা মনে করে কৃতজ্ঞতা আর আত্মবিশ্বাসী প্রেমের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালো ও।

বৈঠকখানা ঘরটা গুছিয়ে তুলতে কি মজাই না হয়েছিলো সেদিন! ঘরটা বেজায় বড়ো। ডরিস এসে দেখেছিলো, ঘরের মেঝেতে ছেঁড়াখোঁড়া নোংরা একটা সতরঞ্চি

জাতীয় জিনিস। রঙ বিহীন কাঠের দেয়ালগুলোতে অনেক উঁচু করে ঝোলানো অ্যাকাডেমির কিছু ছবির ছাপাই প্রতিলিপি, ডায়াকদের কয়েকখানা ঢাল আর কয়েকটা মালয়ী ছুরি পারাঙ। টেবিলগুলোতে ম্যাটমেটে রঙের মালয়ী কাপড়ের ঢাকা—তার ওপরে ব্রুনেইতে তৈরি কিছু পেতলের জিনিসপত্র যেগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলা বিশেষ দরকার, সিগারেটের কিছু খালি কৌটো আর মালয়ের তৈরি গোটা কতক রুপোর জিনিস। সস্তা একটা কাঠের তাকে ছিলো কিছু উপন্যাসের সস্তা সংস্করণ আর চামড়ার মলাট জীর্ণ হয়ে যাওয়া গোটা কয়েক পুরনো ভ্রমণ-কাহিনী। অন্য একটা তাক শূন্য বোতলে বোঝাই। স্রেফ একটা আইবুড়োর ঘর—অপরিচ্ছন্ন, কিন্তু ঢেলে সাজানোও কঠিন। মজা পেলেও দৃশ্যটা অসহ্য করুণ বলে মনে হয়েছিলো ডরিসের। গাই বড়ো আনন্দহীন, আরামবিহীন জীবন কাটাতো এখানে। দু হাতে মানুষটার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিলো ডরিস। হাসতে হাসতে বলেছিলো, 'আহা বেচারা!'

এটা সেটা সাজিয়ে রেখে, যেগুলো কাজে লাগানো গেলো না সেগুলোকে বিদেয় করে, সুদক্ষ হাতে শীগগিরি ঘরটাকে বাসযোগ্য করে তুলেছিলো ডরিস। বিয়ের উপহারগুলো খুব কাজে লেগে গিয়েছিলো। এবারে ঘরটা অন্তরঙ্গ আর আরামদায়ক হয়ে উঠেছে। কাচের ফুলদানিতে সুন্দর অর্কিড সাজানো। আর বড়ো বড়ো পাত্রে ফুল ফোটানো গুল্ম। ভীষণ গর্ব অনুভব করছিলো ডরিস—কারণ এটা ওর বাড়ি (এর আগে ও ঘুপচি ফ্ল্যাট ছাড়া কোনোদিন কোথাও থাকেনি) এবং গাইয়ের জন্যে এটাকে ও মনোরম করে তুলেছে।

'আমাকে নিয়ে তুমি খুশি?' কাজ শেষ করে প্রশ্ন করেছিলো ডরিস।

'পুরোপুরি,' গাই মৃদু হেসেছিলো তখন।

স্বেচ্ছাকৃতভাবে এই কমিয়ে বলাটা ভারি ভালো লাগে ডরিসের। পরস্পরের এই সুন্দর বোঝাপড়াটা কতো আনন্দের! ওরা দুজনেই আবেগ প্রকাশ করতে লজ্জা পায়, সামান্য কয়েকটি দুর্লভ মুহূর্ত বাদে ওরা পরস্পরের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ-খুনসুটি ছাড়া কথা বলে না।

খাওয়াদাওয়া সেরে একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্যে একটা লম্বা কুর্সিতে শরীর মেলে দিলো গাই। ডরিস এগিয়ে গেলো নিজের ঘরের দিকে। কিন্তু পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ গাই ওকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে, ওকে নিচের দিকে নামিয়ে ঠোঁটে চুমু খেলো। ব্যাপারটাতে অবাক হলো ডরিস। এভাবে দিন-দুপুরে জড়াজড়ি করার অভ্যেস ওদের নেই। তাই রসিকতা করে বললো, 'বেচারা! ভরা-ভুঁড়ি তোমাকে নরম করে তুলছে।'

'এবারে বেরোও এখান থেকে। অন্তত দুটি ঘণ্টা যেন তোমাকে দেখতে না হয়।'

'নাক ডাকে না যেন।'

ডরিস চলে গেলো। ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠেছিলো ওরা, তাই ঘুমিয়েও পড়লো পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

স্নানঘরে স্বামীর জল ঢালার আওয়াজে ঘুম ভাঙলো ডরিসের। বাংলোর দেয়ালগুলো যেন বোর্ডের মতো—এক জায়গায় আওয়াজ হলেই সব শোনা যায়। নড়তে চড়তে আলসেমি লাগছিলো ওর, কিন্তু চাকরটার চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আসার আওয়াজ শুনতেই লাফিয়ে উঠে একছুটে নিজের স্নানঘরে গিয়ে ঢুকলো। জলটা কনকনে নয়, তবে ঠাণ্ডা—শরীরকে স্নিগ্ধ সতেজ করে তোলে। বৈঠকখানায় ফিরে এসে ডরিস দেখলো, গাই র‍্যাকেট বের করছে। সন্ধ্যার সংক্ষিপ্ত-শীতল সময়টাতে ওরা টেনিস খেলে। রাত নামে ছটার সময়।

বাংলো থেকে টেনিস কোর্টটা দু-তিনশো গজ দূরে। পাছে একটুও সময় নষ্ট হয়, তাই চায়ের পরেই ওরা সেদিকে পা চালালো।

'আরে দ্যাখো!' ডরিস বললো, 'সকাল বেলায় আমি এই মেয়েটিকেই দেখেছিলাম!'

দ্রুত ফিরে তাকালো গাই। মুহূর্তের জন্যে তার দৃষ্টি একটা দেশী মেয়েছেলের দিকে স্থির হয়ে রইলো, কিন্তু মুখে কিছু বললো না।

'ওর পরনের সারংটা কি সুন্দর!' ডরিস বললো, 'কোথাকার জিনিস কে জানে!'

ওকে পেরিয়ে গেলো দুজনে। মেয়েটির ছোটোখাটো চেহারা। কালো কুচকুচে দুটি আয়ত চোখ, ওদের জাতে যেমনটি হয়ে থাকে। আর একরাশ নিবিড় কালো চুল। ওরা পাশ দিয়ে যাবার সময় মেয়েটি একটুও নড়লো না, শুধু এক অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। ডরিস তখনই দেখলো, প্রথমে যতোটা মনে হয়েছিলো মেয়েটি ঠিক ততোটা ছেলেমানুষ নয়। ওর চোখ মুখ সামান্য ভারি। গায়ের রঙ ময়লা, কিন্তু ভারি মিষ্টি চেহারা। কোলে একটা বাচ্চা। বাচ্চাটাকে দেখে ডরিস সামান্য হাসলো। কিন্তু তার জবাবে মেয়েটির ঠোঁটে একটুও হাসি ফুটলো না, মুখটা ভাবলেশহীনই হয়ে রইলো। গাইয়ের দিকেও তাকায়নি, তাকিয়েছিলো শুধু ডরিসের দিকে। ওদিকে গাই হেঁটেই চললো, যেন মেয়েটিকে সে দেখতেই পায়নি।

'বাচ্চাটা কি মিষ্টি, তাই না?'

'আমি লক্ষ্য করিনি।'

গাইয়ের মুখের চেহারা দেখে ডরিস হতচকিত হয়ে উঠলো। মুখটা মড়ার মতো

সাদা। ব্রণগুলো এমনিতেই ডরিসের বিশ্রী লাগে, এখন সেগুলো অদ্ভুত লাল হয়ে উঠেছে।

'মেয়েটার হাত-পাগুলো লক্ষ্য করেছিলে? ও একজন ডাচেস হলেও দিব্যি মানিয়ে যেতো।'

'এ দেশে সকলেরই হাত-পা সুন্দর,' গাই জবাব দিলো। ওর কণ্ঠস্বরে আগের মতো খুশির রেশ নেই, যেন জোর করে কথা বলছে।

ডরিস বিহ্বল হয়ে ওঠে।

'মেয়েটা কে গো? তুমি ওকে চেনো?'

'এ গ্রামেরই মেয়ে।'

ততোক্ষণে ওরা কোর্টে পৌঁছে গেছে। জালটা আঁট করে বাঁধা আছে কি না দেখতে গিয়ে গাই পেছনে ফিরে তাকায়। মেয়েটি তখনও সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের পরস্পরের চোখে চোখ পড়ে।

'আমি শুরু করবো?' জিগেস করে ডরিস।

'হ্যাঁ, বলগুলো তো তোমার দিকেই রয়েছে।'

ভীষণ বাজে খেললো গাই। সাধারণত সে ডরিসকে পনেরোটা পয়েন্ট নিতে দিয়ে, তারপর হারিয়ে দেয়। কিন্তু আজ ডরিস সহজেই জিতে গেলো। তাছাড়া আজ গাই নীরবেই খেললো। অথচ সাধারণত সে হুল্লোড় করে খেলে—সর্বদা চিৎকার-চেঁচামেচি করে, কোনো বল মারতে গিয়ে বিফল হলে নিজেকে গালাগাল দেয়, ডরিসের নাগালের বাইরে বল পাঠিয়ে ওকে খেপায়।

'খেলায় তোমার মন নেই,' ডরিস চিৎকার করে বলে।

'মোটেই তা নয়।'

ডরিসকে হারাবার চেষ্টায় গাই জোরে জোরে মারতে শুরু করে এবং একের পর এক বলগুলোকে জালে পাঠায়। মানুষটার এমন কঠোর মুখভঙ্গি ডরিস কোনোদিনও দেখেনি। তবে কি ভালো খেলতে পারছে বলেই ওর মেজাজটা একটু খারাপ হয়েছে? ক্রমে আলো পড়ে আসে, ওরা খেলা থামায়। ফেরার পথে ওরা দেখতে পায়, মেয়েটা ঠিক সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাবলেশহীন মুখে ওদের চলে যাওয়া লক্ষ্য করে মেয়েটা।...

বারান্দার খড়খড়িগুলো এখন তুলে দেওয়া হয়েছে। ওদের লম্বা কুর্সি দুটোর মাঝখানে টেবিলের ওপরে মদের বোতল আর সোডা। এই সময়টাতেই সারাদিনে প্রথম বার ওরা একটু সুরা পান করে। গাই কয়েক পাত্র জিন মিশিয়ে নিয়েছে। ওদের সামনে নদীর বিশাল বিস্তার। ওপারের অরণ্য আসন্ন রাত্রির রহস্যে মোড়া।

একটা এদেশী লোক একটা নৌকোর গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে স্রোতের অনুকূলে দু হাতে নিঃশব্দে দাঁড় বেয়ে চলেছে।

'একটা হাঁদার মতো খেললাম আজ,' হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে গাই বললো। 'শরীরটা যেন একটু খারাপ লাগছে।'

'জ্বরটর হবে না তো?'

'না না, কালকেই ঠিক হয়ে যাবো।'

অন্ধকার ওদের ওপরে ঘন হয়ে নেমে আসে। ব্যাঙের দল উঁচু গলায় কর্কশ স্বরে ডাকতে থাকে। মাঝে-মধ্যে কোনো রাতজাগা পাখির সুরেলা শিস শুনতে পায় ওরা। জোনাকিরা বারান্দা দিয়ে আনাগোনা করে। তাদের আলোয় চারদিকের গাছগুলোকে ছোটো ছোটো মোমবাতি দিয়ে সাজানো ক্রিসমাস ট্রি বলে মনে হয়। আলোর নরম ঝিলিক ছড়ায় ওরা। হঠাৎ ডরিসের মনে হয়, ও যেন ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলো। কেমন যেন অস্বস্তি হয় ওর। গাই তো সর্বদাই হাসি ঠাট্টায় মশগুল হয়ে থাকতো!

'কি হয়েছে, বুড়ো সোনা?' ডরিস নরম গলায় জিগেস করে। 'কি হয়েছে, তোমার মাকে বলো?'

'কিছু না,' গাই হালকা স্বরে জবাব দেয়, 'আর এক পাত্তর গেলার সময় হয়ে গেছে।'

পরের দিন গাই আবার সেই আগের মতোই হাসিখুশিতে ভরে থাকে। চিঠিপত্র আসে। উপকূল ধরে যাতায়াতকারী স্টিমারটা মাসে দু বার মোহানা দিয়ে যায়— একবার কয়লা খনির দিকে যায়, আর একবার সেখান থেকে ফেরে। যাবার পথে স্টিমারটা এখানকার ডাক নিয়ে আসে, গাই একটা নৌকো পাঠিয়ে সেগুলো আনিয়ে নেয়। ডাক আসাটা ওদের বৈচিত্র্যহীন জীবনের উত্তেজনা। যা কিছু আসে—চিঠি, ইংরেজী পত্রিকা, সিঙ্গাপুরের খবরের কাগজ, সাময়িকপত্র, বই—প্রথম দু-একদিন ওরা দ্রুত সেগুলোতে চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর পরের সপ্তাহগুলোতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। সচিত্র পত্রিকাগুলো নিয়ে ওরা কাড়াকাড়ি করে। এতো মগ্ন হয়ে না থাকলে ডরিস লক্ষ্য করতো, গাইয়ের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। ব্যাপারটা ওর পক্ষে বর্ণনা করা কঠিন হতো, আরও কঠিন হতো সেটা ব্যাখ্যা করা। আজকাল গাইয়ের চোখে যেন কেমন একটা সতর্কতা, ওর মুখটা যেন একটু ঝুলে পড়েছে কি এক উদ্বেগে।

তারপর, সম্ভবত সপ্তাহখানেক বাদে, ডরিস একদিন ছায়াঢাকা ঘরে বসে মালয়ী ব্যাকরণ পড়ছে (ভাষাটা শেখার জন্যে খুবই পরিশ্রম করছে ও), হঠাৎ ও বাংলোর

চৌহদ্দীর মধ্যে একটা চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পেলো। বাড়ির চাকরটার গলা শুনতে পেলো ও—রেগেমেগে কি যেন বলছে লোকটা। আরও একটা পুরুষকণ্ঠ—সম্ভবত ওটা ভিস্তির গলা। তারপর কর্কশ মহিলাকণ্ঠে গালিগালাজ। খানিকটা হুটোপুটির শব্দ। জানলার কাছে গিয়ে সার্শি খুলে ডরিস দেখলো, ভিস্তিটা একটা মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে আর বাড়ির চাকরটা মেয়েটাকে পেছন থেকে দু হাত দিয়ে ঠেলছে। সঙ্গে সঙ্গে ডরিস চিনতে পারলো, ওই মেয়েটাকেই একদিন সকালে ও বাড়ির চৌহদ্দীতে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলো এবং তার-পরেও দেখেছিলো টেনিস কোর্টের কাছে। বুকের সঙ্গে একটা বাচ্চাকে আঁকড়ে রেখেছে মেয়েটা। তিনজনই চিৎকার করছে ক্রুদ্ধগলায়।

'থামো!' ডরিস চিৎকার করে উঠলো। 'কি করছো তোমরা?'

ডরিসের গলা শুনতেই ভিস্তি চট করে মেয়েটার হাত ছেড়ে দিলো এবং তখনও পেছন থেকে ধাক্কা খাওয়ায় মেয়েটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে উঠলো চারদিক। চাকরটা গোমড়া মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো, ভিস্তিটা এক মুহূর্ত একটু ইতস্তত করে সরে পড়লো চুপচাপ। মেয়েটা ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বাচ্চাটাকে কোলে সামলে নিয়ে নৈর্ব্যক্তিক মুখে তাকিয়ে রইলো ডরিসের দিকে। চাকরটা ডরিসকে কি একটা বললো—ডরিস যদিও বা তা বুঝতো, কিন্তু এতো নিচু গলা যে শুনতেই পেলো না। মেয়েটার মুখ দেখে বোঝা গেলো না, ও কিছু শুনেছে কিনা—কিন্তু ও আস্তে আস্তে চলে গেলো। চাকরটা ওর পেছন পেছন সদর দরজা অব্দি গেলো। সে যখন ফিরে আসছে, ডরিস তাকে ডাকলো। কিন্তু লোকটা এমন ভান করলো যেন ডারসের ডাক সে শুনতেই পায়নি। এবারে রাগ হলো ডরিসের, আরও তীক্ষ্ণ গলায় লোকটাকে ডাকলো ও। চিৎকার করে বললো, 'এক্ষুণি এখানে এসো!'

ডরিসের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি এড়িয়ে আচমকা বাংলোর দিকে এগিয়ে এলো লোকটা। তারপর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে গোমড়া মুখে তাকালো ওর দিকে।

'ওই মেয়েটাকে নিয়ে কি করছিলে তোমরা?'

'হুজুর ওকে এখানে আসতে বারণ করেছেন।'

'মেয়েদের সঙ্গে কক্ষণো অমন ব্যবহার করবে না, আমি তা কিছুতেই বরদাস্ত করবো না। আমি যা দেখলাম, তা সব তোমার হুজুরকে বলবো।'

চাকরটা কোনো জবাব না দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু ডরিসের যেন মনে হলো দীর্ঘ পল্লবগুলোর ফাঁক দিয়ে সে ওকে লক্ষ্য করছে। ওকে যেতে বললো ডরিস।

'ঠিক আছে, যাও এবারে।'

একটিও কথা না বলে লোকটা চাকরদের আবাসের দিকে চলে গেলো। ডরিস এমন তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলো যে দেখলো, ফের মালয়ী ব্যাকরণ-অনুশীলনে মনোযোগ দেওয়া একেবারে অসম্ভব। একটু বাদেই চাকরটা খানা দেবার জন্যে টেবিল সাজাতে এলো। কিন্তু হঠাৎ দরজার দিকে এগিয়ে গেলো সে।

'কি হলো?' জিগেস করলো ডরিস।

'হুজুর আসছেন।'

গাইয়ের টুপিটা নেবার জন্যে বেরিয়ে গেলো চাকরটা। ডরিস কিছু শুনতে পাবার আগেই গাইয়ের পায়ের শব্দ ওর সজাগ কানে ধরা পড়ে গেছে। গাই কিন্তু প্রতি-দিনের মতো যথারীতি সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলো না—একটু থেমে রইলো: ডরিস তৎক্ষণাৎ ধরে নিলো, চাকরটা সকালের ঘটনা গাইকে বলার জন্যে নিচে নেমে গেছে। ভ্রূ কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো ডরিস। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে চাকরটা নিজের দিক থেকে কাহিনীটা আগেভাগে বলে রাখতে চায়। কিন্তু গাই ঘরে এসে ঢুকতে ও অবাক হয়ে গেলো। গাইয়ের মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে।

'কি হয়েছে গাই?'

আচমকা টকটকে লাল হয়ে উঠলো মানুষটা।

'কিছু না। কেন?'

ডরিস এতো অবাক হয়ে গিয়েছিলো যে, গাই বাড়িতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ও তাকে যে সমস্ত কথা বলবে বলে ঠিক করে রেখেছিলো তার কিছুই না বলে গাইকে নিজের ঘরে চলে যেতে দিলো। স্নান করতে, পোশাক বদলাতে স্বাভাবিকের চাইতে আজ বেশি সময় লাগলো মানুষটার। সে ঘরে আসার পর খাবার দেওয়া হলো।

'গাই,' খেতে বসে ডরিস বললো, 'সেদিন আমরা যে মেয়েটাকে দেখলাম আজ সকালে ফের সে এখানে এসেছিলো।'

'আমিও তা-ই শুনলাম।'

'চাকরবাকরগুলো ওর সঙ্গে ভীষণ বাজে ব্যবহার করছিলো। আমাকে গিয়ে থামাতে হয়েছে। তুমি এ ব্যাপারে ওদের অবশ্যই কিছু বলবে।'

মালয়ী চাকরটা ওর সমস্ত কথা বুঝলেও এমন ভাব দেখালো যেন সে কিছুই শোনেনি। ডরিসের দিকে সে টোস্ট এগিয়ে দিলো।

'মেয়েটাকে এখানে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। আমি এদের বলে দিয়েছি, ওকে ফের এখানে দেখা গেলে যেন তাড়িয়ে দেওয়া হয়।'

'তাই বলে অমন বিশ্রী ব্যবহার করতে হবে ?'

'ও এখান থেকে যেতে চায়নি। যতোটুকু কঠোর না হয়ে উপায় ছিলো না, ওরা তার চাইতে বেশি কঠোর হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।'

'একটা মেয়ের সঙ্গে অমন ব্যবহার করা হচ্ছে, তা দেখতেও বীভৎস লাগে। তাছাড়া ওর কোলে একটা শিশু ছিলো।'

'ওটাকে আর শিশু বলা চলে না। তিন বছর বয়েস।'

'তুমি তা কি করে জানলে ?'

'আমি ওর সম্পর্কে সমস্ত কথাই জানি। এখানে এসে সবাইকে বিরক্ত করার কোনো অধিকার ওর নেই।'

'কি চায় ও ?'

'যা করেছে, ঠিক তা-ই করতে চায়। একটা ঝামেলা বাধাতে চায়।'

কিছুক্ষণ ডরিস কোনো কথা বললো না। স্বামীর কথার সুরে ও অবাক হয়ে গিয়েছিলো। ভীষণ সংক্ষিপ্ত আর চাঁছাছোলা ভাষায় কথা বলছে গাই। এমন ভাবে কথা বলছে, যেন এর মধ্যে ডরিসের থাকা উচিত হয়নি। ওকে একটু নিষ্ঠুর বলে মনে হলো ডরিসের। মনে হলো গাই যেন একটু বিচলিত এবং খিটখিটে হয়ে উঠেছে।

'আজ বিকেলে আমরা টেনিস খেলতে পারবো কি না, সন্দেহ।' গাই বললো, 'মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে।'

ডরিসের যখন ঘুম ভাঙলো তখন বৃষ্টি পড়ছে। বাইরে যাওয়া অসম্ভব। চা পানের সময় গাই নিশ্চুপ ও আনমনা হয়ে রইলো। ডরিস সেলাই নিয়ে বসলো। যে ইংরেজী পত্রিকাগুলো আগাগোড়া পড়া হয়নি, গাই বসলো সেগুলো নিয়ে। কিন্তু ক্রমশ সে অস্থির হয়ে উঠছিলো। বিশাল ঘরটায় পায়চারি করতে করতে অবশেষে সে বারান্দায় বেরিয়ে এসে তাকিয়ে রইলো অবিরাম বৃষ্টিধারার দিকে। কি ভাবছে মানুষটা ? কেমন যেন অস্বস্তি হয় ডরিসের।

রাতের খানা শেষ হবার আগে গাই কোনো কথাবার্তা বলেনি। খাওয়ার সময় সে হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে নিজের স্বাভাবিক স্বরূপটাকে প্রকাশ করেছিলো বটে, কিন্তু প্রয়াসটা ছিলো নিতান্তই স্পষ্ট। বৃষ্টি ততোক্ষণে থেমে গেছে। তারায় ভরা রাত। পোকা আসবে বলে বৈঠকখানার আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিলো ওরা। ওদের পায়ের কাছ দিয়ে ভয়ঙ্কর মন্থরতায় বয়ে চলেছে সেই রহস্যময়ী দুরন্ত আর সর্বনাশী নদী। নিয়তির মতোই ভয়ঙ্কর তার বিচার, অমোঘ তার নিষ্ঠুরতা।

'ডরিস, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে,' আচমকা গাই বললো।

ভারি অদ্ভুত শোনালো গাইয়ের কণ্ঠস্বর। গলাটা নিষ্কম্প রাখতে ওর কি অসুবিধে হচ্ছিলো, না সেটা ডরিসের কল্পনা মাত্র? গাইয়ের কষ্ট হচ্ছে ভেবে বুকের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করলো ডরিস। আলতো করে গাইয়ের হাতে হাত রাখলো ও। কিন্তু নিজের হাতটা সরিয়ে নিলো গাই।

'বলতে গেলে এ এক দীর্ঘ কাহিনী। আমার আশঙ্কা, কাহিনীটা তেমন সুন্দর কিছু নয় এবং আমার পক্ষে এটাকে গুছিয়ে বলাও শক্ত। তোমাকে আমার অনুরোধ, আমার বলা শেষ না হওয়া অব্দি তুমি আমাকে বাধা দিও না বা কিছু বোলো না।'

অন্ধকারে গাইয়ের মুখখানা দেখতে পাচ্ছিলো না ডরিস। কিন্তু বুঝতে পারছিলো, ভীষণ বেচারার মতো দেখাচ্ছে তার মুখটাকে। ডরিস কোনো জবাব দিলো না। গাইয়ের কণ্ঠস্বর এতো নিচু যে তাতে রাতের নৈঃশব্দ্য ভাঙছে না বললেই চলে।

'এখানে যখন আসি, তখন আমার বয়েস মাত্র আঠারো বছর। স্কুল থেকে সোজা এখানে। কুয়ালা সোলোরে তিন মাস কাটাবার পর আমাকে সেম্বলু নদীর তীরে একটা অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবিশ্যি সেখানে একজন রেসিডেন্ট ছিলেন, আর ছিলেন তাঁর স্ত্রী। আমি কাছারি-বাড়িতে থাকতাম, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া করতাম ওঁদের সঙ্গে। আর সন্ধেবেলাটাও ওঁদের সঙ্গেই কাটাতাম। ওই সময়টা ভারি চমৎ-কার কেটেছে আমার। কিন্তু তার পরেই এখানে যিনি ছিলেন, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হয়। যুদ্ধের জন্যে আমাদের তখন লোকবল কম। তাই আমাকেই এখানকার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হলো। আমার বয়েসটা তখন অবশ্যই ভীষণ কম। কিন্তু এখানকার ভাষাটা আমি এদেশীদের মতোই বলতে পারতাম। তাছাড়া আমার বাবাকেও এরা মনে রেখেছিলো। এখানে আমাকে হুকুম করার মতো কেউ থাকবে না বলে আমি তখন বেজায় খুশি।'

কথা থামিয়ে তামাকের নল থেকে ছাইগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, গাই ফের সেটা ভরে নিলো। দেশলাই যখন জ্বাললো, ডরিস না তাকিয়েও লক্ষ্য করলো তার হাত দুটো কাঁপছে।

'আগে কোনোদিনও আমি একা থাকিনি। বাড়িতে বাবা-মা ছিলেন এবং সাধারণত একটি সহকারীও থাকতো। তারপর স্কুলে তো স্বাভাবিক কারণেই সর্বদা প্রচুর সঙ্গী ছিলো। এদেশে আসার পথে, জাহাজে, কুয়ালা সোলোরে এবং আমার প্রথম কর্মস্থলেও লোকজন ছিলো যথেষ্ট। তারা তো প্রায় আমার আত্মীয়স্বজনের মতোই ছিলো। সব সময়েই মনে হতো যেন ভিড়ের মধ্যে বাস করছি। আমি লোকজন ভালোবাসি। হৈ-হট্টগোল করে বেড়াই। আনন্দ করে সময় কাটাতে চাই। যে কোনো জিনিসেই আমার হাসি পায় এবং হাসার জন্যেও একজন সঙ্গীর দরকার

হয়। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা অন্য রকম। দিনের বেলাটা অবিশ্যি ভালোই কাটতো —নিজের কাজকর্ম থাকতো, ডায়াকদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলতে পারতাম। তখনকার দিনে ডায়াকরা অবিশ্যি নরমুণ্ড শিকারী ছিলো এবং মাঝে-মধ্যে ওদের সঙ্গে আমার এক-আধটু ঝামেলাও হতো। কিন্তু ওরা ভীষণ ভালো মানুষ, ওদের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিলো। আড্ডা মারার জন্যে একজন সাদা মানুষ পেলে অবশ্যই বেশি ভালো লাগতো, কিন্তু নেই মামার চাইতে কানা মামা ভালো— তাছাড়া ডায়াকরা আমাকে ঠিক বাইরের লোক বলে মনে করতো না বলে ব্যাপারটা আমার পক্ষে আরও সহজ হয়ে গিয়েছিলো। নিজের কাজটাও আমার ভালো লাগতো। সন্ধেবেলা খানিকটা নিঃসঙ্গ লাগতো। একা একা বারান্দায় বসে জিন খেতে খেতে নিজের ওপরে বিরক্ত হয়ে উঠতাম। তবে পড়াশুনো করা যেতো। তা ছাড়া চাকরবাকরেরাও আশেপাশে ঘোরাফেরা করতো। আমার নিজস্ব চাকরটার নাম ছিলো আবদুল। সে আমার বাবাকে চিনতো। পড়তে পড়তে ক্লান্ত হলে আমি ওকে হাঁক পেড়ে ডাকতাম, ওর সঙ্গে একটু বকবক করতাম।

'কিন্তু রাতগুলো আমাকে মুশকিলে ফেলে দিতো। খাওয়ার পর চাকরগুলো দরজাটরজা বন্ধ করে ঘুমোবার জন্যে বস্তিতে চলে যেতো। আমি তখন একা। মাঝে-মধ্যে গিরগিটির টকটক আওয়াজ ছাড়া বাংলোর মধ্যে কোথাও কোনো শব্দ নেই। স্তব্ধতার ভেতর থেকে এমন হঠাৎ হঠাৎ আওয়াজগুলো আসতো যে আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠতাম। বস্তি থেকে ভেসে আসা ঘণ্টা আর পটকার আওয়াজ শুনতে পেতাম। মনে হতো, কি আনন্দে সময় কাটাচ্ছে ওরা! তেমন দূরে নয়, অথচ আমি যেখানে রয়েছি সেখানেই আমাকে থাকতে হবে। পড়তে আর ভালো লাগতো না। নিজেকে মনে হতো জেলখানার কয়েদী। রাতের পর রাত এই একই ইতিহাস। পর পর তিন-চার পেগ হুইস্কি টেনেও মন ভালো করার চেষ্টা করে দেখেছি। কিন্তু একা একা মদ খেতে মজা লাগে না, মন-মেজাজও ভালো হয় না—শুধ্ পরদিন শরীরটা আরও বিশ্রী লাগে। রাতে খাওয়াদাওয়া সেরেই বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ঘুম আসতো না। বিছানায় শুয়ে গরমে ছটফট করতাম, ঘুম পালিয়ে যেতো, শেষ অব্দি বুঝতে পারতাম না কি করবো। ওহ্ ঈশ্বর, কি দীর্ঘ ছিলো সেইসব রাত! এখন ভাবলে হাসি পায়, কিন্তু তখন আমার বয়েস মাত্র সাড়ে উনিশ—তখন এতো মন খারাপ লাগতো, নিজের কথা ভেবে এতো কষ্ট হতো, যে মাঝে মাঝে আমি কেঁদে ফেলতাম।

'তারপর একদিন সন্ধেবেলা খাওয়াদাওয়ার পর টেবিল সাফ করে ঠিক চলে যাবার সময় আবদুল সামান্য একটু কেশে নিয়ে জিগেস করলো, সারা রাত বাড়িটার

মধ্যে আমার ভীষণ একা একা লাগে কি না। বললাম, 'না না, ঠিক আছে!' আমি কি প্রচণ্ড বোকা তা ওকে জানাতে চাইছিলাম না, কিন্তু মনে হচ্ছিলো ও সবই জানে। কিছু না বলে লোকটা চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইলো। বুঝলাম ও কিছু বলতে চায়। 'কি হয়েছে?' জিগেস করলাম। 'নাও, বলে ফেলো।' তখন ও বললো, আমি যদি কোনো মেয়েকে এনে রাখতে চাই তাহলে ও একটি মেয়ের সন্ধান দিতে পারে যে তাতে রাজী। মেয়েটি ভালো এবং আবদুল ওকে সুপারিশ করতে পারে। মেয়েটি কোনো ঝামেলা করবে না, আমার সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করে দেবে আর বাংলোতে একটা মানুষও হবে। আমার মন-মেজাজ তখন ভীষণ খারাপ। সারাটা দিন বৃষ্টি হয়েছে, কোনো রকম ব্যায়াম করতে পারিনি। জানি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমও আসবে না। আবদুল বললো, মেয়েটির জন্যে আমার তেমন কিছু খরচ লাগবে না। ওর আত্মীয়স্বজন খুব গরিব, সামান্য কিছু উপহার—শ দুই স্থানীয় ডলার—পেলেই তারা খুশি হয়ে যাবে। বললো, 'দেখুন না—মেয়েটাকে পছন্দ না হলে বিদায় করে দেবেন।' জিগেস করলাম, মেয়েটি কোথায়। 'এখানেই আছে। ডাকছি,' আবদুল দরজার দিকে চলে গেলো। মেয়েটা ওর মায়ের সঙ্গে সিঁড়িতে অপেক্ষা করছিলো। ঘরে ঢুকে ওরা মেঝেতে বসলো। আমি ওদের কিছু মিঠাই দিলাম। মেয়েটা লাজুক, শান্ত। আমি ওকে কি একটা বলায় ও আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু হাসলো। বয়েস খুবই কম, নেহাত শিশুই বলা চলে—ওরা বললো পনেরো। ভীষণ মিষ্টি চেহারা, সব-চাইতে ভালো পোশাকটা পরে এসেছে। আমরা কথা বলতে শুরু করলাম। ও বেশি কিছু বলেনি, তবে আমার ঠাট্টা-তামাসায় খুব হেসেছে। আবদুল বললো, ভালো করে আলাপ হলে ও অনেক কথাই বলবে। মেয়েটাকে সে আমার পাশে এসে বসতে বললো। মেয়েটা তাতে খিলখিল করে হেসে উঠলো, কিন্তু রাজী হলো না। এবারে ওর মা ওকে এগিয়ে আসতে বললো, আমিও নিজের কুর্সিতে ওর জন্যে একটু জায়গা করে দিলাম। মেয়েটা এবারে লাল হয়ে উঠলো, তারপর হাসতে হাসতে উঠে এসে আমার গা ঘেঁষে বসলো। আবদুলও হাসলো, 'দেখলেন, ও এর মধ্যেই আপনাকে পছন্দ করে ফেলেছে! তাহলে আপনি কি ওকে রাখতে চান?' আমি মেয়েটিকে জিগেস করলাম, 'কি, তুমি থাকতে চাও?' ও হাসতে হাসতে আমার কাঁধে মুখ লুকোলো। ভারি নরম আর ছোট্টখাট্ট মেয়েটা। বললাম, বেশ, থাকুক তাহলে।'

সামনের দিকে ঝুঁকে গাই হুইস্কি আর সোডা মেশালো।

'এবারে আমি কথা বলতে পারি?' প্রশ্ন করলো ডরিস।

'একটু দাঁড়াও। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। আমি ওকে ভালোবাসিনি, এমন কি গোড়ার দিকেও না। বাংলোয় আর একটা মানুষ হবে বলেই আমি ওকে এনেছিলাম। তা না করলে হয়তো পাগল হয়ে যেতাম কিংবা মদের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিতাম। আমি তখন সহের শেষ সীমানায় পৌছে গেছি। একা থাকার পক্ষে আমি তখন বড্ড ছেলেমানুষ। তুমি ছাড়া আমি কাউকে কোনোদিনও ভালোবাসিনি।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে গাই বললো, 'গত বছর আমি ছুটি নিয়ে দেশে যাওয়া অব্দি মেয়েটা এখানেই ছিলো। ওই মেয়েটাকেই তুমি এখানে ঘোরাফেরা করতে দেখেছো।'

'আমি সেটা অনুমান করেছিলাম। ওর কোলে একটা বাচ্চা ছিলো। সেটা কি তোমার?'

'হ্যাঁ, একটা ছোট্ট মেয়ে।'

'ওই একটাই বাচ্চা?'

'আর একদিন গ্রামে তুমি দুটো বাচ্চা ছেলে দেখেছো বলেছিলে।'

'তাহলে ওর তিনটে বাচ্চা?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার তো দেখছি রীতিমতো একটা পরিবার রয়েছে!'

ওর মন্তব্যে গাইয়ের মধ্যে একটা আকস্মিক চাঞ্চল্য অনুভব করলো ডরিস, কিন্তু কিছু বললো না।

'হঠাৎ তুমি বউ নিয়ে এখানে হাজির হবার আগে ও কি জানতো না যে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে?' জিগেস করলো ডরিস।

'ও জানতো, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

'কখন?'

'এখান থেকে যাবার আগে আমি ওকে গ্রামে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, এখানেই সবকিছুর শেষ। যা যা দেবো বলে কথা দিয়েছিলাম, তার সব কিছুই ওকে দিয়েছি। পুরো সময়টাতেই ও জানতো, এটা স্রেফ একটা সাময়িক ব্যবস্থা। আমার বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিলো। ওকে বলেছিলাম, আমি একটি সাদা চামড়ার মহিলাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

'কিন্তু তখন তো তুমি আমাকে দেখোইনি!'

'না। কিন্তু আমি দেশে গিয়ে বিয়ে করবো বলে মনস্থির করে ফেলেছিলাম।' আগেকার স্বভাবমতো গাই চাপা গলায় সামান্য হাসলো, 'তোমাকে বলতে আপত্তি নেই, তোমার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয় তখন আমি এ ব্যাপারে খানিকটা মরিয়া

হয়ে উঠেছি। প্রথম দেখাতেই আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলি—বুঝতে পারি, এ জীবনে হয় তুমি নয়তো আর কেউ নয়।'

'কিন্তু তুমি আমাকে আগে কিছু বলোনি কেন? বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবার মতো একটা সুযোগ আমাকে দেওয়া উচিত ছিলো বলে কি তোমার মনে হয় না? তোমার বোঝা উচিত ছিলো, একটা মেয়ে যদি জানতে পারে, তার স্বামী দশটা বছর অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে বসবাস করেছে এবং তাদের তিনটি সন্তান আছে—তবে সেটা মেয়েটির কাছে একটা প্রচণ্ড আঘাত হয়ে উঠতে পারে।'

'ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারবে, এমন প্রত্যাশা আমার ছিলো না। কিন্তু এখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি খানিকটা অদ্ভুত। এখানে এটাই স্বাভাবিক। ছজনের মধ্যে পাঁচজনই এ কাজ করে থাকে। আমি ভেবেছিলাম ঘটনাটা জানলে তুমি হয়তো একটা ধাক্কা খাবে। কিন্তু আমি তোমাকে হারাতে চাইনি। বুঝতেই পারছো, আমি তোমাকে ভীষণভাবে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। এখনও বাসি। এ ব্যাপারটা তোমার কোনোদিনও জানতে পারার মতো কোনো কারণ ছিলো না। আমি এখানে ফিরে আসবো বলে আশা করিনি। দেশে যাবার ছুটি কাটিয়ে, সাধারণত কাউকে আর আগেকার জায়গায় ফিরতে হয় না। এখানে আসার পর আমি মেয়েটিকে টাকা-পয়সা দিতে চেয়েছিলাম, যাতে ও অন্য কোনো গ্রামে চলে যায়। প্রথমে ও রাজীও হয়েছিলো, কিন্তু তারপর মত বদলে ফেলে।'

'এখন আমাকে এসব কথা বললে কেন?'

'ও এখন বড়ো ভয়ঙ্কর কাজকর্ম শুরু করেছে। জানি না কি করে ও বুঝতে পেরে গেছে, তুমি এ ব্যাপারে কিছু জানো না। আর যে মুহূর্তে বুঝতে পেরেছে, তখন থেকেই আমাকে ব্ল্যাক মেইল করতে শুরু করেছে। ওকে আমার অসম্ভব রকমের বেশি টাকা দিতে হয়েছে। আমি হুকুম দিয়েছিলাম ওকে যেন এ বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকতে দেওয়া না হয়। আজ সকালে ও ওই দৃশ্যটার অবতারণা করেছিলো স্রেফ তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে। ও আমাকে ভয় দেখাতে চায়। কিন্তু এভাবে আর চলতে পারে না। তাই ভাবলাম, একমাত্র পথ হচ্ছে তোমাকে সবকিছু খুলে বলা।'

গাই কাহিনী শেষ করার পর অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলো। অবশেষে ডরিসের হাতে হাত রেখে গাই বললো, 'তুমি সব বুঝতে পেরেছো, ডরিস। তাই না? আমি জানি, দোষ আমার!'

ডরিস হাতটা সরালো না। গাই অনুভব করলো, ওর হাতটা ঠাণ্ডা।

'ওর কি হিংসে হয়েছে?'

'এখানে থাকতে ও সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধে পেতো। সেগুলো ও আর কোনোদিনও পাবে না, এটা নিশ্চয়ই ওর ভালো লাগছে না। তবে আমি যেমন কোনোদিনও ওকে ভালোবাসিনি, ও-ও তেমনি কোনোদিনই আমাকে ভালো-বাসেনি। এখনকার মেয়েছেলেরা কোনোদিনই কোনো সাদা চামড়ার মানুষকে সত্যিকারের ভালোবাসে না।'

'আর বাচ্চাগুলো?'

'বাচ্চাগুলো ভালোই আছে। আমি ওদের জন্যে বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। ছেলে ছুটো একটু বড়ো হলেই সিঙ্গাপুরের স্কুলে পাঠিয়ে দেবো।'

'ওদের কি তুমি একটুও ভালোবাসো না?'

'আমি তোমার কাছে একেবারে মন খুলে কথা বলতে চাই। ওদের খারাপ কিছু হলে আমার দুঃখ হবে। প্রথম বাচ্চাটা হবার সময় ভেবেছিলাম, ওর মায়ের চাইতে ও আমার কাছে বেশি প্রিয় হয়ে উঠবে। রঙটা ফর্সা হলে হয়তো তা-ই হতো। শিশুকালে ওটা অবিশ্যি একটা মজার জিনিস ছিলো, করুণা হতো—কিন্তু ও যে আমার, এই বিশেষ অনুভূতিটা কখনই আসেনি। আমার ধারণা কি জানো—ওরা যে আমার, এই বোধটাই আমার মধ্যে নেই। মাঝে মাঝে এ জন্যে আমি নিজেকে দোষ দিয়েছি, কারণ আমার মনে হয়েছে এটা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু আসল সত্য হচ্ছে ওরা অন্যের বাচ্চা হলে আমার কাছে যতোটা আপনার হতো, নিজের হয়েও ওরা আমার কাছে তার চাইতে বেশি আপন নয়। যাদের ছেলেপুলে নেই তারা অবিশ্যি বাচ্চাকাচ্চার ব্যাপারে অনেক বেশি গদোগদো হয়ে থাকে।'

ডরিস এখন সব কিছুই শুনে ফেলেছে। ও কিছু বলবে বলে গাই অপেক্ষা করে রইলো। কিন্তু ডরিস কিছুই বললো না। শুধু বসে রইলো স্থাণু হয়ে।

'তুমি কি আর কিছু জিগেস করতে চাও, ডরিস?' শেষ পর্যন্ত গাই-ই প্রশ্ন করলো।

'নাঃ। মাথাটা ধরেছে। ভাবছি শুয়ে পড়বো।' ডরিসের কণ্ঠস্বর আগের মতোই স্থির, 'কি যে বলবো, ঠিক বুঝতে পারছি না। পুরো ব্যাপারটা অবশ্যই খুব অপ্রত্যাশিত। আমাকে চিন্তা করার একটু সময় দিতে হবে।'

'তুমি কি আমার ওপরে খুব রাগ করেছো?'

'না, একটুও না। শুধু···শুধু খানিকক্ষণ আমাকে একটু একা থাকতে দিতে হবে। না, তুমি উঠো না। আমি শুতে যাচ্ছি।' লম্বা কুর্সিটা থেকে উঠে গাইয়ের কাঁধে হাত রাখলো ডরিস, 'আজকের রাতটা বড্ড গরম। তুমি আজ বরং পোশাক বদলাবার ঘরটায় ঘুমোও। আচ্ছা, শুভরাত্রি।'

ডরিস চলো গেলো। ওর শোবার ঘরের দরজায় চাবি বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলো গাই।

পরের দিন ডরিসকে ফ্যাকাশে লাগলো। গাই দেখেই বুঝলো, রাতে ও ঘুমোয়নি। ওর ব্যবহারে কোনো তিক্ততা নেই, কথাবার্তাও বলছে রোজকার মতো—কিন্তু সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে নয়। এটা-সেটা নিয়ে কথা বলছে যেন বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলার মতো। ওদের মধ্যে কখনও ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। কিন্তু গাইয়ের মনে হলো, মতবিরোধ এবং তারপর মিল হওয়া সত্ত্বেও মনে কোনো আঘাতের চিহ্ন লেগে থাকলে, ও এভাবেই কথা বলতো। ওর চোখের দৃষ্টি দেখে গাই বিহ্বল হয়ে উঠলো। মনে হলো, ওর চোখে যেন এক অদ্ভুত আতঙ্ক। রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ করেই ও বললো, 'আমার শরীরটা মোটেই ভালো লাগছে না। ভাবছি এক্ষুণি গিয়ে শুয়ে পড়বো।'

'আহা বেচারী! আমার খুব খারাপ লাগছে,' গাই বললো।

'ও কিছু নয়। দু-এক দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবো।'

'আমি একটু পরে তোমার ঘরে গিয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে আসবো।'

'না, তা কোরো না। আমি গিয়ে সোজা ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করবো।'

'বেশ, তাহলে যাবার আগে আমাকে চুমু দিয়ে যাও।'

গাই দেখলো, ডরিস লাল হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের জন্যে ও যেন ইতস্তত করলো বলে মনে হলো, তারপর অন্য দিকে তাকিয়ে গাইয়ের দিকে ঝুঁকলো। ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে গাই ওর ঠোঁট দুটি খুঁজতে চাইলো। কিন্তু ডরিস মুখটা ঘুরিয়ে রাখায় ওর গালেই চুমু দিলো সে। তার পরেই ডরিস চলে গেলো, ফের ওর দরজায় আলতো করে চাবি ঘোরাবার শব্দ শুনতে পেলো গাই। ধুপ করে কুর্সিতে বসে সে বই পড়ার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু স্ত্রীর ঘরে সামান্যতম শব্দটুকু শোনার চেষ্টায় সে তখন উৎকর্ণ হয়ে আছে। ডরিস বলেছিলো ও শুয়ে পড়বে, অথচ ওর নড়াচড়া করার কোনো শব্দই সে শুনতে পাচ্ছিলো না। ঘরের নৈঃশব্দ্য তাকে রীতিমতো বিচলিত করে তুলছিলো। হাত দিয়ে ঘরের আলোটাকে আড়াল করে সে লক্ষ্য করলো, ডরিসের দরজার নিচে আলোর আভা ছড়িয়ে পড়েছে। তার মানে ও আলো নেভায়নি। কি করছে ও? গাই হাতের বইটা নামিয়ে রাখলো। ডরিস রাগ করলে, একটা নাটক গড়ে তুললে কিংবা কান্নাকাটি করলে সে অবাক হতো না। ওগুলো সে সামলাতে পারতো। কিন্তু ওর এই হিমস্তব্ধতা গাইকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। তাছাড়া কিসের অমন আতঙ্ক, যা ওর চোখে গাই অতো স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছে? গতরাত্রে গাই ওকে যা কিছু বলেছে, তা ফের একবার মনে মনে

চিন্তা করে নিলো। আর কিভাবে কথাগুলো বলা যেতো তা সে জানে না। শত হলেও আসল কথা হচ্ছে, সবাই যা করে গাইও তা-ই করেছে এবং ডরিসের সঙ্গে তার দেখা হবার অনেক আগেই সে সমস্ত ব্যাপার চুকে গেছে। অবিশ্যি শেষ অব্দি বোঝা গেছে যে গাই ওটা বোকামোই করে ফেলেছিলো—তবে কি না চোর পালালে সকলেই বুদ্ধিমান হতে পারে। নিজের বুকে হাত রাখলো গাই। অবাক কাণ্ড, ওখান-টাতে তার কষ্ট হচ্ছে!

'লোকে যখন বুক ভেঙে গেছে বলে, তখন তারা বোধহয় এই ব্যাপারটাই বোঝাতে চায়,' গাই নিজের মনে বললো। 'কতোদিন এমনি চলবে তা কে জানে?'

তবে কি সে ডরিসের দরজায় টোকা দিয়ে বলবে যে সে ওর সঙ্গে কথা বলতে চায়? এর চাইতে একটা ফাটাফাটি হয়ে যাওয়া ভালো। গাই ওকে সবকিছু বোঝা-বেই বোঝাবে। কিন্তু ওর এই নীরবতা তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। একটাও আওয়াজ নেই! হয়তো ওকে একা থাকতে দেওয়াই ভালো। ও যতোটা সময় চায়, ততোটাই ওকে দিতে হবে। আর যাই হোক না কেন, ডরিস জানে ওকে সে কতো গভীর-ভাবে ভালোবাসে। ধৈর্য—এখন একমাত্র জিনিস হচ্ছে ধৈর্য ধরে থাকা। হয়তো ডরিস নিজের সঙ্গে লড়াই করে ব্যাপারটার ফয়সালা করে নিচ্ছে। এখন ওকে সময় দিতে হবে, ধৈর্য ধরে থাকতে হবে।

পরদিন সকালে গাই ডরিসকে জিগেস করলো, আগের দিনের চাইতে ঘুমটা ভালো হয়েছিলো কি না।

'হ্যাঁ, অনেকটা,' জবাব দিলো ডরিস।

'তুমি কি আমার ওপরে খুবই রাগ করেছো?' গাই করুণ কণ্ঠে শুধালো।

অকপট খোলা চোখে ওর দিকে তাকালো ডরিস, 'একটুও না।'

'লক্ষ্মী, সোনা আমার! কি যে আনন্দ লাগছে! জানি আমি একটা পশুর মতো কাজ করেছি, জানি তোমার ভীষণ খারাপ লেগেছে। তবু আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও, লক্ষ্মীটি!'

'ক্ষমা করেছি। এমন কি ওই জন্যে তোমাকে কোনো দোষও দিচ্ছি না।'

ডরিসের দিকে তাকিয়ে গাই বিধুর ভঙ্গিতে হাসলো। তার দু চোখে বেত-খাওয়া কুকুরের দৃষ্টি।

'দুটো রাত একা একা শুতে আমার একটুও ভালো লাগেনি।'

ডরিস অন্য দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলো। ওর মুখখানা সামান্য ফ্যাকাশে।

'আমার ঘর থেকে আমি খাটটা সরিয়ে দিয়েছি। অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকতো। তার বদলে একটা ছোট্ট ক্যাম্প-খাট আনিয়েছি।'

'লক্ষীটি ! এসব কি বলছো তুমি ?'

এবারে ডরিস স্থির দৃষ্টিতে গাইয়ের দিকে তাকালো, 'আমি আর স্ত্রী হিসেবে তোমার সঙ্গে বাস করবো না।'

'কোনোদিনও না ?'

ডরিস মাথা নাড়লো। গাই বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। ওর কথাগুলো সে সত্যিই শুনেছে বলে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলো না। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ফের ঘা মারতে শুরু করেছিলো বেদনাদায়কভাবে।

'কিন্তু ডরিস, আমার প্রতি তোমার কেন এ নিদারুণ অবিচার ?'

'এই পরিবেশে আমাকে এখানে এনে, আমার প্রতিও একটু অবিচার করা হয়েছে বলে কি তোমার মনে হয় না ?'

'কিন্তু তুমি তো এইমাত্র বললে যে তুমি আমাকে দোষ দিচ্ছো না !'

'সেটা ঠিকই বলেছি। কিন্তু অন্য ব্যাপারটা আলাদা। সেটা আমি পারবো না।'

'কিন্তু তাহলে আমরা এভাবে একসঙ্গে কি করে থাকবো ?'

ডরিস মেঝের দিকে তাকালো। মনে হলো যেন ও গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে।

'কাল রাতে তুমি যখন আমার ঠোঁটে চুমু দিতে চাইছিলে, তখন···তখন আমার প্রায় বমি এসে গিয়েছিলো।'

'ডরিস !'

আচমকা গাইয়ের দিকে তাকালো ডরিস। ওর চোখ দুটি শীতল আর বিদ্বেষী।

'যে বিছানাটায় আমি ঘুমিয়েছি, ওই বিছানাতেই কি ওই মেয়েটা ওর বাচ্চা-গুলোকে প্রসব করেছিলো ?' ডরিস লক্ষ্য করলো গাই লাল হয়ে উঠেছে। 'ওঃ, কি ভয়ঙ্কর ! তুমি কি করে পারলে ?' ডরিস ওর হাত দুটো মোচড়াতে থাকে। দোমড়ানো-মোচড়ানো যন্ত্রণাক্লিষ্ট আঙুলগুলোকে দেখে মনে হয় যেন কয়েকটা ছোটো ছোটো কিলবিলে সাপ। তবু প্রাণপণ প্রয়াসে নিজেকে ও সামলে নিয়ে বলে, 'আমি একেবারে মনস্থির করে ফেলেছি। তোমার প্রতি আমি অকরুণ হতে চাই না। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার আছে যেগুলো করার জন্যে তুমি আমাকে অনুরোধ করতে পারো না। আমি সবকিছু ভেবে-চিন্তে দেখেছি। তুমি আমাকে বলার পর থেকে আমি আর অন্য কিছুই ভাবিনি—অবসন্ন হয়ে *ওঠা অব্দি দিন-রাত* শুধু ওই একটা কথাই ভেবেছি। প্রথমেই মনে হলো, উঠে চলে যাই। তক্ষুণি। স্টিমারটা দু-তিন দিনের মধ্যেই এখানে আসবে।'

'আমি যে তোমাকে ভালোবাসি, তাতে কি তোমার কিছুই এসে যায় না ?'

'আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো। আমি ও-কাজ করবো না। আমি আমাদের দুজনকে একটা সুযোগ দিতে চাই। আমি যে তোমাকে বড্ড ভালোবেসেছিলাম, গাই!' ডরিসের গলা ভেঙে আসে, কিন্তু ও কাঁদে না। 'আমি অবুঝ হতে চাইনে। ঈশ্বর জানেন, আমি নিষ্ঠুর হতেও চাইনে। তুমি···তুমি আমাকে একটু সময় দেবে, গাই?'

'তুমি কি বলতে চাইছো, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমাকে একটু একা থাকতে দাও। আমার মনে যে অনুভূতিগুলো জাগছে, তাতে আমি ভয় পেয়ে যাচ্ছি।'

গাই তাহলে ঠিকই ধরেছে। ও ভয় পেয়েছে।

'কোন্ অনুভূতি?'

'দয়া করে আমাকে জিগেস কোরো না। আমি তোমাকে আঘাত দেবার জন্যে কিছু বলতে চাইনে। হয়তো এগুলো আমি কাটিয়ে উঠবো। ঈশ্বর জানেন, আমি তা-ই চাই। আমি চেষ্টা করবো, কথা দিচ্ছি—আমি চেষ্টা করবো। আমাকে ছ মাস সময় দাও। তোমার জন্যে আমি পৃথিবীতে সমস্ত কিছু করবো, শুধু ওই একটি জিনিস বাদে,' ডরিস মিনতির ভঙ্গিমায় বলে। 'আমাদের যথেষ্ট সুখী না হবার কোনো কারণ নেই। তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো তাহলে···তাহলে একটু ধৈর্য ধরে থাকো।'

গাই একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'বেশ। তুমি যা করতে চাও না, তা আমি অবশ্যই তোমাকে দিয়ে জোর করে করাতে চাইবো না। তুমি যা বলছো তা-ই হবে।'

সামান্য কিছুক্ষণ ভারি হয়ে বসে থাকে গাই, যেন আচমকা বুড়ো হয়ে গেছে, নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'অফিসে চলি।'

টুপিটা নিয়ে বেরিয়ে যায় মানুষটা।

এক মাস কেটে যায়। মেয়েরা তাদের অনুভূতিগুলোকে ছেলেদের চাইতে বেশি ভালোভাবে লুকিয়ে রাখতে পারে। বাইরের কেউ বাড়িতে এলে অনুমানও করতে পারবে না, ডরিসের মনে কোনো অশান্তি আছে। কিন্তু গাইয়ের মানসিক চাপটা একেবারে প্রকট—তার গোলগাল ভালোমানুষী মুখটা ঝুলে পড়েছে, দু চোখে ক্ষুধার্ত হয়রান দৃষ্টি। ডরিসকে সে লক্ষ্য করে। ডরিস আগের মতোই খুশিয়াল, আগের মতোই তার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করে। ওরা একসঙ্গে টেনিস খেলে, এটা সেটা নিয়ে গল্পগুজব করে। কিন্তু এটা একেবারে স্পষ্ট যে ও শুধু অভিনয় করে যাচ্ছে। শেষ অব্দি আর থাকতে না পেরে গাই ফের ওই মালয়ী মেয়েটার সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রসঙ্গটা তুলে কথা বলার চেষ্টা করে।

'আঃ গাই, ফের ও সমস্ত কথা তোলার কোনো অর্থই হয় না।' ডরিস ঝাঁঝালো সুরে বলে, 'ওই প্রসঙ্গে আমাদের যা কিছু বলার, তা সবই আমরা বলেছি। আমি কোনো কিছুর জন্যেই তোমাকে দোষ দিচ্ছি না।'

'তবে কেন তুমি আমাকে শাস্তি দিচ্ছো?'

'বেচারা! আমি তোমাকে শাস্তি দিতে চাই না। আমি যদি··· ···সেটা আমার দোষ নয়।' ডরিস দু কাঁধে ঝাঁকুনি তোলে, 'মানুষের প্রকৃতি বড়ো বিচিত্র!'

'বুঝলাম না।'

'চেষ্টা কোরো না।'

কথাগুলো হয়তো কর্কশ শোনাতো, কিন্তু ডরিসের মিষ্টি আন্তরিক হাসিটা তাকে কোমল করে তোলে। প্রতি রাত্রে শুতে যাবার আগে ও গাইয়ের কাছে ঝুঁকে তার গালে আলতো করে একটা চুমু দেয়। ওর ঠোঁট দুটি গালটাকে শুধু একটু ছুঁয়ে যায় মাত্র, যেন একটা উড়ন্ত পতঙ্গের পাখা আলতো করে ছুঁয়ে যায় গালটাকে।

দ্বিতীয় মাসটা কেটে গেলো, তারপর তৃতীয় এবং আচমকা এভাবেই শেষ হয়ে গেলো ছটা মাস—যা একেবারে অন্তহীন বলে মনে হয়েছিলো। গাই নিজেকেই প্রশ্ন করে, ডরিসের কি ব্যাপারটা মনে আছে? ডরিসের প্রতিটি কথা, মুখের প্রতিটি অভিব্যক্তি আর হাতের প্রত্যেকটি ভঙ্গিমা সে মন দিয়ে লক্ষ্য করে। কিন্তু ডরিস একেবারে অভেদ্য। গাইকে ও ছ মাস সময় দিতে বলেছিলো—হ্যাঁ, গাই তা দিয়েছে।

উপকূল ধরে যাতায়াতকারী স্টিমারটা মোহনা দিয়ে নিজের পথে চলে যাবার সময় এখানকার ডাক নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো। গাই ব্যস্তভাবে চিঠিপত্রগুলো লিখে ফেললো, কারণ স্টিমারটা ফেরার পথে সেগুলোকে নিয়ে যাবে। দু-তিন দিন কেটে গেলো। আজ মঙ্গলবার। মোহনায় স্টিমারটার জন্যে চিঠিপত্র নিয়ে অপেক্ষা করার জন্যে প্রাহু জাতীয় নৌকোটা বেস্পতিবার ভোরবেলায় রওনা হয়ে যাবে। ইদানীং ডরিস আর গাই পরস্পরের সঙ্গে খুব একটা কথাবার্তা বলে না। একমাত্র খাওয়া-দাওয়ার সময় ডরিস আলাপ-আলোচনা চালাবার খানিকটা প্রয়াস করে। আজও রাতে খাওয়াদাওয়ার পর যথারীতি যে যার বই নিয়ে পড়তে শুরু করলো। কিন্তু চাকরটা টেবিল সাফ করে চলে যেতেই ডরিস নিজের বইটা নামিয়ে রাখলো।

'গাই, আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই,' অস্ফুটে বললো ও।

আচমকা গাইয়ের হৃৎপিণ্ডটা যেন পাঁজরে আঘাত করলো, অনুভব করলো তার মুখের রঙ বদলে যাচ্ছে।

'একি, তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন গো? কথাটা এমন সাংঘাতিক কিছু নয় কিন্তু!' ডরিস হাসলো।

কিন্তু গাইয়ের মনে হলো, ওর গলাটা যেন একটু কেঁপে উঠলো। .

'কি কথা?'

'আমার জন্যে একটা কাজ করবে?'

'তোমার জন্যে আমি পৃথিবীর যে কোনো কাজ করতে রাজী।'

ডরিসের হাত ধরার জন্যে গাই নিজের হাতটা বাড়ালো, কিন্তু ডরিস সরিয়ে নিলো নিজের হাতখানা।

'আমাকে তুমি দেশে যেতে দাও।'

'তোমাকে?' আতঙ্ক আর বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো গাই, 'কবে? কেন?'

'আমি যতো দিন পেরেছি সহ্য করেছি। কিন্তু এখন আমি সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি।'

'কতো দিনের জন্যে যেতে চাও? চিরদিনের মতো?'

'জানি না। হয়তো তা-ই।' একটু দৃঢ়তা সঞ্চয় করে ডরিস বললো, 'হ্যাঁ চির-দিনের মতো।'

'হে ঈশ্বর!'

গাইয়ের গলা ভেঙে যায়। ডরিসের মনে হয় মানুষটা কেঁদে ফেলবে।

'আমাকে তুমি দোষ দিও না, গাই! এটা সত্যিই আমার দোষ নয়। কিন্তু আমি নিজেকে মানাতে পারলাম না।'

'তুমি আমার কাছে ছ মাস সময় চেয়েছিলে। আমিও তোমার শর্ত মেনে নিয়ে-ছিলাম। এর মধ্যে আমি নিজেকে বিরক্তিকর করে তুলেছি, তা তুমি বলতে পারবে না।'

'না, না।'

'আমার সময়টা যে কি বিশ্রীভাবে কাটছে তা তুমি যাতে বুঝতে না পারো, আমি সে চেষ্টাও করেছি।'

'জানি। তোমার কাছে আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ। তুমি আমার সঙ্গে অসম্ভব ভালো ব্যবহার করেছো। শোনো গাই, আমি তোমাকে আবারও বলছি, তুমি যা কিছু করেছো তার একটি জিনিসের জন্যেও আমি তোমাকে কোনো দোষ দিচ্ছি না। শত হলেও তখন তুমি নেহাতই একটা ছেলেমানুষ ছিলে। অন্যেরা যা করে, তুমি তার চাইতে বেশি কিছু করোনি। এখানকার নির্জনতা যে কি জিনিস, তা আমি জানি। তোমার জন্যে আমি প্রচণ্ড দুঃখিত। কিন্তু এমনটা যে হবে তা আমি গোড়া থেকেই জানতাম। তাই তোমার কাছে ছটা মাস সময় চেয়েছিলাম। আমার সাধারণ বুদ্ধি বলে, আমি তিলকে তাল করে তুলেছি। আমি অবুঝ, আমি তোমার প্রতি অবিচার করছি। কিন্তু এর সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই।

আমার সমস্ত সত্তা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। গ্রামে ওই মেয়েটা আর ওর বাচ্চাগুলোকে দেখলেই আমার পা দুটো কাঁপতে থাকে। যে বিছানায় আমি শুয়েছি সেটার কথা ভাবলেই আমার গায়ে কাঁটা দেয়। তুমি জানো না আমি কতোটা সহ্য করেছি।'

'ওকে আমি এখান থেকে চলে যাবার জন্যে বোধহয় রাজী করিয়ে ফেলেছি। তাছাড়া আমি বদলির দরখাস্তও করেছি।'

'তাতে কোনো লাভ হবে না। ও সব সময় সব জায়গাতেই থাকবে। তুমি ওদের, তুমি আমার নও। শুধু একটা বাচ্চা থাকলেও হয়তো আমি মেনে নিতে পারতাম, কিন্তু তিনটে! ছেলেগুলো তো বেশ বড়োই হয়ে গেছে। তুমি দশটা বছর ওই মেয়েটার সঙ্গে থেকেছো।' ডরিস যা বলতে চাইছিলো, এতোক্ষণে ও সেখানে এসে পৌঁছলো। এখন ও মরিয়া। 'এটা একটা দৈহিক ব্যাপার। আমার কিছু করার নেই। আমার চাইতে ওটার শক্তি বেশি। ঐ সরু সরু কালো হাত দুটো দিয়ে ও তোমাকে জড়িয়ে আছে, ভাবলেই আমার বমি এসে যায়। মনে মনে ভাবি, ওই কেলে কেলে বাচ্চাগুলোকে তুমি কোলে করে রেখেছো। মাগো, কি ঘেন্না! তোমার স্পর্শও এখন আমার কাছে ক্লেদাক্ত। প্রতি রাত্রে তোমাকে চুমু দেবার সময় আমাকে জোর করে এগুতে হয়েছে। হাত মুঠো করে, জোর করে তোমার গাল ছুঁতে হয়েছে।' নিদারুণ স্নায়বিক যন্ত্রণায় ডরিস বারবার নিজের আঙুলগুলোকে মুঠিবদ্ধ করে আর খুলে ফেলে। কণ্ঠস্বরেও আর সংযম নেই। 'আমি জানি, এখন দোষটা আমারই। আমি একটা বোকা, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়েমানুষ। ভেবেছিলাম এটা আমি কাটিয়ে উঠতে পারবো। কিন্তু পারছি না, কোনোদিনও পারবো না। এ ব্যাপারটা আমি নিজেই ডেকে এনেছি এবং আমি স্বেচ্ছায় এর ফল ভোগ করবো। তুমি যদি বলো, আমাকে এখানে থাকতেই হবে—আমি থাকবো। কিন্তু থাকলে আমি মরে যাবো। আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, আমাকে যেতে দাও।'

এতোক্ষণ ডরিস যে অশ্রুধারা চেপে রেখেছিলো, এবারে তা চোখের কোল ছাপিয়ে নেমে এলো। বুকভাঙা কান্নায় মুখর হয়ে উঠলো ও। এর আগে গাই কোনোদিনও ওকে কাঁদতে দেখেনি।

'তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই তোমাকে এখানে রাখতে চাই না,' ভাঙা ভাঙা ফ্যাসফেঁসে গলায় গাই বললো।

ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ডরিস কুর্সিতে এলিয়ে রইলো। ওর নাক মুখ চোখ সব যেন দুমড়ে কুঁচকে গেছে। যে মুখ স্বভাবতই অমন শান্ত-স্নিগ্ধ, সে মুখে দুঃখের এমন একচ্ছত্র আধিপত্যের ছবি দেখা বড়ো মর্মান্তিক বেদনাদায়ক।

'আমি দুঃখিত, গাই। আমি তোমার জীবনটা নষ্ট করে দিলাম! কিন্তু আমার

জীবনটাও আমি নষ্ট করে দিয়েছি। অথচ আমরা কত্তো সুখী হতে পারতাম!'

'কবে যেতে চাও? বেস্পতিবার?'

'হ্যাঁ।'

ডরিস করুণ চোখে গাইয়ের দিকে তাকালো। দু হাতের অঞ্জলিতে মুখ ঢাকলো গাই। অবশেষে মুখ তুলে সে অস্ফুটে বললো, 'আমি বড়ো ক্লান্ত।'

'তাহলে আমি যেতে পারি?'

'হ্যাঁ।'

মিনিট দুয়েক ওরা নির্বাক হয়ে ওখানেই বসে রইলো। হঠাৎ গিরগিটির তীক্ষ্ণ, কর্কশ, প্রায় মানুষের মতো চিৎকারে চমকে উঠলো ডরিস। গাই কুর্সি থেকে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে গেলো। তারপর বেষ্টনীর গায়ে ঝুঁকে, তাকিয়ে রইলো নদীর শান্ত ধারার দিকে। ডরিসের ঘরে চলে যাবার শব্দ শুনতে পেল সে।

পরদিন সকালে অন্যদিনের চাইতে তাড়াতাড়ি উঠে গাই ডরিসের দরজায় টোকা দিলো।

'কে?'

'আমাকে আজ নদীর ওদিকে যেতে হচ্ছে। ফিরতে দেরি হবে।'

'ঠিক আছে।'

ডরিস সব বুঝতে পারলো। ওর গোছগাছের সময় যাতে কাছে থাকতে না হয়, তাই গাই সারাটা দিন বাইরে কাটাবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। কাজটা করতে বুক ভেঙে যায়। তবু পোশাক-আশাক গুছিয়ে বৈঠকখানায় নিজের জিনিসগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো ও। ওগুলো নিয়ে যাওয়া বড়ো কঠিন। মায়ের ছবিটা ছাড়া আর সমস্ত কিছুই রেখে দিলো ডরিস। গাইয়ের বাড়িতে ফিরতে সেই রাত দশটা। বললো, 'দুঃখিত, রাতে খাওয়ার সময় ফিরতে পারলাম না। আসলে আমাকে গাঁয়ের মোড়লের কাছে যেতে হয়েছিলো। সে আবার গাদাগুচ্ছের কাজ জমিয়ে রেখেছিলো আমার জন্যে।'

ডরিস দেখলো গাইয়ের চোখ দুটো ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর মায়ের ছবিটা যে যথাস্থানে নেই তাও সে লক্ষ্য করেছে। বললো, 'সবকিছু গোছগাছ করা হয়ে গেছে তো? মাঝিকে আমি খুব ভোরে আসতে বলে দিয়েছি।'

'চাকরটাকে আমি বলে রেখেছি, ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙিয়ে দেবে।'

'তোমাকে বরঞ্চ কিছু টাকা দিয়ে রাখি,' টেবিলের কাছে গিয়ে একটা চেক লিখলো গাই। তারপর টানা থেকে কয়েকটা নোট বের করে বললো, 'এই টাকাটা রাখো, এতে তোমার সিঙ্গাপুর অব্দি চলে যাবে। সিঙ্গাপুরে তুমি চেকটা ভাঙিয়ে

নিতে পারবে।'

'ধন্যবাদ।'

'তোমার সঙ্গে নদীর মুখ অব্দি গেলে আপত্তি করবে?'

'আমার মনে হয় এখান থেকেই বিদায় নেওয়া ভালো।'

'বেশ। আমি তাহলে শুতে যাই। সারাটা দিন প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে, ভীষণ ক্লান্ত।'

গাই ডরিসের হাতটাও স্পর্শ করলো না। নিজের ঘরে চলে গেলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডরিস শব্দ শুনে বুঝলো, নিজেকে বিছানায় ছুঁড়ে দিয়েছে মানুষটা। খানিকক্ষণ বসে বসে শেষবারের মতো ঘরটার চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো ডরিস। এই ঘরেই কতো সুখ আর কত দুঃখ পেয়েছে ও। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও। তারপর উঠে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। রাতে কাজে লাগার মতো দু-একটা দরকারী জিনিস ছাড়া আর সমস্ত কিছুই গোছানো হয়ে গেছে ওর।

চাকরটা যখন ওদের জাগিয়ে দিলো তখনও চারদিকে অন্ধকার। তাড়াতাড়ি পোশাক-আশাক পরে নিলো ওরা। ততোক্ষণে সকালের জলখাবার সাজানো হয়ে গেছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই ওরা শব্দ শুনলো, নৌকোটা বাংলোর নিচের ঘাটে এসে লাগছে। চাকরগুলো ডরিসের জিনিসপত্র নিচে বয়ে নিয়ে গেলো। স্রেফ খাওয়ার ভান করলো দুজনে। অন্ধকার এবারে একটু পাতলা হয়ে এসেছে, নদীটাকে ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। এখনও দিন হয়নি, কিন্তু রাতও আর নেই। নৈঃশব্দ্যের মধ্যে খুব স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এদেশী লোকগুলোর কণ্ঠস্বর। গাই তার স্ত্রীর প্লেটটার দিকে এক ঝলক তাকালো—ওটা ও স্পর্শও করেনি।

'তোমার খাওয়া হয়ে গিয়ে থাকলে এবারে আমরা পায়ে পায়ে এগুতে পারি। এখন তোমার রওনা হওয়া উচিত বোধহয়।'

ডরিস কোনো জবাব দিলো না। টেবিল থেকে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে দেখে এলো, ভুল করে কিছু রেখে গেলো কিনা। তারপর গাইয়ের পাশাপাশি নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। ছোট্ট একটা আঁকাবাঁকা পথ ওদের নদীর কাছে পৌছে দিলো। এ-দেশী সেপাইরা উর্দি পরে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে নদীর ঘাটে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিলো। গাই আর ডরিস পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা হাত তুলে অভিবাদন জানালো। ডরিস নৌকোতে পা ফেলতেই বড়ো-মাঝি একটা হাত বাড়িয়ে দিলো ওর দিকে। মুখ ঘুরিয়ে গাইয়ের দিকে তাকালো ডরিস। ও মরিয়া হয়ে গাইকে শেষবারের মতো সান্ত্বনার কথা বলতে চাইছিলো, আরও একবার ক্ষমাপ্রার্থনা করতে চাইছিলো তার কাছে। কিন্তু ও যেন বোবা হয়ে গেছে। গাই নিজের হাতটা এগিয়ে দিলো ওর দিকে।

'বিদায়। আশা করি তোমার যাত্রাপথ আনন্দে কাটবে।'

হাতে হাত মেলালো ওরা।

গাই বড়ো-মাঝির দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়তেই নৌকোটাকে তীর থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হলো। অস্পষ্ট উষা নদীর বুক ধরে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে, কিন্তু রাতটা এখনও লুকিয়ে রয়েছে অরণ্যের আবছা গাছগুলোতে। ভোরের ছায়ায় ছায়ায় নৌকোটা হারিয়ে যাওয়া অব্দি ঘাটেই দাঁড়িয়ে রইলো গাই—তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়ালো। সেপাইরা ফের হাত তুলে অভিবাদন জানাতে অন্য-মনস্কভাবে সে শুধু ঘাড় নাড়লো। কিন্তু বাংলোতে পৌঁছেই চাকরটাকে ডাকলো গাই এবং ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ডরিসের প্রত্যেকটা জিনিস একটা একটা করে তুলে ফেলতে লাগলো।

'এগুলো সব তুলে ফেলো। এভাবে এগুলোকে ছড়িয়ে রাখার কোনো অর্থ হয় না,' বললো সে।

তারপর বারান্দায় বসে বসে গাই দেখতে লাগলো একটা তিক্ত, অহেতুক, প্রচণ্ড দুঃখের মতো দিনটা ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। অবশেষে নিজের ঘড়ির দিকে তাকালো সে। এতোক্ষণে অফিসে যাবার সময় হলো।

বিকেলে কিছুতেই ঘুম আসছিলো না। মাথাটা বিশ্রীভাবে ধরে রয়েছে। তাই বন্দুকটা নিয়ে গাই জঙ্গলে এক পাক ঘুরে আসতে গেলো। কোনো কিছুই সে শিকার করলো না, শুধু হেঁটে হেঁটে বেড়ালো নিজেকে ক্লান্ত করে তুলতে। সূর্যাস্ত নাগাদ ফিরে এসে দু-তিন পাত্র সুরা পান করলো সে। তারপর রাতের খানার জন্যে পোশাক বদলাবার সময় হলো। কিন্তু এখন আর খানার জন্যে পোশাক চড়ানোর কোনো অর্থ হয় না। তার চাইতে বরং আরামদায়ক কিছু পরে নেওয়া যায়। একটা ঢিলে দেশী কুর্তা আর একটা লুঙ্গি পরে নিলো গাই। ডরিস আসার আগে সে এই পোশাকেই অভ্যস্ত ছিলো। এখন তার পায়েও কিছু নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাবার খেয়ে নিলো গাই। চাকরটা টেবিল পরিষ্কার করে চলে গেলো। গাই ট্যাটলার পত্রিকাটা নিয়ে বসলো। বাংলোটা বড্ড চুপচাপ। গাই পড়তে পারলো না, পত্রিকাটা খসে পড়লো হাঁটুর ওপরে। ক্লান্তিতে সে একেবারে অবসন্ন—কিচ্ছু ভাবতে পারছে না, মনটা অদ্ভুত ফাঁকা। গিরগিটিটা আজ রাতে যেন আরো বেশি করে ডাকছে, ওটার কর্কশ আর আচমকা চিৎকার যেন বিদ্রূপ করছে তাকে। ওইটুকু একটা ছোট্ট গলা দিয়ে যে এমন প্রতিধ্বনিময় শব্দ বেরোয় তা প্রায় বিশ্বাসই করা যায় না।

একটু বাদেই একটা সতর্ক কাশির আওয়াজ শুনতে পেলো গাই।

'কে ওখানে?' চিৎকার করে জানতে চাইলো সে।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। গাই দরজার দিকে তাকায়। গিরগিটিটা হেসে ওঠে কর্কশ স্বরে। ছোট্ট একটা ছেলে চুপিচুপি এসে দোরগোড়ার কাছে দাঁড়ায়। জীর্ণ গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরা এই ছোট্ট দো-আঁশলা ছেলেটা গাইয়ের দুই ছেলের মধ্যে বড়োটি।

'কি চাও?' গাই প্রশ্ন করে।

ছেলেটা ঘরে ঢুকে, পা দুটো শরীরের নিচে গুঁজে বসে।

'কে তোমাকে এখানে আসতে বললো?'

'মা পাঠিয়ে দিলো। জানতে চেয়েছে, তোমার কিছু চাই কি না।'

এক মনে ছেলেটার দিকে তাকায় গাই। ছেলেটা আর কিছুই বলেনি। শুধু বসে বসে অপেক্ষা করছে। চোখ দুটো লাজুক ভঙ্গিতে নিচের দিকে নামানো। গভীর এবং তিক্ত অনুভূতিতে নিজের হাতে মুখ ঢাকে গাই। কি লাভ? সবই তো শেষ হয়ে গেছে। সব শেষ! হাত ছেড়ে দিয়ে ফের কুর্সিতে বসে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো সে।

'তোমার মাকে তোমাদের আর ওর জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে ফেলতে বলো। ও এখানে ফিরে আসতে পারে।'

'কবে?' নির্বিকার ভঙ্গিতে জিগেস করে ছেলেটা।

গাইয়ের মজাদার গোলগাল ব্রণকণ্টকিত গাল বেয়ে উষ্ণ অশ্রু নেমে আসে।

'আজ রাতে।'

প্রতিশ্রুতি

আমার স্ত্রী একেবারেই সময়নিষ্ঠ নয়।

তাই ওর সঙ্গে দুপুরে ক্ল্যারিজে খাওয়ার কথাটা পাকাপাকি করেও আমি নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট বাদে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম এবং তখনও সেখানে ওকে না দেখে একটুও অবাক হলাম না। নিজের জন্যে আমি একটা ককটেল আনার ফরমাশ দিলাম। এটা প্রচণ্ড ভিড়ভাট্টার সময়, লাউঞ্জে মোটে দু-তিনটে টেবিল ফাঁকা পড়ে অছে। কেউ কেউ একটু তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। আর অন্যেরা আমার মতোই একটা ড্রাই মার্টিনি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। গ্রীষ্মের হালকা পোশাকে মেয়েদের বেশ খুশিয়াল আর আকর্ষণীয় লাগছে। পুরুষরাও দিব্যি সুদর্শন আর সুভদ্র। এখনও প্রায় সিকি ঘণ্টা আমাকে অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এমন কাউকে চোখে পড়লো

না, যে এই সময়টুকু আমার মনে যথেষ্ট আগ্রহ জাগিয়ে রাখতে পারবে। এখানে মেয়েরা সকলেই ছিপছিপে, সুদর্শনা, সুবেশা এবং অন্যমনস্ক স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা। কিন্তু ওরা সকলেই একটা বিশেষ ছকের অংশবিশেষ। কৌতূহলে নয়, বরং বলা যায় ধৈর্য ধরেই আমি ওদের লক্ষ্য করতে লাগলাম। এদিকে বেলা দুটো বাজে, বেশ খিদে পেয়ে গেছে। আমার স্ত্রী বলে, নীলা বা ঘড়ি কোনোটাই ও ব্যবহার করতে পারে না। কারণ ও হাতে পরলে নাকি নীলাটা সবুজ আর ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যায়। এবং এটাকে ও ভাগ্যের নিষ্ঠুর চক্রান্ত বলেই মনে করে। নীলার ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। তবে মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, ঘড়িটা ও দম দিলে হয়তো চলতো। বসে বসে এই সমস্ত ভাবছি, এমন সময় একটা পরিচারক এগিয়ে এসে ওদের স্বভাবসুলভ ইঙ্গিতপূর্ণ ফিসফিসে কণ্ঠস্বরে (যেন, সাদা অর্থে যা মনে হচ্ছে ওর কথার মধ্যে তার চাইতে একটা অশুভ গূঢ়ার্থ আছে) আমাকে বললো, এক ভদ্রমহিলা এইমাত্র টেলিফোন করে জানিয়েছেন যে উনি আটকে গেছেন এবং আমার সঙ্গে খাওয়ার জন্যে উনি আসতে পারছেন না।

আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলাম। একটা ভিড়াক্রান্ত রেস্তোরাঁয় একা একা বসে খাওয়া খুব একটা মজাদার ব্যাপার নয়। অথচ কোনো ক্লাবে যাওয়ার পক্ষেও বড্ড বেলা হয়ে গেছে। তাই ঠিক করলাম, যেখানে আছি বরঞ্চ সেখানেই থাকবো। খাওয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। কোনো কেতাদুরস্ত রেস্তোরাঁয় প্রধান পরিচারক আমার নাম জানলে আমি কোনোদিনই কোনো বিশেষ আনন্দ পাই না (যা অনেক অভিজাত ভদ্রলোকই পেয়ে থাকেন বলে মনে হয়)—তবে এ ক্ষেত্রে কেউ অপেক্ষাকৃত কম ভাবলেশহীন চোখে আমাকে সম্ভাষণ জানালে আমি অবশ্যই খুশি হতাম। প্রধান পরিচারক কঠিন মুখে আমার দিকে তাকিয়ে জানালো, সবকটা টেবিলই ভর্তি আছে। আমি অসহায় দৃষ্টিতে বিশাল জমকালো ঘরটার চতুর্দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ আমার পরিচিত একজনকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠলাম। লেডি এলিজাবেথ ভারমণ্ট আমার পুরনো বান্ধবী। আমাকে দেখে ও মৃদু হাসলো। এবং ও একা রয়েছে দেখে আমিও ওর কাছে এগিয়ে গেলাম।

'একজন ক্ষুধার্তকে করুণা করে তোমার সঙ্গে এক টেবিলে বসতে দেবে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'আরে বোসো! তবে আমার খাওয়া কিন্তু প্রায় শেষ।'

একটা বিশাল থামের পাশে ছোট্ট একটা টেবিল নিয়ে বসেছিলো এলিজাবেথ। লক্ষ্য করলাম, চতুর্দিকে প্রচণ্ড ভিড় থাকা সত্ত্বেও এ জায়গাটাতে খানিকটা আব্রু রয়ে গেছে।

'এটা আমার একটা সৌভাগ্যই বলতে হবে,' বললাম। 'খিদের আমার প্রায় মূর্ছা যাবার মতো অবস্থা হয়েছিলো।'

এলিজাবেথের হাসিটা ভারি মিষ্টি। হাসিটা হঠাৎ করে ওর মুখখানাকে আলো ঝলমলে করে তোলে না, একটু একটু করে মাধুর্যে ভরিয়ে তোলে। প্রথমে এক মুহূর্ত তা ঠোঁটের কাছে থেমে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে ওর ঝলমলে আয়ত চোখ দুটিতে ছড়িয়ে পড়ে একটু একটু করে এবং সেখানেই লেগে থাকে আলতো হয়ে। এলিজাবেথ সাধারণ ছাঁচে গড়া মেয়ে, একথা কেউই বলবে না। ওকে ওর বালিকা বয়সে আমি কোনোদিনও দেখিনি। তবে অনেকেই বলেছে, তখন ও এতো মিষ্টি ছিলো যে দেখে চোখে জল এসে যেতো। কথাটা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কারণ এখন পঞ্চাশ বছর বয়সেও ও অতুলনীয়া। ওর ঝরে-যাওয়া সৌন্দর্যের কাছে সতেজ উদ্ভিন্ন যৌবনকেও তুচ্ছ আর নীরস বলে মনে হয়। প্রসাধনে চর্চিত মুখ আমার ভালো লাগে না, দেখলে কেমন যেন একই রকম বলে মনে হয়। আমার মনে হয় ওটা মেয়েদের বোকামো—পাউডার, রুজ আর লিপস্টিক মুখের অভি-ব্যক্তিকে ম্লান করে দেয়, ব্যক্তিত্বকে বৈশিষ্ট্যহীন করে তোলে। কিন্তু এলিজাবেথ ভারমণ্টের প্রসাধন স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে হাস্যকরভাবে অনুকরণ করে না, তাকে সুন্দরতর করে তোলে। দেখলে উপায়গুলো সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না, ফলটুকুকে প্রশংসা করতে হয়। যে সতেজ সপ্রতিভতায় ও প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে তা ওর নিখুঁত মুখখানার চরিত্রকে হেয় করে না, বরং তাকে আরও উন্নত করে তোলে। আমার ধারণা ওর চুলগুলো রঙ করা। চুলগুলো কালো, মসৃণ আর চকচকে। নিজের শরীরটাকে ও সর্বদা ঋজু করে রাখে, যেন কখনও আলস্যে শিথিল হতে শেখেনি। চেহারাটা ভীষণ ছিপছিপে। এখন ওর পরনে কালো সাটিনের পোশাক, যার কাপড় এবং ছাঁটকাট দুই-ই প্রশংসনীয়। গলায় লম্বা এক ছড়া মুক্তোর মালা। অন্য অলঙ্কার বলতে শুধু একটা অতিকায় পান্নার আংটি যা ওর বিয়ের আংটিটাকে আড়াল করে রেখেছে। পান্নাটার গাঢ় ঘোলাটে দীপ্তি ওর হাতের শুভ্রতাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। কিন্তু নখে লাল-রঙ-করা ওর হাত দুটিই ওর বয়সের রহস্যকে একেবারে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দিয়েছে। ওর হাতে তরুণী মেয়েদের হাতের মতো নরম, টোল-পড়া সুডৌল লাবণ্য নেই। সেদিকে তাকালে অবশ্যই খানিকটা হতাশ হতে হয়। আর কিছুদিনের মধ্যেই হাত দুটো শিকারী পাখির নখরের মতো দেখতে হয়ে যাবে।

এলিজাবেথ ভারমণ্ট একজন বৈশিষ্ট্যময়ী মহিলা। উচ্চ কুলে জন্ম, সেণ্ট আর্থের সপ্তম ডিউকের মেয়ে। আঠারো বছর বয়সে এক প্রচণ্ড বড়লোকের সঙ্গে ওর বিয়ে

হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই ও এক বিস্ময়কর অসংযত উচ্ছৃঙ্খল স্বৈরিণীর জীবন শুরু করে দেয়। ও এতো অহঙ্কারী ছিলো যে কখনও সাবধান হবার কথা ভাবেনি, ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা করার ব্যাপারেও ও ছিলো বড্ড বেপরোয়া। দু বছরের মধ্যেই প্রচণ্ড কেচ্ছা-কেলেঙ্কারীর মধ্যে ওদের বিয়ে ভেঙে যায়। তারপর মামলায় যে তিনজন প্রতিবাদী ছিলো, ও তাদের মধ্যেই একজনকে বিয়ে করে এবং আঠারো মাস বাদে তার কাছ থেকেও চলে যায়। এরপর ক্রমাগত ওর এক-একজন প্রেমিক আসে আর যায়। অসচ্চরিত্র ও লাম্পট্যের জন্যে কুখ্যাত হয়ে ওঠে এলিজাবেথ, বিস্ময়কর সৌন্দর্য ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ওকে সাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরে। ভদ্রলোকরা ওর নাম শুনে নাক কোঁচকাতেন। ও ছিলো জুয়াড়ি, অপব্যয়ী, স্বৈরিণী। প্রেমিকদের কাছে অবিশ্বস্ত হলেও বন্ধুরা ওকে বিশ্বাস করতো। চিরদিনই ওর এমন কিছু বন্ধু ছিলো যারা সর্বদাই ওকে ভালো বলতো—তা ও যা-ই করুক না কেন। ওর স্বভাবটা ছিলো খোলামেলা, সাহস আর প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। ভণ্ডামি বস্তুটা ওর মধ্যে ছিলো না। ও ছিলো উদার ও আন্তরিক। ওর জীবনের এই সময়ে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ধর্মের ফ্যাশন উঠে যাবার পর থেকে বিখ্যাত মহিলারা আজকাল চারুকলার প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। নিজেদের সমাজে উপেক্ষা পেলে এরা কখনও কখনও লেখক চিত্রকর এবং সংগীত সমাজের প্রতি সদয় হয়ে ওঠেন। সঙ্গী হিসেবে ওকে আমার ভালোই লেগেছিলো। ও যা ভাবতো তা নির্ভয়ে বলে ফেলতো (ফলে অনেকটা প্রয়োজনীয় সময় বেঁচে যেতো), উপস্থিত বুদ্ধিও ছিলো চমৎকার। নিজের বীভৎস অতীতের কথা ও সর্বদাই বলতে চাইতো (রীতিমতো মজা করে) এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও ওর কথাবার্তা আমার ভালোই লাগতো—কারণ আর যা-ই হোক না কেন, ও ছিলো আন্তরিক সত্যবাদী।

তারপর এলিজাবেথ একটা প্রচণ্ড বিস্ময়কর কাজ করে বসলো। চল্লিশ বছর বয়সে ও একুশ বছরের একটি ছেলেকে বিয়ে করলো। ওর বন্ধু-বান্ধবরা বলাবলি করতে লাগলো, এটা ওর জীবনের সবচাইতে বড়ো পাগলামি। এতোদিন সুখ-দুঃখে যারা ওর সঙ্গে ছিলো, এবারে তারাও আর ওর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে রাজী হলো না—কারণ ছেলেটি ভালো এবং এভাবে তার অনভিজ্ঞতার সুযোগ নেওয়াটা রীতিমতো লজ্জাজনক। ব্যাপারটা সত্যিই যেন সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেলো। সবাই ভবিষ্যদ্বাণী করলো, এবারে ছেলেটির সর্বনাশ হবে। কারণ এলিজাবেথ কোনো পুরুষমানুষের সঙ্গেই ছ মাসের বেশি থাকতে পারে না। তবে এটা ছেলেটির পক্ষে আশার কথাও বটে—কারণ স্ত্রীর যথারীতি কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়া এবং

তার ফলস্বরূপ বিবাহ-বিচ্ছেদই ছেলেটির পক্ষে মুক্তির একমাত্র পথ। কিন্তু সবাই ভুল করেছিলো। আমি জানি না সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এলিজাবেথের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছিলো, না কি পিটার ভারমণ্টের নিষ্পাপ সরল ভালোবাসা ওর হৃদয়কে স্পর্শ করেছিলো—তবে এ কথা সত্যি যে এলিজাবেথ পিটারের আদর্শ স্ত্রী হয়ে উঠলো। পিটার গরীব ছিলো আর এলিজাবেথ ছিলো বেহিসেবী। কিন্তু এবারে এলিজাবেথ একেবারে হিসেবী গৃহিণী হয়ে উঠলো। নিজের সুখ্যাতি সম্পর্কে ও হঠাৎ এমন সচেতন হয়ে উঠলো যে ওর নিন্দুকদের মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। পিটারের সুখই যেন ওর একমাত্র চিন্তার বিষয়। ও যে পিটারকে সত্যিই মনেপ্রাণে ভালোবাসে সে বিষয়ে কারুর আর কোনো সন্দেহ রইলো না। এতো দীর্ঘদিন ধরে এতো রকম আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে থাকার পরে এলিজাবেথ ভারমণ্টকে নিয়ে এবারে সমস্ত আলোচনা বন্ধ হলো। মনে হলো ওর কাহিনী এবারে শেষ হয়ে গেছে। ও বদলে গেছে। মাঝে মাঝে আমার এই ভেবে ভালো লাগতো যে বহু বছর নিখুঁত সম্ভ্রান্ত জীবন কাটিয়ে এলিজাবেথ যখন খুব বুড়ো হবে তখন ওর অতীতটাকে—ওর উচ্ছৃঙ্খল অতীতটাকে —ওর নিজের বলে মনে হবে না···মনে হবে সে অতীত ওর নয়, ওর কোনো অল্প চেনা মহিলার, যে বহুদিন আগেই মরে গেছে। কারণ ভুলে যাবার মতো ঈর্ষাজনক ক্ষমতাটা মেয়েদের আছে।

কিন্তু ভাগ্যে কি আছে তা কে বলতে পারে? চোখের পলকে সবকিছু বদলে গেলো। দশ বছর আদর্শ বিবাহিত জীবন কাটিয়ে পিটার ভারমণ্ট বারবারা ক্যাণ্টন নামে একটি মেয়েকে পাগলের মতো ভালোবেসে ফেললো। বারবারা মেয়েটি ভালো। ওর বাবা রবার্ট ক্যাণ্টন একসময় বৈদেশিক দপ্তরের সহ-সচিব ছিলেন। বারবারা ওঁর সবচাইতে ছোটো মেয়ে। দেখতে শুনতে দিব্যি ভালো হলেও লেডি এলিজাবেথের সঙ্গে ওর কোনো তুলনাই চলে না। অনেকেই ঘটনাটা জানতো, কিন্তু এলিজাবেথ ভারমণ্ট এ ব্যাপারে কিছু আঁচ করতে পেরেছে কি না তা কেউই জানতো না। সবাই ভাবতো এমন একটা পরিস্থিতিতে—যা ওর কাছে সম্পূর্ণ নতুন —এলিজাবেথ কি করবে। চিরকাল এলিজাবেথই ওর প্রেমিকদের ত্যাগ করে এসেছে, ওকে কেউ ত্যাগ করেনি। আমার দিক থেকে আমার মনে হয়েছে, ছেলে-মানুষ মিস ক্যাণ্টনকে সরিয়ে দিতে ওর কোনো অসুবিধেই হবে না। কারণ ওর সাহস আর কুশলতা আমার জানা ছিলো।

খাওয়াদাওয়া চলার সময় এলিজাবেথের সঙ্গে গল্প করতে করতে এ সমস্ত কথার সবই আমার মনে পড়ছিলো। ওর আচরণ, খুশিয়াল আকর্ষণীয় ভঙ্গিমা, খোলা-মেলা আন্তরিক কথাবার্তা—সবই এখন স্বাভাবিক। কোথাও দুশ্চিন্তা বা অশান্তির

কোনো চিহ্ন নেই। আলোচনার মধ্যে যে প্রসঙ্গ উঠছে তা নিয়েই ও কথা বলছে ঠিক আগেকার মতো—তেমনি হালকা চাল, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত আর রসবোধে উজ্জ্বল। পরিস্থিতিটা রীতিমতো উপভোগ করছিলাম আমি। মনে হলো, কোনো অলৌকিক উপায়ে পিটারের মনোজগতের পরিবর্তনটা ওর নজর এড়িয়ে গেছে এবং এর একমাত্র ব্যাখ্যা হলো, পিটারকে ও এতো বেশি ভালোবাসে যে ও ভাবতেই পারে না, পিটার ওকে কম ভালোবাসতে পারে।

কফি শেষ করে আমরা পরপর কয়েকটা সিগারেট টানলাম। তারপর ও জানতে চাইলো, কটা বাজে।

'পৌনে তিনটে।'

'এবারে তাহলে আমার বিলটা চাইতে হচ্ছে।'

'সেটা আমাকে মেটাতে দিলে হয় না?'

'হয় বইকি,' এলিজাবেথ মৃদু হাসলো।

'তোমার কি তাড়া আছে নাকি?'

'তিনটের সময় পিটারের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা।'

'তাই বুঝি? তা কেমন আছে সে?'

'খুব ভালো।'

এলিজাবেথ ছোট্ট করে হাসলো। ওর সেই বিলম্বিত, মধুর হাসি। অথচ মনে হলো, ওর হাসির মধ্যে যেন খানিকটা বিদ্রূপ লুকিয়ে রয়েছে। মুহূর্তের জন্যে ও একটু ইতস্তত করলো, তারপর সচেষ্ট প্রয়াসে চোখ তুলে তাকালো আমার দিকে।

'অদ্ভুত অদ্ভুত পরিস্থিতি তোমার ভালো লাগে, তাই না?' এলিজাবেথ বললো, 'আমি এখন যে কি কাজ নিয়ে বেরিয়েছি তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আজ সকালে পিটারকে টেলিফোন করে বেলা তিনটের সময় ওকে দেখা করতে বলেছি। আমি ওকে আমাদের বিয়েটা ভেঙে দিতে বলবো।'

'না না,' আমি চিৎকার করে উঠলাম। অনুভব করলাম আমি লাল হয়ে উঠেছি। ভেবে পেলাম না কি বলবো। 'আমি তো ভেবেছিলাম তোমাদের মধ্যে খুব ভালো বোঝাপড়া আছে!'

'তুমি কি মনে করো, সারা দুনিয়া যা জানে আমি তা জানতে পারবো না? আমি সত্যিই অতোটা বোকা নই।'

যা নিজে বিশ্বাস করি না, তা এলিজাবেথের মতো মেয়ের কাছে বলা সম্ভব নয়। ও যা বলতে চাইছে তা বুঝতে পারিনি, এমন ভান করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। দু-এক মুহূর্ত নীরব থেকে জিগেস করলাম, 'ওকে তুমি বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে দেবে কেন?'

'রবার্ট ক্যাস্টন একেবারে সেকেলে গোঁড়া বুড়ো। আমার দিক থেকে বিচ্ছেদ হলে উনি বারবারার সঙ্গে পিটারের বিয়ে দেবেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর আমার দিক থেকে, তুমি তো জানোই, একবার বেশি বিবাহ-বিচ্ছেদ বা একবার কম—ওতে কিছুই এসে যায় না।'

সুন্দর কাঁধ দুটিতে ঝাঁকুনি তুললো এলিজাবেথ।

'পিটার যে বারবারাকে বিয়ে করতে চায় তা তুমি কি করে জানলে?'

'সে আপাদমস্তক বারবারার প্রেমে মজে রয়েছে।'

'তোমাকে সে তা-ই বলেছে?'

'না। আমি যে ব্যাপারটা জানি, তা-ও সে জানে না। কি করুণ অবস্থা বেচারার! প্রাণপণ চেষ্টা করছে যাতে আমি আঘাত না পাই।'

'হয়তো এটা স্রেফ একটা ক্ষণিকের মোহ,' আমি অনিশ্চিতভাবে বললাম, 'হয়তো এটা কেটে যাবে।'

'কাটবে কেন? বারবারার বয়েস কম, সুন্দরী। বেশ ভালো মেয়েটি। ওদের দুটিকে সুন্দর মানায়। তাছাড়া ওটা কেটে গেলেই বা কি লাভ? এখন ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে। আর ভালোবাসার ব্যাপারে বর্তমানটাই তো সব! পিটারের চাইতে আমি উনিশ বছরের বড়ো। মায়ের বয়সী স্ত্রীর ওপর থেকে যদি একবার কারুর ভালোবাসা চলে যায়, তুমি কি মনে করো সে আর কোনোদিনও ফের তাকে ভালোবাসতে পারবে? তুমি তো উপন্যাস লেখো। মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে তুমি নিশ্চয়ই এর চাইতে অনেক বেশি জানো!'

'কেন তুমি এমন ত্যাগ স্বীকার করবে?'

'দশ বছর আগে পিটার যখন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো তখন আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম, যখনই সে আমার কাছে মুক্তি চাইবে তখনই তা পাবে। বুঝতেই পারছো, আমাদের বয়সের তফাতটা এতোই বেশি যে তখন এটাই আমার কাছে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়েছিলো।'

'যে প্রতিশ্রুতিটা সে তোমাকে রাখতে বলেনি, তুমি তাহলে সেটাই রাখতে যাচ্ছো?'

এলিজাবেথ ওর লম্বা পাতলা হাত দুখানি সামান্য নাড়তেই আমার মনে হলো, ওর পান্নাটার ঘন দীপ্তির মধ্যে কি যেন অশুভ পূর্বলক্ষণ রয়ে গেছে।

'দ্যাখো, এটুকু আমাকে করতেই হবে। সকলেরই ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করা উচিত। সত্যি বলতে কি, আজ সেজন্যেই আমি এখানে খেতে এসেছিলাম। জানো, এই টেবিলে বসেই পিটার আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলো। এখন আমি

যেখানে বসে রয়েছি, সেদিনও ঠিক সেখানেই বসেছিলাম। তবে একটা বিশ্রী ব্যাপার কি জানো, সেদিন আমি ওকে যতোটা ভালোবাসতাম আজও ঠিক ততোটাই বাসি।'

এক মিনিটের জন্যে একটু থামলো এলিজাবেথ। আমি দেখলাম ও দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে। তারপর বললো, 'এবারে আমার বোধহয় যাওয়া উচিত। পিটার কারুর জন্যে অপেক্ষা করা পছন্দ করে না।'

আমার দিকে কেমন যেন একটা অসহায় দৃষ্টিতে তাকালো ও। মনে হলো ও যেন কিছুতেই কুর্সি থেকে নিজেকে টেনে তুলতে পারছে না। তবু ও মৃদু হাসলো, তারপর এক চকিত ভঙ্গিমায় এক লাফে উঠে দাঁড়ালো।

'আমি তোমার সঙ্গে যাবো ?'

'হোটেলের দরজা অব্দি,' ফের মৃদু হাসলো এলিজাবেথ।

রেস্তোরাঁর ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে লাউঞ্জ পেরিয়ে আমরা সদরের কাছে পৌঁছতেই, দারোয়ান ঘোরানো দরজাটা খুলে ধরলো। আমি এলিজাবেথকে জিগেস করলাম, ও ট্যাক্সি ধরতে চায় কিনা।

'না, আমি বরঞ্চ হাঁটবো। আজকের দিনটা এতো সুন্দর!' আমার হাতে হাত মেলালো এলিজাবেথ, 'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগলো। আসছে কাল আমি বিদেশে চলে যাচ্ছি। তবে আশা করছি পুরো হেমন্তকালটা লণ্ডনেই থাকবো। ফোন কোরো, কেমন ?'

মৃদু হেসে মাথা নেড়ে, মুখ ঘোরালো এলিজাবেথ। দেখলাম ও ডেভিস স্ট্রীট ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। বাইরের বাতাসটা শান্ত—বসন্তের মতো। বাড়িঘরের ছাদের ওপরে ছোটো ছোটো সাদা মেঘ অলস ভঙ্গিতে নীল আকাশের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে। নিজের শরীরটাকে একেবারে টান টান করে হাঁটছে এলিজাবেথ, মাথাটা উঁচু দৃপ্ত ভঙ্গিমায়। চেহারাটা এতো ছিপছিপে আর সুন্দর যে পথচারীরা যেতে যেতে ওকে দেখছে। দেখলাম, একজন পরিচিত লোক টুপি তুলে ওকে অভিবাদন জানাতেই ও সুচারু ভঙ্গিমায় মাথা নুইয়ে তা গ্রহণ করলো। মনে হলো, লোকটা হাজার বছরেও বুঝতে পারবে না, এলিজাবেথের হৃদয়টা ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে।

আমি আবারও বলছি, এলিজাবেথ মেয়েটি ভীষণ সৎ।

রেড

পাতলুনের পকেটে হাত গুঁজে বহু কষ্টে বড়োসড়ো একটা রুপোর ঘড়ি বের করে আনলো ক্যাপটেন। কষ্ট হবার কারণ—পকেট দুটো পাতলুনের পাশের দিকে নয়,

সামনের দিকে এবং ক্যাপটেন মোটাসোটা মানুষ। ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে কের অস্তমুখী সূর্যের দিকে তাকালো সে। জাহাজের চাকার সামনে বসে থাকা ক্যানাকাটা এক ঝলক তার দিকে তাকালো, কিন্তু কোনো কথা বললো না। ক্যাপটেনের দৃষ্টি ক্রমশ এগিয়ে আসা দ্বীপটার দিকে স্থির। জলের ওপরে মাথা তুলে রাখা শৈলশ্রেণীর ধার ঘেঁষে সমুদ্র-ফেনার একটা শুভ্র রেখা। ক্যাপটেন জানে, জাহাজটাকে ভেতরে নিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট বড়োসড়ো একটা মুখ ওখানে আছে এবং সে আশা করছে, আর একটু কাছে এগুলেই সেটা দেখতে পাওয়া যাবে। দিনের আলো এখনও প্রায় ঘণ্টাখানেকের মতো আছে। উপহ্রদটায় গভীর জল, সেখানে ওরা স্বচ্ছন্দে নোঙর ফেলতে পারবে। নারকেল গাছগুলোর ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে এখনই যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে, তার মোড়ল জাহাজের মেটের বন্ধু। রাতের মতো ডাঙায় যেতে পারলে দেদার মজা হবে। ভাবতে ভাবতেই মেট সামনে এগিয়ে এলো, ক্যাপটেন ঘুরে দাঁড়ালো তার দিকে।

'আমরা এক বোতল মাল নিয়ে যাবো আর নাচার জন্যে কয়েকটা ছুকড়িকে জুটিয়ে নেবো।'

'কিন্তু ভেতরে ঢোকার মুখটাই তো দেখতে পাচ্ছি না,' মেট বললো।

মেট একটি সুদর্শন ক্যানাকা, গায়ের রঙ শ্যামলা, চেহারার আদল অনেকটা যেন শেষ যুগের রোমক সম্রাটদের মতো—বলিষ্ঠতার দিক ঘেঁষা, কিন্তু চোখ-মুখ তীক্ষ্ণ ও কাটাকাটা।

'আমি একেবারে স্থির নিশ্চিত, ঠিক এখানেই একটা মুখ আছে।' দূরবীনে চোখ রেখে ক্যাপটেন বললো, 'বুঝতে পারছি না, কেন সেটা চোখে পড়ছে না। একটা ছোঁড়াকে মাস্তলে তুলে দাও, তাকিয়ে দেখুক।'

একটা খালাসিকে ডেকে হুকুম দিলো মেট। ক্যাপটেন দেখলো, ক্যানাকাটা ওপরে উঠে গেলো। তার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করে রইলো ক্যাপটেন। কিন্তু লোকটা নিচের দিকে চিৎকার করে জানালো, ফেনার অভগ্ন রেখাটা ছাড়া সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ক্যাপটেন দেশীয় লোকদের মতোই স্যামোয়া ভাষায় কথা বলে। লোকটাকে সে ইচ্ছেমতো খিস্তিখাস্তা করলো।

'ও কি ওই ওপরেই থাকবে?' মেট জিগেস করলো।

'তাতে কোন্ কম্মটা হবে? হতচ্ছাড়া দরকারী জিনিস কিছুই দেখতে পায় না!' ক্যাপটেন বললো, 'আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, ওপরে গেলে আমি মুখটা ঠিকই দেখতে পেতাম।'

ছিপছিপে মাস্তলটার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো ক্যাপটেন। আজীবন

নারকেল গাছে চড়ে অভ্যস্ত স্থানীয় লোকদের পক্ষে ওখানে ওঠা খুবই সহজ, কিন্তু সে নিজে মোটা আর ভারি।

'নেমে আয়,' ক্যাপটেন চিৎকার করে বললো। 'তুই একটা মরা কুত্তার চাইতে বেশি কাজের নোস। যতোক্ষণ মুখটার হদিশ না পাচ্ছি, ততোক্ষণ ওই ডুবো-পাহাড়গুলোর ধার ঘেঁষে আমাদের যেতে হবে।'

জাহাজটা সত্তর টনি একটা স্কুনার, খনিজ তেলে চলে, অনুকূল বাতাস না থাকলে এর গতি ঘণ্টায় চার-পাঁচ মাইল। চেহারাটা একেবারে লুঝঝুরে মার্কা। বহুকাল আগে একবার সাদা রঙ করা হয়েছিলো, কিন্তু এখন নোংরা মলিন চিত্র-বিচিত্র অবস্থা। সর্বত্র খনিজ তেল আর নারকেলের শুকনো শাঁসের তীব্র গন্ধ। ডুবো-পাহাড়গুলোর একশো ফুটের মধ্যে এসে, খোলা মুখটা না পাওয়া অব্দি চালককে ওই পাহাড়-পাঁচিল বরাবর জাহাজ চালাবার হুকুম দিলো ক্যাপটেন। কিন্তু বেশ কয়েক মাইল যাবার পরে বোঝা গেলো, জায়গাটা তারা ফেলে এসেছে। জাহাজটা আবার আস্তে আস্তে পেছনের দিকে চললো। কিন্তু পাহাড়-পাঁচিল বরাবর ফেনার শুভ্র রেখাটা চলেছে তো চলেইছে। ওদিকে সূর্য অস্তে যেতে বসেছে। নাবিকদের বোকামোর জন্যে গালাগাল করতে করতে ক্যাপটেন অগত্যা পরদিন সকাল অব্দি অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো।

'জাহাজটাকে একটু পেছনে নিয়ে চলো,' ক্যাপটেন বললো, 'এখানে নোঙর করা যাবে না।'

খোলা দরিয়ার দিকে একটুখানি এগিয়ে গেলো ওরা। দেখতে দেখতে চারদিক বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। নোঙর ফেলা হলো। পাল গুটিয়ে নিতেই দারুণভাবে দুলতে শুরু করলো জাহাজটা। অ্যাপিয়ায় সবাই বলাবলি করে, এমনিভাবে দুলতে দুলতেই একদিন ওটা পুরো উলটে যাবে। জাহাজের মালিক আধা জার্মান আধা অ্যামেরিকান, বিরাট একটা দোকানের মালিক। তার মতে, কোনো দামই জাহাজ-টাকে বেচে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

চীনা পাচক এসে জানালো, রাতের খানা তৈরি। লোকটা ভীষণ নোংরা, রুক্ষ চেহারা, পরনে সাদা পাতলুন আর সাদা পাতলা টিউনিক। ক্যাপটেন কেবিনে গিয়ে ছাখে, এঞ্জিনিয়ার ততোক্ষণে টেবিলে এসে বসে পড়েছে। লোকটা লম্বা, রোগা, ঘাড়টা লিকলিকে সরু, পরনে নীল অঙ্গাবরণ আর হাতকাটা জামা—ফলে দেখা যাচ্ছে, ওর রোগা হাত দুটোতে কনুই থেকে কব্জি অব্দি উল্কির ছাপ।

'খোলা দরিয়ায় এভাবে রাত কাটানো—জঘন্য!' ক্যাপটেন বললো।

এঞ্জিনিয়ার কোনো জবাব দিলো না, নিঃশব্দে খেতে লাগলো দুজনে। কেবিনে

একটা তেলের বাতির মিটমিটে আলো। টিনে রাখা এপ্রিকট ফল দিয়ে খানা শেষ করার পর চীনেটা ওদের জন্যে চা নিয়ে এলো। ক্যাপটেন একটা চুরুট ধরিয়ে ওপরের ডেকে চলে এলো। রাতের পটভূমিকায় দ্বীপটা এখন স্রেফ গাঢ়তর অন্ধকারের একটা স্তূপ মাত্র। ঝলমল করছে আকাশের তারাগুলো। শব্দ বলতে শুধুমাত্র সমুদ্র-ঢেউয়ের অবিরাম ভেঙে পড়া। ডেকচেয়ারে গা ডুবিয়ে বসে অলস ভঙ্গিমায় ধূমপান করছিলো ক্যাপটেন। সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও তিন-চারজন নাবিক ওপরের ডেকে এসে বসলো। তাদের মধ্যে একজনের হাতে একটা ব্যাঞ্জো, আর একজনের কাছে কনসার্টিনা। তারা বাজাতে শুরু করলো, আর একজন গান ধরলো। এখানকার লোকসংগীতের সুর অদ্ভুত শোনাচ্ছিলো ওই যন্ত্রগুলোতে। তারপর গাইতে গাইতে দুজন উঠে নাচ জুড়ে দিলো। ক্ষিপ্রভঙ্গিতে হাত-পা ছুঁড়ে শরীর মুচড়ে সে এক আদিম বর্বর প্রাগৈতিহাসিক নাচ। সে নাচ ইন্দ্রিয়গত, এমন কি যৌনতাময়ও বটে —কিন্তু আবেগ-উচ্ছ্বাসবিহীন যৌনতা। সে নাচ একেবারেই পশুদের মতো, সরাসরি। রহস্যবিহীন অথচ অপার্থিব! সংক্ষেপে বলা যায়, অকৃত্রিম। প্রায় শিশুর মতোও বলা চলে। অবশেষে ওরা ক্লান্ত হয়ে ডেকের ওপরেই হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। ক্যাপটেন এবারে তার ভারি শরীর নিয়ে কুর্সি ছেড়ে উঠে, সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামলো। তারপর নিজের কেবিনে ঢুকে পোশাক ছেড়ে, বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়লো। রাতের গরমে একটু হাঁসফাঁস করতে হলো তাকে।

পরদিন সকালে উষা যখন শান্ত সমুদ্রে নেমে এলো, তখন পাহাড়-পাঁচিলের যে ফোকরটা আগের দিন বারবার ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, সেটা খানিকটা পুবদিকে ফুটে উঠতে দেখা গেলো। উপহ্রদের মধ্যে ঢুকে পড়লো স্কুনারটা। জলের বুকে সামান্য তরঙ্গটুকুও নেই। অনেক নিচে প্রবাল পাহাড়ের গা ঘেঁসে ছোটো ছোটো রঙিন মাছের সাঁতার কাটাও স্পষ্ট দেখা যায়। নোঙর ফেলে, প্রাতরাশ সেরে ক্যাপটেন ডেকে এলো। নির্মেঘ আকাশে ঝলমল করছে সূর্যটা, কিন্তু ভোরের বাতাস ভারি স্নিগ্ধ আর ঠাণ্ডা। দিনটা রোববার! চারদিকে কেমন একটা শান্তিময় পরিবেশ, কেমন একটা আশ্চর্য নীরবতা—যেন প্রকৃতি নিজেও ছুটি উপভোগ করছে। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলো ক্যাপটেন। কুর্সিতে বসে, বনময় তীরভূমির দিকে তাকিয়ে নিজেকে অলস আর শিথিল বলে মনে হলো তার। পরক্ষণেই এক চিলতে মৃদু হাসি তার ঠোঁট দুটিতে ফুটে উঠলো। চুরুটের শেষাংশটুকু জলে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে, 'পারে যাবো। নৌকো নামাও।'

মই বেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নেমে এলো ক্যাপটেন। দাঁড় বেয়ে তাকে ছোট্ট একটা

খাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। নারকেল গাছগুলো জলের ধার অব্দি নেমে এসেছে। সারিবদ্ধভাবে নয়—এসেছে খানিকটা জায়গা ছেড়ে ছেড়ে, যেন কোনো নির্দেশিত রীতি অনুসারে। ওরা যেন একদল অবিবাহিতা নারী—বয়স্কা অথচ বাচাল—দাঁড়িয়ে রয়েছে বিগত বয়সের ঠমক দেখানোর ভঙ্গিমায়। গাছগুলোর ভেতর দিয়ে একেবেঁকে চলে যাওয়া রাস্তাটা ধরে অলস গতিতে এগিয়ে খানিকক্ষণের মধ্যেই ক্যাপটেন একটা চওড়া খাঁড়ির কাছে পৌছে গেলো। খাঁড়ির ওপরে একটা সাঁকো। কিন্তু সাঁকোটা তৈরি করা হয়েছে কতকগুলো নারকেল গাছের গুঁড়ি লম্বালম্বিভাবে ফেলে। জোড়ের মুখগুলোতে একটা করে আঁকশিসুদ্ধ ডাল খাঁড়ির বুকে পুঁতে দিয়ে সাঁকোটার ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে। ওটার ওপর দিয়ে যাওয়া মানে একটা মসৃণ, গোল, সংকীর্ণ এবং পিছল পথ ধরে যাওয়া। হাত দিয়ে ধরার মতোও কিছু নেই ওখানে। ক্যাপটেন ইতস্তত করতে লাগলো। কিন্তু খাঁড়ির ওধারে গাছ-গাছালির মাঝখানে একজন শ্বেতাঙ্গের বাড়ি রয়েছে দেখে সে মনস্থির করে ফেললো। তারপর এগুতে লাগলো আস্তে সুস্থে। সাবধানে পা ফেলছিলো ক্যাপটেন। জোড়ের মুখগুলোতে একটু উঁচু নিচু থাকায় সামান্য টলমল করছিলো সে। শেষ গুঁড়িটাতে পৌছে এবং অবশেষে শক্ত মাটিতে পা ফেলে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এই কঠিন পারাপারে সে এতোই একাগ্র ছিলো যে খেয়ালই করেনি, এতোক্ষণ ধরে কেউ তাকে লক্ষ্য করছিলো। তাই তাকে উদ্দেশ করে বলা কথাগুলো শুনে সে অবাক হয়ে গেলো।

'অভ্যেস না থাকলে, এ ধরনের সাঁকো পেরোতে রীতিমতো সাহসের দরকার হয়।'

চোখ তুলে ক্যাপটেন দেখলো, একটা লোক তার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, ওই বাড়িটা থেকেই সে বেরিয়ে এসেছে।

'দেখছিলাম আপনি ইতস্তত করছেন।' ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে লোকটা বললো, 'লক্ষ্য রাখছিলাম, আপনি পড়ে যান কি না।'

ক্যাপটেন এতোক্ষণে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। বললো, 'অতো সস্তা নয়।'

'আগে আগে আমি নিজেও পড়েছি। মনে আছে, একদিন সন্ধ্যাবেলা শিকার করে ফিরছি—বন্দুকটন্দুক নিয়ে পড়ে গেলাম! এখন বন্দুক বইবার জন্যে একটি ছেলেকে রেখেছি।'

লোকটা এখন আর যুবকটি নেই। মুখে ছোট্ট একটু দাড়ি, অধিকাংশই পাকা। মুখখানা কৃশ। গায়ে একটা হাতকাটা ফতুয়া, পরনে পাতলা কাপড়ের পাতলুন। পায়ে মোজা বা জুতো কিছুই নেই।

'আপনিই কি নীলসন ?' জিগেস করলো ক্যাপটেন।

'হ্যাঁ, আমি।'

'আমি আপনার কথা শুনেছি। বুঝতে পেরেছিলাম, এখানেই আশেপাশে কোথাও থাকেন।'

লোকটাকে অনুসরণ করে ছোট্ট বাংলোটাতে গিয়ে ঢুকলো ক্যাপটেন, তারপর গৃহস্বামীর দেখানো কুর্সিটাতে বসে পড়লো ধপ করে। নীলসন হুইস্কি আর গ্লাস আনতে বেরিয়ে গেলো। সেই অবসরে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে ক্যাপটেন বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে উঠলো। এতো বই সে জীবনে কখনও দেখেনি। চারদিকের দেয়ালেই মেঝে থেকে ছাদ অব্দি তাক উঠে গেছে আর সেগুলো সবই বইয়ে ঠাসা। বিশাল একটা পিয়ানো। মস্ত বড়ো একটা টেবিলের ওপরে অজস্র বই আর সাময়িক পত্রিকা এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। ঘরটা ক্যাপটেনকে অস্বস্তিতে ভরিয়ে তুললো। সে শুনে-ছিলো, নীলসন লোকটা অদ্ভুত। বহু বছর ধরে ওই দ্বীপে থাকা সত্ত্বেও কেউই তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। কিন্তু যারা চেনে তারা এ বিষয়ে একমত যে লোকটা অদ্ভুত। ওর দেশ সুইডেনে।

'আপনার এখানে তো দেখছি গাদাগুচ্ছের বই,' নীলসন ঘরে আসার পর ক্যাপটেন বললো।

'ওরা কোনো ক্ষতি করে না,' নীলসন মৃদু হাসলো।

'সবগুলো পড়েছেন ?'

'অধিকাংশই।'

'আমি নিজেও একটু-আধটু পড়াশুনো করি। স্যাটারডে ইভনিং পোস্টটা নিয়মিত আনাই।'

নীলসন অতিথিকে কড়া করে এক গ্লাস হুইস্কি আর একটা চুরুট দিলো। ক্যাপটেন নিজে থেকে যেচে তাকে সামান্য কিছু খবরাখবর দিলো।

'আমি গতকাল রাত্রে এখানে এসেছি। কিন্তু ভেতরে আসার খোলা-মুখটা খুঁজে না পাওয়ায় বাইরেই নোঙর ফেলতে হয়েছিলো। আগে আমি কোনোদিন জাহাজ নিয়ে এদিকে আসিনি। কিন্তু আমার লোকজন কিছু মালপত্র এখানে আনতে চাইছিলো, তাই…আচ্ছা, গ্রে বলে এখানে কাউকে চেনেন ?'

'হ্যাঁ, তার একটা দোকান আছে। এই তো, একটু এগিয়েই।'

'তার ফরমাশ মতো কিছু টিনে রাখা খাবার নিয়ে আসা হয়েছে। আর তার কাছে বিক্কিরি করার মতো আছে নারকেলের কিছু শুকনো শাঁস। অ্যাপিয়ায় শুয়ে বসে সময় কাটানোর চাইতে আমার লোকেরা এখানে চলে আসাই ভালো বলে

সাব্যস্ত করলো। আমি বেশির ভাগ সময়ে অ্যাপিয়া আর প্যাগো-প্যাগোর মধ্যেই জাহাজ নিয়ে যাতায়াত করি। কিন্তু অ্যাপিয়ায় এখন ভীষণ বসন্ত হচ্ছে, কাজকর্ম কিছু হচ্ছে না।'

হুইস্কিতে একটা চুমুক দিয়ে ক্যাপটেন চুরুট ধরালো। এমনিতে সে কথাবার্তা বলতে তেমন ভালোবাসে না। কিন্তু নীলসনের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিলো যা তাকে বিচলিত করে তুলেছিলো এবং বিচলিত হয়েছে বলেই সে এতো কথা বলছিলো। বড়ো বড়ো কালো চোখ মেলে তার দিকে তাকচ্ছিলো সুইডিশটা, চোখের দৃষ্টিতে যেন অস্পষ্ট কৌতুকের আভাস।

'আপনার বাড়িটা কিন্তু দিব্যি সুন্দর, ছিমছাম।'

'আমার যথাসাধ্য করেছি।'

'গাছগুলো থেকে আপনার নিশ্চয়ই ভালো আয় হয়? সুন্দর লাগছে দেখতে। আজকাল নারকেলের শুকনো শাঁসের যা দাম! এককালে উপোলোতে আমার নিজেরও এক টুকরো বাগান ছিলো। কিন্তু সেটা বিক্রি করে দিতে হয়েছে।'

ফের একবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে নিলো ক্যাপটেন। বইগুলো তাকে যেন এক বোধাতীত এবং প্রতিকূল অনুভূতিতে ভরিয়ে তুলছিলো।

'এখানে আপনার নিশ্চয়ই খানিকটা একা একা লাগে?'

'অভ্যেস হয়ে গেছে। পঁচিশ বছর ধরে এখানে রয়েছি তো!'

এবারে ক্যাপটেন বলার মতো আর কিছু ভেবে পেলো না, তাই নীরবে শুধু ধূমপান করতে লাগলো। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিলো, নীলসনের দিক থেকেও ওই নীরবতা ভাঙার কোনো ইচ্ছে নেই। ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিতে অতিথিকে দেখছিলো সে। ক্যাপটেন লোকটা দীর্ঘকায়, উচ্চতা ছ ফুটের ওপরে, গড়ন খুবই শক্তপোক্ত। মুখটা লাল, ব্রণ আর আঁচিলের দাগে কণ্টকিত, দু গালে সূক্ষ্ম রক্তবাহী শিরার রক্তিম আঁকিঝুঁকি। অতিরিক্ত স্থূলতার জন্যে চোখ-মুখ যেন ভেতরের দিকে বসে গেছে। চোখ দুটোতে রক্তের ছটা। ঘাড়টা চর্বির থাকে ডুবে গেছে। মাথার পেছন দিকে লম্বা কোঁকড়া প্রায়-সাদা চুলের ঝালরটি বাদে লোকটা সম্পূর্ণ টেকো। বিশাল চকচকে কপালের জন্যে তাকে বুদ্ধিমান বলে মনে হতে পারতো—যেটা একেবারেই ভুল। কিন্তু সেজন্যে তাকে অদ্ভুত এক জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খ বলেই মনে হয়। ক্যাপটেনের গায়ে নীল ফ্লানেলের জামা—গলার কাছটা খোলা বলে দেখা যায়, তার মোটাসোটা বুকটাতে লালচে চুলের জটলা। পরনে অতি পুরনো নীল সার্জের পাতলুন। একটা জবুথবুর মতো কুর্সিতে বসে রয়েছে লোকটা, বিশাল ভুঁড়িটা ঠেলে উঠেছে সামনের দিকে, মোটা মোটা পা দুটো ফাঁক করে রাখা। ওর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে

নমনীয়তা বলে জিনিসটা উধাও হয়ে গেছে। নীলসন অন্যমনস্কভাবে ভাবলো, লোকটা যুবক বয়সে কেমন ছিলো কে জানে। বিশাল বপুর ওই মানুষটা যে কোনো দিন একটা বালক ছিলো, ছোটাছুটি করে বেড়াতো—তা এখন কল্পনা করাও প্রায় অসম্ভব।

ক্যাপটেনের হুইস্কিটা শেষ হয়ে গিয়েছিলো। নীলসন বোতলটা তার দিকে ঠেলে দিলো, 'নিয়ে নিন।'

ক্যাপটেন সামনের দিকে ঝুঁকে বিশাল একটা হাত বাড়িয়ে বোতলটা চেপে ধরলো, 'তা আপনি এ অঞ্চলে এলেন কি করে?'

'আমি স্বাস্থ্যের খাতিরে এই দ্বীপগুলোতে এসেছিলাম। আমার ফুসফুস দুটোর অবস্থা এতোই খারাপ হয়েছিলো যে ডাক্তাররা বলে দিয়েছিলেন, আমি আর একটা বছরও বাঁচবো না। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, তাঁরা ভুল করেছিলেন।'

'আমি জানতে চাইছিলাম, আপনি ঠিক এখানটাতে স্থিতু হলেন কি করে?'

'আমি একজন ভাবপ্রবণ মানুষ।'

'ও!'

নীলসন বুঝতে পেরেছিলো, তার কথাটার প্রকৃত অর্থ ক্যাপটেন আদৌ বুঝতে পারেনি। কালো চোখ দুটোতে বিদ্রূপের ঝিলিক তুলে মানুষটার দিকে তাকালো সে। হয়তো ক্যাপটেন অমন স্থূল আর মাথামোটা বলেই, আরও কথা বলার খেয়াল তাকে পেয়ে বসলো।

'সাঁকোটা পার হবার সময় আপনি নিজেকে সামলাতে বড্ড বেশি ব্যস্ত ছিলেন বলে হয়তো লক্ষ্য করতে পারেননি—কিন্তু এ জায়গাটাকে মোটামুটি সুন্দর বলেই মনে করা হয়।'

'ভারি সুন্দর ছোট্টখাট্ট বাড়ি আপনার!'

'আমি প্রথম যখন এখানে আসি তখন এটা ছিলো না, ছিলো একটা দেশী কুটির। লাল ফুলে ভরা বিশাল একটা গাছের ছায়ায় মৌচাকের চাল আর থাম দিয়ে তৈরি। ক্রোটনের ঝোপগুলো তাদের হলদে, লাল আর সোনালি পাতার বাহারে নানা রঙের চিত্রবিচিত্র একটা বেষ্টনী গড়ে রেখেছিলো চারদিকে। আর নারকেল গাছ ছিলো সর্বত্র। ওরা মেয়েদের মতো খেয়ালি আর অহঙ্কারী—জলের কাছে দাঁড়িয়ে ওরা সারাটা দিন নিজেদের ছায়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সময় কাটায়। তখন আমি নবীন যুবক—ওঃ, সে আজ সিকি শতাব্দী আগেকার কথা—অন্ধকারে হারিয়ে যাবার আগে, আমার জন্যে বরাদ্দ সংক্ষিপ্ত সময়টুকুতে, আমি তখন পৃথিবীর সবটুকু সৌন্দর্য উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। মনে হয়েছিলো এতো সুন্দর জায়গা

আমি আর কোনোদিনও দেখিনি। প্রথম দেখাতেই বুকটা যেন মুচড়ে উঠেছিলো,
ভয় হচ্ছিলো বুঝি কেঁদে ফেলবো। তখন আমার বয়েস পঁচিশের বেশি নয়। মুখে
যথাসাধ্য সাহস আনলেও, আমি তখন মরতে চাইনি। যে কোনো কারণেই হোক
মনে হয়েছিলো, এখানকার এই সৌন্দর্য আমার পক্ষে নিজের ভাগ্যকে মেনে নেওয়া
সহজতর করে তুলেছে। এখানে এসে আমি অনুভব করলাম আমার সমস্ত অতীতটা
যেন আমার জীবন থেকে খসে পড়ে গেছে। স্টকহোম, তার বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর
বন—সে সবই যেন অন্য কারুর জীবনের ঘটনা। মনে হলো অবশেষে আমি যেন
সেই পরম সত্যকে অর্জন করেছি, যার প্রসঙ্গে দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিতরা—আমি
নিজেও তাঁদের একজন—এতো আলোচনা করেছেন। 'একটা বছর', আমি নিজেকে
চিৎকার করে বলেছিলাম, 'আমার হাতে আর একটা বছর। সেটা আমি এখানেই
কাটাবো। তারপর মরলে কোনো দুঃখ নেই'। পঁচিশ বছর বয়সে আমরা বড়ো
বোকা, বড্ড ভাবপ্রবণ আর ভীষণ নাটুকে থাকি। কিন্তু তা না থাকলে পঞ্চাশে এসে
আমরা হয়তো একটু কম প্রাজ্ঞ হতাম।…আরে, আপনি খান মশাই! আমার
বাজে বকবকানি আপনার কাজে যেন বাধা না হয়।'

নীলসন নিজের রোগা-পাতলা হাতটা তুলিয়ে বোতলের দিকে দেখালো।
ক্যাপটেন গ্লাসের অবশিষ্ট অংশটুকু শেষ করে হাত বাড়ালো বোতলটার দিকে,
'আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না।'

'আমি কমই খাই,' নীলসন মৃদু হাসলো। 'আমি যেভাবে নিজেকে মাতাল করে
তুলি, আমার ধারণা সেটা আরও সূক্ষ্মপথ। তবে হয়তো সে ধারণাটা মিথ্যে। কিন্তু
আর যা-ই হোক না কেন, তার আমেজটা অনেক বেশি সময় থাকে আর ফলটাও
তেমন ক্ষতিকর নয়।'

'স্টেটসে আজকাল নাকি খুব কোকেন চলছে।'

নীলসন খুকখুক করে হেসে বললো, 'কিন্তু সাদা মানুষের সঙ্গে আমার বড়ো
একটা দেখাসাক্ষাৎ হয় না আর এক বার এক ফোঁটা হুইস্কি খেলেও আমার কোনো
ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।'

সামান্য একটু হুইস্কি ঢেলে, তাতে সোডা মিশিয়ে নীলসন ছোট্ট একটা চুমুক
দিলো।

'কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, কেন জায়গাটার এমন অপার্থিব সৌন্দর্য।
মাঝ দরিয়ায় যাযাবর পাখি যেমন ক্লান্ত ডানা মুড়ে কোনো জাহাজে বসে সামান্য
সময়ের বিশ্রাম নেয়, তেমনি ভালোবাসা মুহূর্তের জন্যে এখানে এসে থেমেছিলো।
আমার দেশের প্রান্তরে প্রান্তরে মে মাসে হথর্ণ ফুলের সৌরভের মতো এখানে বাতাসে

বাতাসে ভেসে বেড়ায় এক অপরূপ আবেগের নির্যাস। আমার মনে হয়, মানুষ যেখানে ভালোবাসে বা দুঃখ পায় সেখানে সর্বদাই যেন কিসের একটা মৃদু নির্যাস জড়িয়ে থাকে যা কোনোদিনই পুরোপুরি মরে না। জায়গাগুলো তখন যেন একটা আত্মিক গুরুত্ব অর্জন করে ফেলে—যারা সেখানে যায় তারা প্রত্যেকেই রহস্যজনক-ভাবে তাতে প্রভাবিত হয়ে ওঠে। কথাটা আরও পরিষ্কার করে বোঝাতে পারলে ভালো হতো।' নীলসন মৃদু হাসলো, 'কিন্তু তাহলেও আপনি তা বুঝতেন কি না জানি না।'

একটু থামলো নীলসন।

'আসলে প্রেমের নিবিড় পুলক কিছুদিন ধরে এ জায়গাটাকে সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলেছিলো বলেই হয়তো জায়গাটা আমার সুন্দর বলে মনে হয়েছিলো।' নীলসন কাঁধ ঝাঁকালো, 'তবে এমনও হতে পারে, নতুন প্রেমের সঙ্গে উপযুক্ত পরিবেশের সুষম যোগাযোগে হয়তো আমার নন্দনবোধ তখন তৃপ্তি পেয়েছিলো।'

ক্যাপটেনের চাইতে কম রসবোধসম্পন্ন মানুষও নীলসনের কথায় বিহ্বল হয়ে উঠলে, তাকে ক্ষমা করা যেতো। কারণ নিজের কথায় নীলসন নিজেই যেন অস্পষ্ট ভাবে হাসছিলো। মনের আবেগে সে যা বলছে, নিজের বুদ্ধিবৃত্তির কাছেই তা যেন হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে। নীলসন নিজেই বলেছে সে ভাবপ্রবণ। এই ভাব-প্রবণতার সঙ্গে যখন সংশয়বোধ এসে মেশে তখনই হয় বিপদ।

এক মুহূর্ত নীরব হয়ে ক্যাপটেনের দিকে তাকালো নীলসন। তার চোখের দৃষ্টিতে এক চকিত বিহ্বলতা।

'জানেন, আমার মনে হচ্ছে আমি আপনাকে আগে কোথাও না কোথাও দেখেছি।'

'কিন্তু আপনাকে আমার মনে পড়ছে, তেমন কথা বলতে পারছি না।' ক্যাপ-টেন জবাব দিলো।

'আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, আপনার মুখটা আমার চেনা। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই চিন্তাটা আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলছে। কিন্তু কবে বা কোথায় দেখেছি, তা মনে করতে পারছি না।'

ক্যাপটেন তার ভারি কাঁধ দুটো প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকালো।

'তিরিশ বছর আগে এই দ্বীপগুলোতে আমি প্রথম এসেছিলাম। এতো বছরে কতো লোকের সঙ্গে দেখা-পরিচয় হয়েছে—তা কারুর পক্ষেই মনে রাখা সম্ভব নয়।'

নীলসন ঘাড় নাড়লো, 'জানেন তো, এক একটা জায়গায় আগে কোনোদিন না গেলেও জায়গাটাকে অদ্ভুত চেনা বলে মনে হয়। মনে-হয় আপনাকে চেনার

ব্যাপারটাও তেমনি।' ঈষৎ খেয়ালি হাসি ছড়ালো নীলসন, 'কে জানে, হয়তো অতীতে অন্য কোনো জন্মে আপনাকে চিনতাম। হয়তো আপনি ছিলেন প্রাচীন রোমে কোনো রণতরীর অধিনায়ক আর আমি ছিলাম ক্রীতদাস—দাঁড় বাইতাম; তা আপনি তিরিশ বছর এখানে আছেন?'

'তিরিশ বছরের প্রতিটা অংশ।'

'আচ্ছা, রেড নামে কাউকে আপনি চিনতেন?'

'রেড?'

'তার একমাত্র ওই নামটাই আমি জানি। ব্যক্তিগতভাবে কোনোদিনই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। এমন কি চোখেও দেখিনি। অথচ মনে হয় অনেকের চাইতেই—যেমন ধরুন আমরা ভাইরা, যাদের সঙ্গে আমি অনেকগুলো বছর প্রতি-দিনকার জীবন কাটিয়েছি—তাদের চাইতেও ওই লোকটাকে আমি অনেক স্পষ্ট করে দেখতে পাই। পাওলো মালাতেস্তা বা রোমিওর মতো বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে আমার কল্পনায় বাস করে। তবে আপনি বোধকরি দান্তে বা শেক্সপিয়র পড়েননি, তাই নয় কি?'

'পড়েছি, তা বলতে পারি না।'

কুর্সিতে হেলান দিয়ে বসে চুরুট টানতে টানতে স্থির বাতাসে ভাসতে থাকা শূন্য-গর্ভ ধোঁয়ার বৃত্তগুলোর দিকে শূন্যদৃষ্টিতেই তাকিয়ে থাকে নীলসন। মৃদু হাসি খেলা করে তার ঠোঁট দুটিতে, কিন্তু চোখ দুটো গম্ভীর। তারপর ক্যাপটেনের দিকে তাকায় সে। লোকটার নিদারুণ স্থূলতার মধ্যে অস্বাভাবিক অরুচিকর কিছু একটা রয়ে গেছে। ওর অস্তিত্বে একজন প্রচণ্ড স্থূলদেহীর অতিরিক্ত আত্মপ্রসাদ। এটা একেবারে বাড়াবাড়ি। জিনিসটা নীলসনের স্নায়ুগুলোকে উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু যে মানুষটা তার স্মৃতিতে রয়েছে আর যে মানুষটা তার সামনে বসে আছে—তাদের দুইয়ের প্রভেদটা বড়ো মনোরম।

'মনে হয় রেডের মতো সুদর্শন পুরুষ বড়ো একটা হয় না। ওই সময়ে তাকে চিনতো এমন বেশ কয়েকজন শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে আমি কথা বলে দেখেছি। তারা প্রত্যেকেই একমত যে রেডকে প্রথম বার দেখলেই তার সৌন্দর্যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতো। আগুনের শিখার মতো লাল চুল ছিলো বলে সবাই তাকে রেড বলে ডাকতো। চুলগুলো ছিলো অকৃত্রিম ঢেউ খেলানো, ওগুলো সে লম্বা করেই রাখতো। ওর চুলে নিশ্চয়ই সেই আশ্চর্য রঙ ছিলো, যা নিয়ে র‍্যাফায়েলের পূর্ববর্তী যুগের চিত্র-কররা এককালে অতো মাতামাতি করেছেন। তবে চুলের জন্যে রেডের মনে কোনো গর্ব ছিলো বলে মনে হয় না, কারণ গর্ব করার পক্ষে সে ছিলো বড্ড অকপট। তবে

কিনা গর্ব থাকলেও সেজন্যে তাকে দোষ দেওয়া যেতো না। রেড ছিলো দীর্ঘকায়—উচ্চতা ছ ফুট দুই বা এক ইঞ্চি। এখানে যে কুটিরটা ছিলো তার মাঝখানকার খুঁটিটা—যেটার ওপরে চালের ভর থাকতো—সেটার গায়ে সে ছুরি দিয়ে নিজের উচ্চতা দাগিয়ে রেখেছিলো। চেহারার গড়ন ছিলো গ্রীক দেবতার মতো—চওড়া কাঁধ, সরু কোমর। প্রাক্সিতেলিসের গড়া অ্যাপোলোর মতো তার অঙ্গে ছিলো সুকোমল ডৌল আর ছিলো সেই নরম মেয়েলি মাধুর্য যা রহস্যময়, যা মনকে ব্যাকুল করে তোলে। গায়ের চামড়া ছিলো উজ্জ্বল, দুধের মতো সাদা আর সাটিনের মতো মসৃণ—ঠিক যেন মেয়েদের গায়ের চামড়া।'

'বাচ্চা বয়সে আমার চামড়াটাও ফর্সা ছিলো,' ক্যাপটেনের রক্তিম চোখ দুটোতে খুশির ঝিলিক ফুটে উঠলো।

নীলসন ক্যাপটেনের কথায় ভ্রূক্ষেপ করলো না। এখন সে গল্প বলছে। বাধা তাকে অধৈর্য করছে।

'রেডের মুখখানা ছিলো তার দেহের মতোই সুন্দর। আয়ত চোখ দুটো নীল, ঘন নীল—এতো ঘন যে কেউ কেউ বলতো কালো। ভুরু দুটো কালো, চোখের দীর্ঘ পল্লবগুলোও কালো—অধিকাংশ লালচুলো লোকের ক্ষেত্রে যা হয় না। চোখ নাক মুখ সবই টানাটানা, ঠোঁট দুটি টুকটুকে—ঠিক যেন একটা রক্তাক্ত ক্ষত। তার বয়েস তখন কুড়ি।'

এই অব্দি বলে নীলসন খানিকটা নাটকীয়ভাবে থামলো। তারপর এক চুমুক হুইস্কি পান করে ফের বলতে লাগলো, 'রেড ছিলো অতুলনীয়। বুনো গাছে ফুটে থাকা আশ্চর্য ফুলের মতো তারও অস্তিত্বের পেছনে অন্য কোনো কারণ ছিলো না। সে প্রকৃতির এক মধুর দুর্ঘটনা।

'আজ সকালে আপনি যে খাঁড়িটায় এসে নেমেছেন, একদিন সেও সেখানে এসে নেমেছিলো। সে ছিলো একজন মার্কিন নাবিক, অ্যাপিয়ায় একটা যুদ্ধজাহাজ থেকে সে পালিয়েছিলো। একজন সহৃদয় স্থানীয় অধিবাসীর কাছ থেকে কোনো-ক্রমে ভাড়াটা যোগাড় করে সে অ্যাপিয়া থেকে সাফোতোগামী একটা জাহাজে চেপে বসে। এখানে একটা ডিঙিতে চাপিয়ে তাকে তীরে নামিয়ে দেওয়া হয়। কেন সে সৈন্যবাহিনী ছেড়ে পালিয়েছিলো, জানি না। হয়তো যুদ্ধজাহাজে বাধানিষেধের জীবন তাকে বিরক্ত করে তুলেছিলো, হয়তো সে কোনো মুশকিলে পড়েছিলো কিংবা হয়তো দক্ষিণ-সমুদ্র আর এই রোমান্টিক দ্বীপগুলো তার মনে ঝড় তুলেছিলো। মাঝে মাঝেই এই দ্বীপগুলো এক একটা মানুষকে আশ্চর্যভাবে পেয়ে বসে, তারপর মাকড়সার জালে পড়া পতঙ্গের মতো এক সময় ধরা পড়ে যায়

মানুষটা। হয়তো তার মনে কোথাও কোনো কোমলতা ছিলো এবং মিষ্টি বাতাসে ভরা এই সমস্ত সবুজ পাহাড় আর এই সুনীল সাগর হয়তো তার ভেতর থেকে উত্তুরে বলিষ্ঠতা হরণ করে নিয়েছিলো—যেমন করে ডেলাইলা জয় করেছিলো নাজারিথের নিয়মনিষ্ঠ মানুষটাকে। যাই হোক, রেড নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলো এবং সে মনে করেছিলো, স্যামোয়া থেকে তার জাহাজটা ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে এই নির্জন আশ্রয়টাতে নিরাপদেই থাকবে।

'খাঁড়ির কাছে একটা দেশী কুটির ছিলো। রেড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে সে কোন দিকে পা বাড়াবে, এমন সময় অল্পবয়সী একটি মেয়ে কুটির থেকে বেরিয়ে এসে তাকে ভেতরে ডাকলো। দেশী ভাষার দুটো শব্দও রেড তখন জানে কিনা সন্দেহ। মেয়েটির আবার ইংরেজী ভাষায় তেমনি দৌড়। কিন্তু মেয়েটির মৃদু হাসি আর মধুর ভঙ্গিমার অর্থ সে ভালোভাবেই বুঝতে পারলো। মেয়েটিকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকে, রেড একটা মাদুরে গিয়ে বসলো। মেয়েটি তাকে কয়েক টুকরো আনারস খেতে দিলো। রেডের সম্পর্কে যা শোনা যায়, আমি শুধু সেটুকুই বলতে পারি। কিন্তু তার সঙ্গে মেয়েটির প্রথম দেখা হবার তিন বছর বাদে আমি ওই মেয়েটাকেই দেখেছিলাম—ওর বয়েস তখন উনিশ হয়েছে কিনা সন্দেহ। তখন ও যে কি অপরূপ সুন্দরী ছিলো তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। জবা ফুলের ঢলোঢলো সৌন্দর্য আর জমকালো রঙ—দুই-ই ছিলো ওর। মাথায় একটু লম্বাই বলা চলে, ছিপছিপে, ওদের জাতের মতোই কোমল চেহারা। আয়ত চোখ দুটি যেন তালগাছের তলায় শান্ত দুটি দীঘি। কালো কোঁকড়া চুলগুলো ছড়িয়ে পড়তো পিঠময়, তাতে সুগন্ধি ফুলের মালা জড়াতো ও। হাত দুটি সুন্দর—এতো ছোটো ছোটো আর এতো নিখুঁত গড়ন যে দেখে মনের তন্ত্রীতে যেন টান পড়তো। সে সব দিনগুলোতে ও খুব সহজেই হাসতো। ওর সেই মধুর হাসি শুনলে কাঁপুনি জাগতো আপনার হাঁটু দুটোয়। গায়ের রঙ ছিলো গ্রীষ্ম দিনের পাকা শস্য খেতের মতো ওঃ ঈশ্বর, কি করে আমি তার বর্ণনা দেবো? বাস্তবে অমন সুন্দরী মেয়ে হয় না।

'এই দুটি তরুণ-তরুণী—মেয়েটির বয়েস তখন ষোলো আর রেডের বয়েস কুড়ি—প্রথম দর্শনেই পরস্পরকে ভালোবেসে ফেললো। সত্যিকারের ভালোবাসা। সহানুভূতি, সমরুচি কিংবা বুদ্ধিগত সংযোগ থেকে যে ভালোবাসা গড়ে ওঠে—এ তা নয়। এ সত্যিকারের বিশুদ্ধ ও সরল প্রেম। আদম তার বাগানে ঘুম ভেঙে উঠে ঈভকে শিশির ভেজা চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে যে প্রেম অনুভব করেছিলো, এ সেই প্রেম। এই প্রেমই পৃথিবীকে অলৌকিক করে তোলে। এই প্রেমই অর্থবহ করে তোলে জীবনকে। আপনি নিশ্চয়ই সেই বিজ্ঞ বিশ্বনিন্দুক ফরাসী

ভিউকের মন্তব্যটা শোনেননি—তিনি বলেছিলেন, প্রেমিক যুগলের মধ্যে একজন চিরদিন ভালোবাসে আর একজন নিজেকে ভালোবাসতে দেয়। কথাটা তিক্ত সত্য হলেও আমরা বেশির ভাগ মানুষই তা মেনে নিয়েছি। তবে ক্বচিৎ কদাচিৎ এমন দুটি যুগলও হয়, যারা পরস্পরকে ভালোবাসা দেয়—ভালোবাসা পায়। কল্পনা করে নেওয়া যায় তখন আকাশে সূর্যটা স্থির হয়ে থাকে—যেমন ছিলো ইজরায়েল-ঈশ্বরের কাছে যোশুয়ার প্রার্থনার সময়।

'আজ এতো বছর বাদেও সেই দুটি সরল সুন্দর তরুণ প্রাণ আর তাদের প্রেমের কথা চিন্তা করলে আমি ভীষণ কষ্ট পাই। আমার হৃদয়টা তখন যেন ছিঁড়ে-খুঁড়ে যায়, যেমনটি হয় কোনো কোনো রাতে যখন দেখতে পাই নির্মেঘ আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়া পূর্ণ চাঁদের মায়া হ্রদের বুকে ঝিলমিল করছে। নিখুঁত সৌন্দর্যের চেতনা সর্বদাই এমনি করে বেদনা বয়ে আনে।

'ওরা দুজনেই তখন ছেলেমানুষ। মেয়েটি ভারি ভালো, মিষ্টি স্বভাব, করুণাময়ী। রেডের সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে সেও ছিলো সরল আর অকপট। ভাবতে ইচ্ছে করে, তার আত্মা ছিলো তার দেহের মতোই সুন্দর। কিন্তু আমার আশঙ্কা···ধরণী যখন তরুণী ছিলো, যখন পুরাণে কল্পিত দাড়িওলা সেণ্টরের পেছন পেছন ছোটো ছোটো হরিণ শাবককে নিঃসীম প্রান্তর ধরে ছুটতে দেখা যেতো, তখন অরণ্যবাসী আদিম মানুষ—যারা বেণুবাঁশ কেটে বাঁশি বানাতো, পাহাড়ি নদীতে স্নান করতো—তাদের মতো রেডেরও আত্মা বলতে কিছু ছিলো না। আত্মা এক যন্ত্রণাদায়ক সম্পত্তি বিশেষ। আত্মার অধিকারী হওয়া মাত্রই মানুষকে স্বর্গের নন্দনকানন থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছিলো।

'যাই হোক, রেড যখন এ দ্বীপে আসে তার কিছুদিন আগেই দক্ষিণ-সমুদ্র অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গদের বয়ে আনা এক মহামারীতে এক-তৃতীয়াংশ দ্বীপবাসীই মারা গিয়েছিলো। মনে হয় মেয়েটিও ওই মহামারীতে নিজের সমস্ত নিকট আত্মীয়কে হারিয়ে, তখন ওই কুটিরে ওর দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিগুষ্ঠির সঙ্গে বাস করতো। সংসারে মানুষ বলতে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া কোঁচকানো চামড়ার দুই থুত্থুরে বুড়ি, দুটি অল্পবয়সী মেয়ে-মানুষ, একজন পুরুষ আর একটা বাচ্চা ছেলে। কয়েকটা দিন রেড সেখানেই রইলো। তারপর হয়তো তার মনে হলো সে সৈকতের বড্ড কাছাকাছি রয়েছে, এখানে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে তার হঠাৎ করে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা এবং তারা হয়তো কর্তৃ-পক্ষের কাছে তার গোপন আশ্রয়ের সন্ধানটা জানিয়ে দেবে। কিংবা প্রেমিক যুগল হয়তো অন্যদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারছিলো না, নিজেদের সান্নিধ্য-সুখ থেকে তারা হয়তো মুহূর্তের জন্যেও বঞ্চিত হতে চায়নি। তাই একদিন সকালে, মেয়েটির

সামান্য যা কিছু জিনিসপত্র ছিলো তা নিয়ে, ওরা দুজনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। নারকেল গাছের তলা দিয়ে ঘাসে-ছাওয়া পথ ধরে ওই যে খাঁড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, ওই অব্দি এগিয়ে এসেছিলো ওরা। আপনি যে সাঁকোটা পেরিয়ে এলেন, ওদেরও সেটা পেরোতে হয়েছিলো সেদিন। রেড ভয় পাচ্ছিলো দেখে মেয়েটি হেসে উঠেছিলো খিলখিল করে। প্রথম গুঁড়িটার শেষপ্রান্ত অব্দি ও রেডের হাত ধরে রেখেছিলো, তারপর রেডের আর সাহসে কুলোলো না, সে পেছনে ফিরে গেলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝুঁকিটা সে নিলো, তবে তার আগে নিজের পোশাক-আশাক ছেড়ে নিলো। মেয়েটি মাথায় করে বয়ে আনলো তার পোশাক। এদিকে তখন একটা শূন্য কুটির ছিলো, ওরা সেখানেই ঘর বাঁধলো। জানি না কুটিরটার ওপরে মেয়েটির কোনো স্বত্ব ছিলো কি না (এই দ্বীপগুলোতে জমি-বাড়ির ভোগদখলের শর্তগুলো ভীষণ জটিল), বা কুটিরের মালিক মহামারীতে মারা গিয়েছিলো কি না। তবে যাই হোক না কেন, কেউ ওদের কোনো প্রশ্ন করেনি এবং ওরাও ওই কুটিরটার দখল নিয়ে নেয়। আসবাব বলতে ওদের ছিলো কয়েকখানা মাদুর—যাতে ওরা ঘুমোতো, এক টুকরো ভাঙা আরশি আর দু-একটা বাসন। এই মনোরম দেশে সংসার শুরু করার পক্ষে ওটুকুই যথেষ্ট।

'সবাই বলে, সুখী মানুষের কোনো অতীত ইতিহাস থাকে না। সুখী প্রেমের সত্যিই তা নেই। সারাদিন ওরা কিচ্ছুটি করতো না, তবু দিনগুলোকে ওদের বড্ড ছোটো বলে মনে হতো। মেয়েটির একটা এদেশী নাম ছিলো। কিন্তু রেড ওকে 'স্যালি' বলে ডাকতো। এদেশের সহজ ভাষাটা সে খুব দ্রুত শিখে নিয়েছিলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে মাদুরে শুয়ে থাকতো আর মেয়েটি খুশিয়াল স্বরে কলকল করে কথা বলতো তার সঙ্গে। রেড ছিলো একটু চুপচাপ প্রকৃতির মানুষ। হয়তো তার মনটাও ছিলো আলসে। দেশী তামাক আর পান্দানাস পাতা দিয়ে স্যালি তাকে সিগারেট বানিয়ে দিতো, সে অনবরত তা-ই ফুঁকতো। স্যালি যখন দক্ষ আঙুলে মাদুর বুনতো, সে লক্ষ্য করতো স্যালিকে। মাঝে-মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীরা এসে ওদের পুরনো দিনের অনেক দীর্ঘ কাহিনী শোনাতো—আদিবাসীদের যুদ্ধে দ্বীপ যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতো, তখনকার কাহিনী। কখনও কখনও রেড খাঁড়িতে মাছ ধরতে যেতো, ফিরে আসতো ঝুড়ি ভর্তি রঙিন মাছ নিয়ে। আবার কখনও কখনও রাত্রিবেলা লণ্ঠন নিয়ে গলদা চিংড়ি ধরতে বেরুতো। কুটিরের চারদিকে প্রচুর কলাগাছ ছিলো, স্যালি কলা ঝলসে রাখতো কালে-ভদ্রে খাবে বলে। নারকেল দিয়ে সুস্বাদু মণ্ড তৈরি করতে পারতো ও। খাঁড়ির ধারের ব্রেডফ্রুট গাছটাও ওদের ফল যোগাতো। বিশেষ ভোজের দিনে ওরা ছোট্ট একটা শুয়োর মেরে, গরম পাথরের

ওপরে সেটাকে রান্না করে নিতো। খাঁড়ির জলে একসঙ্গে স্নান করতো দুজনে আর সন্ধ্যাবেলা সাজানো ডিঙিতে চেপে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতো হ্রদের বুকে। সমুদ্রের জল ঘন নীল, সূর্যাস্তের সময় হোমারের গ্রীস-সমুদ্রের মতো তাতে মদিরার রঙ ধরতো। কিন্তু হ্রদের জলে রঙের অন্তহীন বৈচিত্র্য—টলটলে নীল, হালকা সবুজ বা পান্নার মতো রঙ। অস্তগামী সূর্য সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে হ্রদের জলকে যেন গলানো সোনা করে তুলতো। তাছাড়া ছিলো হরেক রকম প্রবালের রঙ—বাদামি, সাদা, গোলাপি, বেগুনি। তাদের আকারগুলোও বা কি অপূর্ব! যেন এক মায়াকানন। ছুটপাট করে সরে সরে যাওয়া মাছগুলো ঠিক যেন প্রজাপতি। সব মিলিয়ে বাস্তবতার আশ্চর্য অভাব। মাঝে মাঝে জলের মধ্যে খানিকটা জায়গা প্রবাল দিয়ে ঘেরা—সেখানে জলের তলায় সাদা বালি বেছানো, জলটা এতো স্বচ্ছ যে চোখ যেন ঠিকরে ওঠে। ওখানে স্নান করতে ভারি মজা। স্নান করে শরীর জুড়িয়ে খুশি মনে ওরা হাতে হাত ধরে সান্ধ্য গোধূলিতে ঘাসের পথ পেরিয়ে ঘরে ফিরে আসতো—নারকেল গাছগুলো তখন ভরে থাকতো ময়না পাখির কলকাকলিতে। তারপর আসতো রাত্রি। বিশাল আকাশে তখন ঝিকমিকে সোনা। মনে হতো ইউরোপের আকাশের চাইতে এ আকাশের বিস্তৃতি অনেক বেশি। নরম বাতাস আলতো গতিতে বয়ে যেতো খোলা কুটিরের ভেতর দিয়ে। দীর্ঘ রাতও কেটে যেতো বড্ড তাড়াতাড়ি। কারণ স্যালির বয়েস তখন ষোলো, আর রেডের বড়োজোর কুড়ি। কুটিরের কাঠের থামের ফাঁক দিয়ে উষা গুঁড়ি মেরে ওদের ঘরে ঢুকতো, দেখতো পরস্পরের আলিঙ্গনের মাঝে ঘুমিয়ে থাকা ওই দুটি অপরূপ শিশুকে। সূর্য লুকিয়ে থাকতো ছেঁড়া ছেঁড়া বিশাল কলাপাতাগুলোর আড়ালে, যাতে ওদের ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। তারপর খেলার ছলে সূর্যটা পারসিক বেড়ালের উদ্যত থাবার মতো একটা সোনালি রশ্মি ছুঁড়ে দিতো ওদের মুখের ওপরে। ঘুম ঘুম চোখ মেলে ওরা তখন মৃদু হাসতো ফের একটা নতুন দিনকে সুস্বাগত জানাতে। এমনি করে সপ্তাহ গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে একটা বছর কেটে গেলো। তখনও ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে আগের মতো সেই একই রকম···না, 'আসক্তি নিয়ে' কথাটা ব্যবহার করতে দ্বিধা জাগছে—কারণ আসক্তির মধ্যে সর্বদাই একটা বিষাদের ছায়া, তিক্ততা বা উদ্বেগের স্পর্শ লেগে থাকে—বরং বলা যাক, তখনও ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে সেই আগের মতোই সারা প্রাণ-মন দিয়ে, ভালোবাসে তেমনি সরল আর স্বাভাবিকভাবে যেমন বেসেছিলো সেই প্রথম দেখার দিনটিতে যেদিন ওরা নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছিলো।

'ওদের জিগেস করলে ওরা নিঃসন্দেহে আপনাকে জানাতো, ওদের প্রেম কোনো

দিন লুপ্ত হয়ে যেতে পারে তা ওরা ভাবতেই পারে না। আমরা কি জানি না, প্রেমের এক অপরিহার্য অঙ্গ তার শাশ্বত অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখা? তবু রেডের মনে হয়তো ইতিমধ্যেই একটা অতি ক্ষুদ্র বীজ এসে বাসা বেঁধেছিলো, যা সে নিজেও জানতো না এবং মেয়েটিও তেমন কোনো সন্দেহ করতে পারেনি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সে বীজ একদিন অবসাদ হয়ে ডালপালা ছড়াতো।

'একদিন একজন স্থানীয় বাসিন্দা খাঁড়ির দিক থেকে এসে জানালো, সৈকতের কিছুটা ওধারে একটা তিমি-ধরা ব্রিটিশ জাহাজ নোঙর ফেলেছে।

'তাই নাকি'? রেড বললো, 'কিছু বাদাম আর কলার বদলে ওদের কাছ থেকে দু-এক পাউণ্ড তামাক যোগাড় করতে পারলে হতো'।

'অক্লান্ত হাতে স্যালি তাকে যে পান্দানাস সিগারেট বেঁধে দিতো সেগুলো এমনিতে কড়া, খেতেও ভালো। কিন্তু রেডের তাতে তৃপ্তি হতো না। ঝাঁঝালো গন্ধওলা, কড়া, সত্যিকারের তামাকের জন্যে তার মন কেমন করতো। কতোদিন সে পাইপ খায়নি! কথাটা ভাবতেই তার মুখে জল এসে যাচ্ছিলো। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, অমঙ্গলের আশঙ্কায় স্যালি তখন রেডকে নিরস্ত করার চেষ্টা করতে পারতো। কিন্তু আসলে প্রেম স্যালিকে এমন সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে ফেলেছিলো যে পৃথিবীর কোনো শক্তি রেডকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে বলে ওর মনেই হয়নি। দুজনে মিলে পাহাড়ে উঠে, ওরা একটা বড়ো ঝুড়ি ভর্তি করে বুনো কমলা-লেবু তুললো। ফলগুলো সবুজ, কিন্তু মিষ্টি আর রসালো। তাছাড়া কুটিরের কাছ থেকে তুললো কলা, নারকেল, ব্রেডফ্রুট আর আম। তারপর খাঁড়ির কাছে সে-গুলোকে বয়ে নিয়ে গিয়ে, নড়বড়ে ক্যানোটাতে বোঝাই করে, রেড আর জাহাজের খবর নিয়ে আসা সেই ছেলেটা দাঁড় বেয়ে বেয়ে খাঁড়ির বাইরে চলে গেলো।

'রেডকে স্যালির সেই শেষ দেখা।

'পরদিন ছেলেটি একা একা ফিরে এলো। তার চোখ ভর্তি জল। সে যে কাহিনীটা বলেছিলো তা হচ্ছে এই: অনেকক্ষণ ধরে দাঁড় বাইবার পর ওরা জাহাজের কাছে গিয়ে পৌঁছোয়। রেড চিৎকার করে ডাকাডাকি করায় একটা সাদা চামড়ার লোক বেষ্টনীর ওপর থেকে ঝুঁকে ওদের দেখে, জাহাজে উঠে আসতে বলে। ওরা ফলগুলো নিয়ে ওপরে ওঠে এবং রেড সেগুলোকে জাহাজের ডেকে জড়ো করে রাখে। তারপর সাদা লোকটা আর রেড কথাবার্তা শুরু করে এবং মনে হয় একটা বোঝাপড়াও হয়ে যায়। ওদের মধ্যে একটা লোক নিচে গিয়ে তামাক নিয়ে আসে। রেড সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা তামাক নিয়ে একটা নল ধরিয়ে ফেলে। ছেলেটা মহা উৎসাহে নকল করে দেখায়, কিভাবে

রেড মুখ থেকে একরাশ মেঘের মতো ধোঁয়া ছাড়ছিলো। তারপর লোক-গুলো রেডকে যেন কি সব বলে এবং রেড একটা কেবিনে গিয়ে ঢোকে। ছেলেটি কৌতূহলী হয়ে খোলা দরজা দিয়ে লক্ষ্য করে, একটা বোতল এবং কয়েকটা গ্লাস বের করা হয়েছে। রেড বসে বসে মদ খায় আর ধূমপান করে। ওরা তাকে কি যেন জিগেস করে, জবাবে সে মাথা নাড়ে আর হাসে। যে লোকটা প্রথমে তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলো সেও হাসে, তারপর ফের ভরে দেয় রেডের গ্লাসটা। ওরা কথা বলে আর মদ খায়। ছেলেটির কাছে দৃশ্যটা অর্থহীন। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে ডেকের ওপরে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙে লাথি খেয়ে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সে দেখতে পায়, জাহাজ আস্তে আস্তে হ্রদটা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে রেড তখনও টেবিলের কাছে বসে রয়েছে, দু হাতের ওপরে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে সে। তাকে জাগাবার জন্যে ছেলেটি ওদিকে যাবার চেষ্টা করতেই একটা কর্কশ হাত তার বাহু আঁকড়ে ধরে এবং একটা লোক ভুরু কুঁচকে জাহাজের পাশের দিকটা তাকে দেখিয়ে দিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলে। রেডকে ছেলেটা চিৎকার করে ডাকে, কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যেই তাকে তুলে নিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলা হয়। ক্যানোটা ততোক্ষণে ভাসতে ভাসতে একটু দূরে চলে গিয়ে-ছিলো। অসহায় ছেলেটি তখন সাঁতার কেটে ক্যানোতে গিয়ে ওঠে। তারপর সারা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে নৌকো চালিয়ে তীরে ফিরে আসে।

'ঘটনাটা স্পষ্টই বোঝা যায়। কাজ ছেড়ে চলে যাওয়া বা অসুস্থতা—যে কোনো কারণেই হোক, তিমি-ধরা জাহাজটায় কাজের লোক কম ছিলো। রেড জাহাজে ওঠার পর ক্যাপটেন তাকে কাজে যোগ দিতে বলে। কিন্তু রেড তাতে রাজী না হওয়ায় তাকে মাতাল করে গুম করা হয়।

'স্যালি তখন শোকে অধীর হয়ে উঠেছিলো। তিনদিন ও শুধু চিৎকার করেছে আর কেঁদেছে। সবাই ওকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ওকে কিছুতেই শান্তি দেওয়া যায়নি। কিছুতেই ও খাবে না। শেষে ক্লান্ত হয়ে ও এক বিষণ্ণ উদাসীনতায় ডুবে গেছে। রেড যেমন করেই হোক ছাড়া পেয়ে চলে আসবে —এই বৃথা আশা নিয়ে ও খাঁড়ির কাছে গিয়ে সারাদিন হ্রদের দিকে চোখ মেলে রাখতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতো সাদা বালির ওপরে, গাল বেয়ে অশ্রু নেমে আসতো অজস্র ধারায়। রাতে নিজের শরীরটাকে অবসন্নের মতো টানতে টানতে ও সেই ছোট্ট কুঁড়েঘরটাতে নিয়ে আসতো, যেখানে একদিন ও কতো সুখী ছিলো। রেড এ দ্বীপে আসার আগে ও যাদের সঙ্গে থাকতো, তারা ওকে নিজেদের কাছে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলো। কিন্তু ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, একদিন রেড ফিরে

আসবে। ওর ইচ্ছে—রেড ওকে যেখানে রেখে গিয়েছিলো, ফিরে এসে ওকে সেখানেই দেখবে। চার মাস পরে ও একটা মৃত শিশুর জন্ম দিলো এবং যে বৃদ্ধা ওকে প্রসব করাতে এসেছিলো সে ওর সঙ্গে ওই কুঁড়েঘরেই রয়ে গেলো। স্যালির জীবন থেকে সমস্ত আনন্দ মুছে গিয়েছিলো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার দুশ্চিন্তা যদি একটু কমে গিয়ে থাকে, তাহলে তার জায়গায় এসে স্থিতু হয়েছিলো এক পরম বিষাদ। এখানকার মানুষগুলোর আবেগ অত্যন্ত তীব্র, কিন্তু ভীষণ ক্ষণস্থায়ী। অথচ এ মেয়েটি যে কি করে এই মর্মান্তিক বেদনা বয়ে বেড়ালো, তা সত্যিই ভাবা যায় না। আজ হোক, পরে হোক রেড একদিন ফিরে আসবেই—এই দৃঢ় প্রত্যয় ও কোনোদিনও হারায়নি। ও তার পথ চেয়ে থাকে। যতোবার কেউ নারকেল গাছের ওই সঙ্কীর্ণ সাঁকোটা পেরোয়, ও চোখ তুলে তাকায়। ভাবে, হয়তো শেষ অব্দি সে এলো।'

নীলসন কথা থামিয়ে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

'শেষ অব্দি মেয়েটির কি হলো?' জিগেস করলো ক্যাপটেন।

নীলসন তিক্ত হাসি ছড়ালো, 'তিন বছর বাদে ও আর একজন শ্বেতাঙ্গকে গ্রহণ করলো।'

ক্যাপটেন বিদ্রূপ মেশানো স্থূল ভঙ্গিতে হাসলো, 'সাধারণত ওদের তা-ই হয়।'

লোকটার দিকে এক ঝলক ঘৃণার দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো নীলসন। ওই বিশাল মোটা লোকটা কেন তার মনে এমন তীব্র বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছে, সে জানে না। কিন্তু তার মনে নানান চিন্তা ঘুরে ঘুরে আসে, অতীতের স্মৃতি ভরিয়ে তোলে তার সমস্ত সত্তা। পঁচিশ বছর আগেকার দিনগুলোতে ফিরে যায় নীলসন। অ্যাপিয়ায় প্রচণ্ড মদ্যপান, জুয়াখেলা আর স্থূল ইন্দ্রিয়বিলাসে ক্লান্ত হয়ে সে তখন প্রথম এই দ্বীপে এসেছে। তখন সে অসুস্থ—জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার তীব্র বাসনা তার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলো, সেই স্বপ্নটা ভেঙে যাবার ক্ষতিকে সে তখন মেনে নিতে চেষ্টা করছে। নামজাদা হবার সমস্ত আশা সে তখন স্থির সংকল্পে বিসর্জন দিয়েছে। সাবধানে থাকলে আর যে কটা দিন সে বাঁচার আশা করতে পারে, তা নিয়েই সে তখন তৃপ্ত হতে আগ্রহী। এখানে এসে নীলসন প্রথমে একটা দো-আঁশলা দোকানদারের বাড়িতে উঠেছিলো। সৈকত ধরে কয়েক মাইল এগিয়ে গেলে একটা গ্রামের কিনারায় তার দোকান। একদিন নারকেল কুঞ্জের ভেতর দিয়ে ঘাসে-ছাওয়া পথটা ধরে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে নীলসন স্যালির কুটিরের কাছে এসে হাজির হয়। জায়গাটার সৌন্দর্য তাকে এমন তীব্র আনন্দে অভিভূত করে তোলে যে তা সে বেদনারই নামান্তর। তারপরেই স্যালিকে দেখতে পায় সে। এমন সৌন্দর্য

সে আগে কখনও দেখেনি। ওর অপরূপ কালো চোখ দুটিতে মিশে থাকা নীরব বেদনা তাকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দেয়। ক্যানাকারা সুন্দরের জাত, সৌন্দর্য তাদের মধ্যে বিরল নয়—কিন্তু তা সুগঠিত পশুদের সৌন্দর্য। অন্তঃসারশূন্য। কিন্তু স্যালির ওই রহস্যে ঘেরা করুণ কালো চোখ দুটিতে যেন পথ-খুঁজে-ফেরা মানব-আত্মার তিক্ত জটিলতা অনুভব করা যায়।

'আপনার কি মনে হয় সে কোনোদিন ফিরে আসবে?' প্রশ্ন করলো নীলসন।

'তেমন আশঙ্কা নেই। জাহাজের পাওনা মিটতেই তো কয়েক বছর। তদ্দিনে সে মেয়েটার সব কথাই ভুলে যাবে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, সেদিন ঘুম ভেঙে সে যখন দেখলো তাকে সাংহাই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন সে রীতিমতো ক্ষেপে গিয়েছিলো। কারুর সঙ্গে হাতাহাতি করতে গেলেও আমি অবাক হবো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা তাকে মেনে নিতে হয়েছে এবং আমার অনুমান এক মাসের মধ্যেই তার মনে হয়েছে, ওই দ্বীপ থেকে সটকাতে পারার মতো এতো ভালো ঘটনা তার জীবনে আর ঘটেনি।'

কিন্তু নীলসন ওই কাহিনীটা নিজের মাথা থেকে তাড়াতে পারেনি। হয়তো নিজে অসুস্থ এবং দুর্বল বলেই রেডের উজ্জ্বল স্বাস্থ্য তার হৃদয়বৃত্তিতে নাড়া দিয়েছিলো। সে নিজে কুৎসিত, চেহারাটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ—তাই অন্যের দৈহিক সৌন্দর্যকে সে অনেক বেশি মূল্য দিতো। সে কোনোদিন কাউকে পাগলের মতো ভালোবাসেনি এবং তেমন ভালোবাসাও সে অবশ্যই পায়নি। তাই ওই দুটি তরুণ প্রাণের পারস্পরিক আকর্ষণ তাকে এক পরম আনন্দে অভিভূত করে তুলেছিলো। ওর মধ্যে যেন শাশ্বত অসীমের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য। খাঁড়ির ধারে সেই ছোট্ট কুটিরটাতে ফের গিয়েছিলো নীলসন। তার ভাষা সুন্দর, মনটা উৎসাহী ও কাজে অভ্যস্ত। স্থানীয় ভাষা শেখার জন্যে ইতিমধ্যেই সে অনেকটা সময় ব্যয় করেছে। পুরনো অভ্যেসটা তখনও তার মধ্যে প্রবল। স্যামোয়াদের ভাষা সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখার জন্যে সে তখন মালমশলা সংগ্রহ করছে। স্যালির সঙ্গে যে বুড়িটা থাকতো, সে নীলসনকে ভেতরে এনে বসতে দিলো। পান করার জন্যে কাভা আর ধূমপানের জন্যে সিগারেটও দিলো। কথা বলার মতো কাউকে পেয়ে বুড়ি খুব খুশি। ও যখন কথা বলছে নীলসন তখন স্যালিকে দেখছে। ওকে দেখে নেপলসের যাদুঘরে রাখা সাইকির মূর্তির কথা মনে পড়ছিলো তার। ওর মুখের রেখায় সেই একই রকম সুস্পষ্ট পবিত্রতা। একটি শিশুকে গর্ভে ধারণ করা সত্ত্বেও ওর চেহারায় কুমারীর আদল।

দু-তিন বার দেখাসাক্ষাৎ করার আগে নীলসন স্যালির মুখে কথা ফোটাতে পারেনি। তাও জিগেস করেছে, অ্যাপিয়ায় রেড নামে কাউকে সে দেখেছে কিনা।

রেড উধাও হয়ে যাবার পর থেকে দুটো বছর কেটে গেছে, তবু এটা স্পষ্ট যে এখনও স্যালি অবিরত তার কথা চিন্তা করে।

নীলসনের কিন্তু বুঝতে দেরী হয়নি যে সে স্যালিকে ভালোবেসে ফেলেছে। প্রতিদিনই তার খাঁড়ির কাছে যেতে ইচ্ছে করতো, তবু সচেষ্ট প্রয়াসে সংযত করে রাখতো নিজেকে। স্যালির কাছে না থাকলে, সে ওর কথাই চিন্তা করতো। প্রথম প্রথম নিজেকে মৃত্যুপথযাত্রী মনে করে ও শুধু স্যালিকে দেখতে চাইতো, মাঝে-মধ্যে ওর কথা শুনতে চাইতো। ভালোবাসা তাকে এক আশ্চর্য সুখ এনে দিয়েছিলো। প্রেমের পবিত্রতা তাকে আনন্দে উদ্বেল করেছিলো। স্যালির সুন্দর দেহকান্তিকে ঘিরে কল্পনার অপরূপ জাল বোনার সুযোগটুকু ছাড়া স্যালির কাছ থেকে সে আর কিছুই চায়নি। কিন্তু খোলা বাতাস, নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রা, বিশ্রাম আর সাদাসিধে খাবার—সবকিছু মিলে নীলসনের স্বাস্থ্যের ওপরে এক অপ্রত্যাশিত প্রভাব ফেলতে শুরু করলো। এখন রাত্রিবেলা তার দেহের তাপ আর ততো সাংঘাতিক বাড়ে না, কাশি একটু কম হয়, দেহের ওজনও বাড়তে শুরু করেছে। ছ মাসে তার একবারও রক্তক্ষরণ হয়নি। হঠাৎ করেই একদিন সে আবার বেঁচে থাকার সম্ভাবনাটা দেখতে পেলো। তার রোগটাকে সে ভালোভাবে লক্ষ্য করেছিলো এবং এবারে তার মনে আশার উদয় হলো। মনে হলো, খুব সাবধানে থাকলে হয়তো সে এ রোগের দুর্বার গতিকে রোধ করতে পারবে। ভবিষ্যতের দিকে ফের একবার তাকিয়ে নীলসন উল্লসিত হয়ে উঠলো। কর্মব্যস্ত জীবন কাটানোর কথা অবশ্যই প্রশ্নাতীত, তবে এই দ্বীপে সে সহজেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে। তার যা সামান্য আয় তা অন্যত্র দিন যাপনের পক্ষে কম হলেও, এ দ্বীপে তাই-ই যথেষ্ট। এখানে সে নারকেলের চাষ করতে পারে, তাতে নিজেকেও একটা কাজের মধ্যে রাখা যাবে। তা ছাড়া সে তার বই আর একটা পিয়ানোও আনিয়ে নেবে। কিন্তু চকিত চিন্তায় সে ঠিকই বুঝতে পারলো, এসবের মধ্যে দিয়ে সে শুধু নিজের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাকেই নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। আসলে সে স্যালিকে চায়। স্যালিকে সে ভালো-বাসে শুধু ওর সৌন্দর্যের জন্যে নয়, ওর বেদনাবিধুর চোখ দুটির আড়ালে যে করুণ আত্মাটাকে সে দেখতে পেয়েছে—ভালোবাসা তার জন্যেও। নিবিড় প্রেম আর আবেগে আবেগে স্যালিকে সে মাতাল করে তুলবে। শেষ পর্যন্ত স্যালিকে সে অতীতের সবকিছু ভুলিয়ে দেবে। আত্মসমর্পণের উন্মাদনায় নীলসন কল্পনা করলো, স্যালিকে সে সুখ দেবে—যে সুখের প্রত্যাশা সে আর কোনোদিনও করবে বলে ভাবেনি, অথচ যা এখন অলৌকিকভাবে তার কাছে এসে হাজির হয়েছে।

নীলসন স্যালিকে তার সঙ্গে থাকতে বললো। স্যালি রাজী হলো না। এটা

প্রত্যাশিতই ছিলো এবং নীলসন এতে হতাশ হলো না। কারণ সে নিশ্চিত ছিলো, এখন হোক বা পরে হোক স্যালি তার কাছে ধরা দেবেই। তার প্রেম দুর্বার দুর্গম। সেই বুড়ীটাকে নীলসন তার বাসনার কথা জানালো এবং অবাক হয়ে শুনলো, সে এবং অন্যান্য প্রতিবেশীরা দীর্ঘদিন ধরেই তাদের ব্যাপারটা জানে। তারা সবাই মিলে স্যালিকে নীলসনের প্রস্তাবটা মেনে নেবার জন্যে জোরাজুরি করছে। শত হলেও, এদেশী সব মেয়েই সাদা মানুষের ঘরদোর সামলাবার সুযোগ পেলে খুশি হয়। তা ছাড়া, এ দেশের মান অনুযায়ী নীলসন ধনী লোক। যে দোকানির বাড়িতে নীলসন থাকতো, সেও স্যালির কাছে গিয়ে ওকে বোকামো করতে বারণ করলো। এমন সুযোগ আর আসবে না। তাছাড়া এতোদিন হয়ে গেলো, রেড আর কোনোদিন ফিরবে বলে স্যালি এখনও নিশ্চয়ই বিশ্বাস রাখতে পারে না। কিন্তু স্যালির বিরোধিতা নীলসনের বাসনাকে শুধু বাড়িয়েই দিলো। যা ছিলো বিশুদ্ধ প্রেম তা হয়ে উঠলো মানসিক যন্ত্রণাদায়ক তীব্র কামনা। নীলসন স্থির সিদ্ধান্ত নিলো, কোনো কিছুই তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। স্যালিকে সে শান্তিতে থাকতে দিলো না। অবশেষে নীলসনের অনুরোধ-উপরোধ এবং অন্য সকলের রাগারাগি সাধাসাধিতে ক্লান্ত হয়ে স্যালি ওই প্রস্তাবে রাজী হলো। কিন্তু পরদিন আনন্দে উচ্ছল হয়ে নীলসন স্যালির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলো, রেডের সঙ্গে ও যে কুটিরটাতে বাস করতো সেটাকে ও রাত্রিবেলা আগুন জেলে পুড়িয়ে দিয়েছে। বুড়িটা ছুটে এসে রেগেমেগে নীলসনের কাছে স্যালির নামে গালমন্দ করতে লাগলো। কিন্তু নীলসন তাকে হাত নেড়ে একপাশে সরিয়ে দিলো। ওতে কিছুই এসে-যায়নি। কুটিরটা যেখানে ছিলো সেখানে ওরা একটা বাংলো তৈরি করিয়ে নেবে। পিয়ানো আর একগাদা বই আনাতে চাইলে ইউরোপীয় কেতার বাড়ি সত্যিই অনেক সুবিধেজনক হবে।

তাই এই ছোট্ট কাঠের বাড়িটা গড়ে উঠলো, যেখানে সে আজ এতো বছর ধরে বাস করছে। স্যালিও তার স্ত্রী হলো। কিন্তু প্রথম কয়েক সপ্তাহের তীব্র মধুর আনন্দটুকু ছাড়া, নীলসন তেমন করে সুখ পেলো না। প্রথম দিকে স্যালি তাকে যতোটুকু দিয়েছে, তা নিয়েই খুশি হয়েছে নীলসন। কিন্তু স্যালি তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো শুধুমাত্র ক্লান্তি আর অবসাদে। নীলসনকে ও যা দিয়েছিলো তার কোনো মূল্যই ছিলো না ওর কাছে। নীলসন ওর যে আত্মার অস্পষ্ট আভাস দেখতে পেয়েছিলো, তা কোনোদিনই তার কাছে ধরা দেয়নি। নীলসন জানে, তার জন্যে স্যালির বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা নেই। এখনও ও রেডকে ভালোবাসে, সব সময় ও তারই ফেরার প্রতীক্ষায় রয়েছে। নীলসন জানে, তার প্রেম, কোমল ব্যবহার, সহানুভূতি

আর উদারতা পাওয়া সত্ত্বেও স্যালি রেডের কাছ থেকে সামান্য একটু সংকেত পেলেই তাকে ছেড়ে চলে যাবে—এক মুহূর্তের জন্যে একটুও দ্বিধা করবে না, নীলসনের দুর-বস্থার কথা ও একবারও চিন্তা করবে না। মানসিক অশান্তিতে অধীর হয়ে উঠলো নীলসন। বারবার সে মাথা কুটতে লাগলো স্যালির অভেদ্য সত্তার কাছে। তার প্রেম তিক্ত হয়ে উঠলো। করুণা দিয়ে সে স্যালির মন গলাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তা আগের মতোই কঠিন হয়ে রইলো। সে নির্লিপ্ত হবার ভান দেখালো, স্যালি তা লক্ষ্যও করলো না। মাঝে মাঝে সে মেজাজ খারাপ করে ওকে গালিগালাজ করতো, স্যালি তখন নীরবে কাঁদতো। মাঝে মাঝে সে ভাবতো, স্যালি একটা প্রতারক ছাড়া আর কিছু নয় আর আত্মার ব্যাপারটা স্রেফ তার কল্পনামাত্র। সে স্যালির মনের মন্দিরে ঢুকতে পারেনি, কারণ সেখানে মন্দির বলে কিছু নেই। নীলসনের প্রেম হয়ে উঠলো একটা কয়েদখানা—সেখান থেকে সে মুক্তি চায়। শুধু দরজাটা খুলে মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে এলেই হয়। কিন্তু দরজাটা খোলার মতো শক্তিটুকুও তার নেই। এ এক অদ্ভুত নির্যাতন। অবশেষে নীলসন আশাহীন, বোধহীন হয়ে উঠলো। আগুনটা জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে গেলো। এখন স্যালির চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে ওই সঙ্কীর্ণ সাঁকোটার দিকে স্থির হলে, নীলসনের বুক আর রাগে ভরে ওঠে না। শুধু অধৈর্য লাগে। আজ বহু বছর হয়ে গেলো ওরা অভ্যেসের বশে আর সুবিধের খাতিরে এক সঙ্গে বাস করছে। নীলসন এখন হাসিমুখে পেছনে ফিরে তার অতীতের প্রেমের দিকে তাকায়। এ দেশে মেয়েরা তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায়। স্যালিও এখন বুড়ি হয়ে গেছে। এখন স্যালির প্রতি তার প্রেম না থাক, সহনশীলতা আছে। নীলসনকে ও বিরক্ত করে না। পিয়ানো আর বই নিয়েই খুশি থাকে নীলসন।

অতীতের চিন্তা নীলসনের মনে মুখর হবার বাসনা জাগায়।

'এখন পেছনের দিকে তাকিয়ে রেড আর স্যালির সংক্ষিপ্ত প্রেমের কথা ভাবলে আমার মনে হয়, ভালোবাসার শীর্ষবিন্দুতে থাকার সময় বিচ্ছেদ হয়েছিলো বলে নিষ্ঠুর ভাগ্যকে ওদের ধন্যবাদ জানানো উচিত। ওরা কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু সে কষ্টও সুন্দর। ভালোবাসার সত্যিকারের বিয়োগান্ত বিপর্যয় ওদের সহ্য করতে হয়নি।'

'আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না,' ক্যাপটেন বললো।

'ভালোবাসার বিয়োগান্ত পরিস্থিতি মৃত্যু বা বিচ্ছেদে নয়। ওদের একজনের প্রতি অন্যজনের ভালোবাসা কমে যেতে কতোদিন সময় লাগতো বলে আপনার মনে হয়? যে নারীকে আপনি একদিন সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে ভালোবেসেছেন, যাকে চোখের আড়াল করা আপনার কাছে অসহনীয় বলে মনে হতো তাকে আর কোনোদিন না দেখলেও আপনার কিছু এসে যাবে না—এই উপলব্ধিটা কতো ভয়ঙ্কর ভেবে দেখুন

তো! আসলে ভালোবাসার সত্যিকারের বিয়োগান্ত পরিস্থিতি হলো উদাসীনতা।'

নীলসন কথাগুলো বলতে বলতেই একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে গেলো। কথাগুলো ক্যাপটেনকে উদ্দেশ করে বলা হলেও, নীলসন তখন ক্যাপটেনকে কথাগুলো বলেনি। সে তখন নিজের চিন্তাগুলোকে ভাষায় রূপ দিচ্ছিলো নিজেকে শোনাবে বলে। সামনের লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও সে তখন মানুষটাকে দেখছিলো না। কিন্তু এবারে তার সামনে একটা ছবি ফুটে উঠলো। যে লোকটাকে সে দেখতে পাচ্ছিলো, তার ছবি নয়—অন্য একজনের। নীলসন যেন সেই ধরনের একটা আরশির দিকে তাকালো যে আরশিতে মানুষের মুখ অস্বাভাবিক বেঁটে কিংবা অদ্ভুত লম্বাটে দেখায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটলো ঠিক তার বিপরীত। ক্যাপটেনের ওই হোঁৎকা মতো কুৎসিত বয়স্ক মুখটার মধ্যে নীলসন একটি তরুণের ছায়া ছায়া অস্পষ্ট মুখ দেখতে পেলো। এলোমেলো পথচলা লোকটাকে কেন ঠিক এখানেই নিয়ে এলো? বুকের মধ্যে একটা চকিত কাঁপুনিতে সামান্য বেদম হয়ে উঠলো নীলসন। একটা অবাস্তব সন্দেহ তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেললো। ব্যাপারটা অসম্ভব, কিন্তু তবু বাস্তবও হতে পারে।

'আপনার নামটা কি?' আচমকা প্রশ্ন করলো সে।

ক্যাপটেনের মুখটা কুঁচকে উঠলো। ভীষণ বিদ্বেষী আর ভয়ঙ্কর স্থূল রুচির মানুষ বলে মনে হতে লাগলো তাকে। নিচু গলায় একটা ধূর্ত হাসি হেসে সে বললো, 'এতো দীর্ঘ দিন আগে নিজের নামটা শুনেছিলাম যে আজ আমি নিজেই তা প্রায় ভুলে গেছি। তবে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এ দ্বীপগুলোতে সবাই সর্বদা আমাকে রেড বলে ডাকতো।'

একটা নিচু গলার, প্রায় নিঃশব্দ, হাসির দমকে ক্যাপটেনের বিশাল শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। অশ্লীল হাসি। নীলসন শিউরে উঠলো। ওদিকে রেড যেন তখন সাংঘাতিক মজা পেয়েছে, তার লালচে চোখ দুটো দিয়ে জল বেরিয়ে দু গাল বেয়ে নামছে।

নীলসন একটা হেঁচকি তুললো, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি স্ত্রীলোক ঘরে এসে ঢুকলো। স্ত্রীলোকটি এদেশী, খানিকটা ব্যক্তিত্বময়ী। চেহারাটা শক্তপোক্ত, তবে অতিরিক্ত মাংসল নয়। রঙ কালো, কারণ এখানকার লোকেরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি করে কালো হয়। চুলগুলো ভীষণ পাকা। পরনে কালো রঙের একটা লম্বা ঢিলেঢালা পোশাক। পোশাকের পাতলা আবরণ ভেদ করে স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে ওর পুরুষ্টু স্তন দুটি।

অবশেষে সেই মুহূর্তটা এসেছে।

মহিলা নীলসনকে সংসার সম্পর্কে কি একটা কথা জিগেস করলো, নীলসন তার জবাব দিলো। নিজের কণ্ঠস্বর নীলসনের নিজের কানেই অস্বাভাবিক শোনালো। মহিলা সেটা লক্ষ্য করেছে কি না, ভাবলো সে। জানলার ধারে কুর্সিতে বসে থাকা লোকটার দিকে একবার নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো মহিলা।

মুহূর্তটা এসেছিলো, আবার চলেও গেলো।

এক মুহূর্ত নীলসন কোনো কথা বলতে পারলো না। একটা অদ্ভুত ঝাঁকুনি খেয়েছিলো সে। তারপর বললো, 'আপনি আজ এখান থেকে আমার সঙ্গে দুটি খেয়ে-গেলে ভীষণ খুশি হবো।'

'তা আর হবে না,' রেড বললো। 'আমাকে এখন এই গ্রে নামে লোকটার খোঁজে বেরুতে হবে। তাকে জিনিসগুলো দিয়ে, এখান থেকে কেটে পড়বো। কালই আমি অ্যাপিয়ায় ফিরতে চাই।'

'আমি আপনার সঙ্গে একটি ছেলেকে পাঠাচ্ছি, সে আপনাকে রাস্তা দেখিয়ে দেবে।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়!'

কষ্টেসৃষ্টে নিজেকে কুর্সি থেকে টেনে তুললো রেড। বাগানে যারা কাজ করছিলো, নীলসন তাদের মধ্যে একজনকে ডেকে বুঝিয়ে দিলো ক্যাপটেন কোথায় যেতে চাইছে। ছেলেটা সাঁকোটা ধরে এগুতে লাগলো। তাকে অনুসরণ করার জন্যে তৈরি হলো রেড।

'পড়ে যাবেন না যেন,' নীলসন বললো।

'আরে না, মশাই।'

নীলসন দেখলো, লোকটা সাঁকো পেরিয়ে যাচ্ছে। নারকেল গাছগুলোর আড়ালে সে উধাও হয়ে যাবার পরেও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো নীলসন। তারপর ধপাস করে বসে পড়লো নিজের কুর্সিতে। ওই লোকটাই কি তাকে জীবনে সুখী হতে দেয়নি? ওই লোকটাকেই স্যালি এতোগুলো বছর ধরে ভালোবেসে এসেছে আর ওরই জন্যে মরিয়া হয়ে প্রতীক্ষা করছে দিনের পর দিন? কি অসম্ভব, অদ্ভুত কাণ্ড! হঠাৎ ভীষণ রাগ হলো নীলসনের। ইচ্ছে করলো, লাফিয়ে উঠে চতুর্দিকের সমস্ত কিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দেয়। সে প্রতারিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওরা পরস্পরকে দেখেছে, কিন্তু তা জানতেও পারেনি। নীলসন হাসতে শুরু করলো।

আনন্দহীন হাসি। হাসিটা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্তদের হাসির মতো হয়ে উঠলো। দেবতারা তার সঙ্গে এক নিষ্ঠুর ছলনা করেছেন। এবং এখন সে বুড়ো হয়ে গেছে।

অবশেষে স্যালি ঘরে এসে জানালো, খাবার তৈরি। ওর মুখোমুখি বসে খাওয়ার চেষ্টা করলো নীলসন। ভাবতে লাগলো, এখন সে যদি স্যালিকে বলে দেয় যে কুর্সিতে বসে থাকা সেই মোটা বুড়োটাই ওর সেই প্রেমিক যাকে যৌবনে সমর্পণ করা সুতীব্র আবেগ দিয়ে ও আজও মনে করে রেখেছে—তাহলে স্যালি কি বলবে। বহু বছর আগে, যখন স্যালি তাকে অসুখী করেছে বলে সে ওকে ঘৃণা করতো, তখন এ কথা স্যালিকে বলতে পারলে খুশি হতো নীলসন। স্যালি তাকে আঘাত দিয়েছে বলে সেও তখন স্যালিকে আঘাত দিতে চাইতো—কারণ তার ঘৃণাটা ছিলো আসলে ভালোবাসা। কিন্তু এখন তার আর কিছু এসে-যায় না। উদাস অবসন্ন ভঙ্গিতে দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো নীলসন।

'লোকটা কি চাইছিলো?' কিছুক্ষণের মধ্যেই জিগেস করলো স্যালি।

নীলসন তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিলো না। স্যালি এখন বড্ড বুড়ি হয়ে গেছে। এখন ও মোটাসোটা একটি বয়স্কা এদেশী মহিলা। নীলসন ভেবে পেলো না, কেন সে একদিন অমন পাগলের মতো ওকে ভালোবেসে ছিলো। নিজের আত্মার সমস্ত ঐশ্বর্য সে ওর পায়ের কাছে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলো, ও সেদিকে ফিরেও তাকায়নি। অপচয়, কি প্রচণ্ড অপচয়! অথচ এখন ওর দিকে তাকিয়ে নীলসন শুধুমাত্র অবজ্ঞা অনুভব করছে। অবশেষে তার ধৈর্য নিঃশেষ হলো। স্যালির প্রশ্নের জবাব দিলো সে।

'ও একটা স্কুনারের ক্যাপটেন। অ্যাপিয়া থেকে এসেছে।'

'ও।'

'ও দেশ থেকে খবর নিয়ে এসেছে। আমার বড়দা ভীষণ অসুস্থ, আমাকে ফিরে যেতে হবে।'

'বেশি দিনের জন্যে যাবে?'

নীলসন দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো।
